বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

জলাশয় নদ-নদীর পানি প্রবাহ সংখ্যা

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা জুলাই - ডিসেম্বর ২০১২

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/2, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৪ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এক

বাংলাদেশ আজ যে নদী-বাহিত পানি-সংকটের চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে, ভারত কর্তৃক একতরফাভাবে ফারাক্কা-বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এই বাঁধের ফলে বাংলাদেশের নদ-নদীর পাশাপাশি সকল জলাশয়ের ওপর এর বিরূপ প্রভাব আজ চরমে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন প্রায় সকল উদ্যোগই ভারত 'সাময়িক' এবং 'পরীক্ষামূলক' বলে শুরু করলেও পরবর্তীকালে তা স্থায়ী রূপলাভ করে। ভারত সবসময়ই মুখে বলে, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ তারা করবে না, কিন্তু বাস্তবে ঘটে তার বিপরীত। কেননা ফারাক্কা-বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারত 'সাময়িক' এবং 'পরীক্ষামূলক' বলে এই মরণ-বাঁধ দিয়েছিল।

ফারাক্কার মতো সংকটের একই ধারায় তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবং বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ-বিরোধ এখনও রয়ে গেছে অমীমাংসিত। ভৈরব নদ, আত্রাই ও পুনর্ভবা নদী, বেতনা, কোদলা, মহানন্দা ইত্যাদি নদীর পানিও ভারত বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে একতরফাভাবে।

চীনের তিব্বত থেকে আসা একমাত্র ব্রহ্মপুত্র নদ ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য নদীরই উৎসস্থল ভারত। সে-সব নদীর মধ্য থেকে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদীর পানি ভারত, কথিত 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প'র আওতায় আবারও একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নেয়ার মহা-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর ওপর ১৬টি বৃহৎ বাঁধ চালু করা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, গত বিয়াল্লিশ বছরে বাংলাদেশ সরকার এই অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিকভাবে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

চীনও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি উত্তর চীনে প্রত্যাহার করার কথা ভাবছে। ভারত পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে বাংলাদেশ যে-সব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে; চীন ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করলে, ভারতও সেই একই ক্ষতির মুখে পড়বে। উল্লেখ্য, যে-সব নদী বিভিন্ন দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় এবং উক্ত নদীগুলোর তীরে যে-যে দেশের জনবসতি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ঐসব নদীর পানির ওপর সমান অধিকার থাকে। এ-ক্ষেত্রে জলাশয় ও নদ-নদীর পানি-প্রবাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে আন্তর্জাতিকভাবে রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন।

ভারত, নেপাল, ভুটান, বার্মা ও চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যদিয়েই বাংলাদেশের পক্ষে এই রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করা সমীচিন হবে।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শরমিন নিশাত
সম্পাদক
১৫.১২.২০১৩

স ম্পা দ কী য় : দুই

পৃথিবীতে নদীসহ অন্যান্য জলাশয়ের সৃষ্টি, কীভাবে হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাব 'বিজ্ঞান' ও 'ধর্ম' আলাদা পথে দিলেও, দুটো পথই অনুমান-নির্ভর। ধর্মের কথা বাদ দিলেও কথিত 'বিজ্ঞান' তথা কল্পনা-বিজ্ঞানের জন্মও হয়েছে প্রকৃত বিজ্ঞানের ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে। বাতাস, মাটি ও আগুনের মতো পানিরও সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও কার্যকারণ এ-যাবত অংক কষে জানা সম্ভব হয়নি; তবে আমরা প্রত্যেকেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারি বাতাস-পানি-আগুনের মতো পানি-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা। পানি-সৃষ্টির শুরুতে এই পানি পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে ছিল না; তখন পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে যে-রূপে পানির ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণ ও ধরন ছিল, আজ পৃথিবীর সর্বত্র পানির সেই পরিমাণ ও ধরন আগের রূপে নেই; পৃথিবীর মোট পানির পরিমাণ হয়তো ঠিকই আছে তবে পূর্বে যে-স্থানে যে-ধরন ও পরিমাণে ছিল এখন সেই স্থানে একই ধরন ও পরিমাণে নেই; স্থানভেদে এই ধরন ও পরিমাণটা পরিবর্তিত হয়েছে। হাজার-লক্ষ বছর পরে পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণ একই থাকবে অথবা কিছুটা তারতম্য পরিমাণে থাকবে হয়তো, তবে স্থানভেদের এই পরিমাণ ও ধরন এখনকার তুলনায় আমূল পরিবর্তিত হবে; এখন যেখানে প্রচুর পানি আছে তখন সেখানে একেবারেই থাকবে না আবার এখন যেখানে প্রচণ্ড মরু তখন সেখানে হয়তো সমুদ্র থাকবে। এবং সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে আর কিছুটা মানুষ-সৃষ্ট কারণে। মাত্র গত ৫০ বছরে পৃথিবী জুড়ে কিংবা আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় পানির প্রাপ্যতা ও পানি-প্রবাহে স্থান ও ধরনভেদে যে-পরিবর্তন ঘটে গেছে, সেটি দেখেও নিশ্চয়ই হাজার-লক্ষ বছর পরের কথা কিছুটা হলেও আমরা অনুমান করতে পারি।

দুই.

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাসহ দেশের প্রায় সবগুলো নদী ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পরই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে; ফলে উজানের দেশ হওয়ার সুযোগ নিয়ে ভারত এ-সব নদ-নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে; যে-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'ফারাক্কা মরণ-বাঁধ'।

১৯৭৪-এ এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়; তখন বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ; তা সত্ত্বেও এই বাঁধ নির্মাণ নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার ন্যূনতম প্রয়োজন বোধ করেনি ভারত। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কথিত 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প'র আওতায় সেখানে ৫৪টি নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে। আর এ-সব নদীতে বাঁধ নির্মিত হলে ভাটির দেশ হিসেবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। অথচ এটি আন্তর্জাতিক বিষয় হওয়ায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার নেই এতগুলো নদীতে বাঁধ নির্মাণের অনুমতি দেয়া। যেহেতু এই নদীগুলোর একটিও ভারতের এককভাবে আন্তঃনদী নয়; বরং প্রতিটি নদী প্রবাহিত হয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্যে এসেছে; তাই বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত ৫৪টি নদীতে এই বাঁধ নির্মাণ আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

তিন.

ভারতের উজানের প্রদেশগুলোতে দিন-দিন পানির ব্যবহার বাড়ছে। ভবিষ্যতে ভারতে পানির ব্যবহার আরও বাড়তে থাকবে। ভারতের মধ্যে উৎপন্ন ৫৪টি নদীতে বাঁধ নির্মাণের যে মহা-পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছে, সেই 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশের ওপর এর যে-বিরূপ প্রভাব পড়বে, সেই প্রভাবকে মোকাবেলা করবার জন্য এখনই বাংলাদেশের সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সারা বছরে আমরা যে পানি পাই, তার শতকরা ৯২ ভাগ আসে উজানের দেশ ভারত থেকে, অবশিষ্ট শতকরা ৮ ভাগ পানি বাংলাদেশের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মৌসুমে আমাদের মোট পানির শতকরা ৬৯ ভাগ ধারণ করে ব্রহ্মপুত্র, ১৬ ভাগ ধারণ করে পদ্মা, ৫ ভাগ ধারণ করে মেঘনা আর অবশিষ্ট ১০ ভাগ পানি অন্যান্য নদীতে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বর্ষাকালে আমরা যে-পানি পাই সেই পানি আমাদের সব ধরনের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যথেষ্ট; ভারতের সাথে আমাদের পানি নিয়ে যত সমস্যা, সেটা শুষ্ককালের পানির ঘাটতি নিয়ে।

চার.

রাজনৈতিকভাবে নেপাল, ভুটান, ভারত, চীন ও বাংলাদেশের যৌথ-উদ্যোগই পারে এ-অঞ্চলের পানি-সংকট বিষয়ে সমাধানের পথ সৃষ্টি করতে। তবে এ-পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ভারত কারোরই তোয়াক্কা করছে না; এমনকি ভারতের মধ্যেও যে-সব যুক্তিনির্ভর বিবেকবান স্বর রয়েছে তাদেরকেও সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত একতরফাভাবে পানি-প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এতে করে শুধু বাংলাদেশেরই নয় বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়ারই প্রাকৃতিক ভারসাম্য চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ-বিপর্যয় আরও বাড়তে থাকবে। সুতরাং সমুদ্রের সীমানা বিষয়ে বাংলাদেশ যেমন আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়ে বিজয়ী হয়ে এসেছে, একইভাবে নদীর পানি-হিস্যা নিয়েও আন্তর্জাতিক মহলের মতামতকে বাংলাদেশের পক্ষে এনে নৈতিক এবং আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ জয়ী হবে– এটাই আমাদের আশাবাদ। পাশাপাশি আরেকটি উদ্যোগ হতে পারে, বর্ষাকালের পানিকে ধরে রেখে বছরব্যাপী সে-পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
১৫. ১২. ২০১২

সূচি

প্রবন্ধ
নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি
নজরুল ইসলাম ০৮

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের পানিব্যবস্থাপনা বিষয়ে কিছু কথা
আইনুন নিশাত ৩৬

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়
ম. ইনামুল হক ৪৪
নদী মরলে মানুষ কী করে বাঁচে?
আনু মুহাম্মদ ৫৫

প্রবন্ধ
বাংলাদেশের নদ-নদী : ভবিষ্যৎ
শহীদুল্লাহ মৃধা ৬৬
বাংলাদেশের জলাশয়, নদ-নদী ও জীববৈচিত্র্য: সংকট ও সম্ভাবনা
এম. এম. ইফতেখার হাসান ৭৩
নদীর মৃত্যুঘণ্টা
মুশফিকুর রহমান ৮২
বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়ের পানি প্রবাহ
উম্মে কুলসুম নাভেরা ৯০

প্রবন্ধ
ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প: বাংলাদেশের অভিশাপ এবং আমাদের লড়াই
ফিরোজ আহমেদ ৯৩
পানি নিয়ে ভাবনা: ভারতের পরিকল্পনা
আসিফ নজরুল ১০০

প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশ ও পানি-প্রবাহ
মো. আ ব দু ল আ উ য়া ল ১০৪
বাংলাদেশের পানি-প্রবাহ ভাবনা
শা হ আ ল ম সা রো য়া র ১০৮
বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়ে পানি
ফে র দৌ সী সু ল তা না ১১১
উজান-ভাটির দেশ
ম নি র জা মা ন ১১৬

ব্য তি ক্র মি প্র ব ন্ধ
ফারাক্কা ব্যারেজ, স্পাই-থ্রিলার ও দক্ষিণ এশিয়ায় আশু সংঘাত
মু স তা ই ন জ হি র ১২০

প্র ব ন্ধ
দেশের জলাভূমি ও নদ-নদীর পানিপ্রবাহের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের সমস্যা
নূ র মো হা ম্ম দ ১৩০

প্র ব ন্ধ
ফারাক্কা সমস্যা: বাংলাদেশের দাবির আইনগত ভিত্তি
মি জা নু র র হ মা ন ১৪৬
ফারাক্কা থেকে টিপাইমুখ : বাংলাদেশের ভূমিকা
বে ন জী ন খা ন ১৫২

প্র ব ন্ধ
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নদীপ্রবাহ, জলাবদ্ধতা এবং পরিবেশ বিপর্যয়
আ মি রু ল আ ল ম খা ন ১৬২
প্রসঙ্গ: উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধতা ; এক ভুক্তভোগীর পর্যবেক্ষণ
মো. আ ফ সা র আ লী ১৮৫
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী-প্রবাহ ও পরিবেশ রক্ষায় করণীয়
অ নি ল বি শ্বা স ১৯৫

বুড়িগঙ্গার মরণদশা ও একটি নদী চুরির তদন্ত রিপোর্ট
মোস্তফা কামাল ২০৫

বিশেষ প্রবন্ধ
উজানে উন্নয়ন বাহাদুরি আর ভাটিতে রক্তক্ষরণ
পাভেল পার্থ ২১১

সংযুক্তি
দুটি চুক্তি ও দুটি সমঝোতা স্মারক ২৫৩
গঙ্গার প্রথম পানিবণ্টন চুক্তি '৭১
গঙ্গার পানিবণ্টন সমঝোতা স্মারক '৮২
গঙ্গার পানিবণ্টন সমঝোতা স্মারক '৮৫
গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি-২ '৯৬

প্রবন্ধ

নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি

নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারত। ভৌগোলিকভাবে তিন দিক থেকে ভারত বাংলাদেশকে ঘিরে আছে। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও ভারত ও বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। ব্রিটিশ শাসনের শেষাবধি এই দুই দেশ একই ইতিহাসের অংশীদার

ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাফল্যের পেছনে ভারতের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক সে কারণে খুবই প্রত্যাশিত এবং আবশ্যক। ভারত একটি বৃহৎ দেশ। অর্থনৈতিক সক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, প্রভৃতিতে ভারত সমৃদ্ধ। বিগত দুই দশক যাবত দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ একটি বৃহৎ এবং দ্রুত ধাবমান দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে বাংলাদেশ বেশ উপকৃত হওয়ার আশা করতে পারে বৈকি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আশানুরূপ ধারায় অগ্রসর হয়নি। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। একটি অন্যতম কারণ হল নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা।

বাংলাদেশ মূলত বিভিন্ন নদ-নদী দ্বারা গঠিত একটি বদ্বীপ। কিন্তু এসব নদ-নদীর বেশিরভাগ ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং শেষাবধি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ভারত এসব নদ-নদীর পানি অপসারণ করে নিচ্ছে, ফলে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং এ দেশের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফারাক্কা এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গজালডোবাসহ অন্যান্য বহু বাঁধ। সেজন্য ভারতের কথা হলে এখন বাংলাদেশীদের মনে এসব বাঁধের কথাই বেশি মনে হয়। নদ-নদী বিষয়ে ভারতের আচরণ বাংলাদেশের মানুষদের নিকট অন্যায্য বলে অনুভূত হয়, এবং এই অনুভূতিই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে কাজ করছে।

কিন্তু যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিতে পারছে, সেই একই কারণে ভারত স্বীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে সহজে পৌঁছানোর প্রয়োজনে বাংলাদেশের নিকট ট্রানজিটের জন্য নির্ভরশীল। অন্যথায় এসব রাজ্যে পৌঁছাতে ভারতকে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার মাত্র বাইশ মাইল প্রস্থের সরু অংশের ওপর নির্ভর করতে হয়। দীর্ঘ ও সমস্যাসংকুল এ পথের ওপর নির্ভর করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জন দুরূহ। অথচ, উন্নয়নের অভাব এসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম কারণ। ফলে, ট্রানজিটের ইস্যুটি ভারতের জন্য স্ট্র্যাটিজিক গুরুত্বের, কেননা এর সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ইস্যু জড়িত।

উপর্যুক্ত কারণে 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি হতে পারে। এই ফর্মুলা দ্বারা ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অর্জিত স্বীয় সুবিধা পরস্পর বিনিময় করে নিতে পারে। এই ফর্মুলার অধীনে ভারত বাংলাদেশে প্রবাহিত সকল নদ-নদী উন্মুক্ত করে দেবে, যাতে তাদের স্বাভাবিক পূর্ণ প্রবাহ বাংলাদেশে পৌঁছাতে পারে। বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতকে

ট্রানজিট সুবিধা দেবে। নিঃসন্দেহে ট্রানজিট ইস্যুর আরও বহুদিক আছে, এবং সেসব ইস্যুর যথাযথ সমাধান হতে হবে। কিন্তু এখানে মূল সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক। বাংলাদেশের জন্য এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি কেবল তখনই নেয়া সম্ভব, যখন এর বিনিময়ে সে কোনো স্ট্র্যাটেজিক সুফল অর্জন করবে। একইভাবে ফারাক্কা, গজালডোবা, প্রভৃতি বাঁধ অপসারণ করে নদ-নদীসমূহতের জন্য তেমনই একটি স্ট্র্যাটেজিক সুফল।

বলা দরকার যে, 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার প্রতি বিরোধিতা প্রবল। বাংলাদেশের অনেকে মনে করেন যে, নদ-নদীর বাধাহীন প্রবাহ বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক, প্রকৃতি-প্রদত্ত অধিকার ও প্রাপ্য। এই প্রাপ্য আদায়ের জন্য বিনিময়ে কিছু দেয়ার প্রস্তাব তারা সঙ্গত মনে করেন না। তদুপরি তারা মনে করেন যে, ট্রানজিট একটি ভিন্ন বিষয়, এবং সে বিষয়ে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত হতে হবে।

এই বক্তব্য প্রসংগে বলা দরকার যে, নদ-নদীর বাধাহীন প্রবাহ বাংলাদেশের প্রাপ্য হলেও বাস্তবে ভারত এই প্রাপ্য স্বীকার করছে না, এবং ক্রমাগতভাবে এই প্রবাহ আরও হ্রাস করছে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ এযাবৎ এই প্রাপ্য আদায় করতে পারেনি। অন্যদিকে ভারত এ সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণেরও বিরোধী। ভারতের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এ সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে পারে ঠিকই। কিন্তু ভারতের সম্মতি ভিন্ন এসব ফোরাম এই ইস্যু আলোচনার জন্য গ্রহণ করবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। তদুপরি, তা করলেও এসব ফোরামের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে বলে কোনো লক্ষ ভারত এ যাবত প্রদর্শন করেনি। এমতাবস্থায় নদ-নদী বিষয়ক প্রাপ্য আদায়ে বাংলাদেশের নিকট আর কী পথ খোলা আছে? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার বাংলাদেশী বিরোধীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ভারতের অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু তাদের ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেহেতু এসব নদ-নদীর প্রবাহ অপসারণের অধিকার তাদের আছে। তদুপরি, তারা মনে করেন যে, বর্তমান যুগে ট্রানজিট একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রীতি। সুতরাং ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশ মাশুল, শুল্ক, ইত্যাদি দাবি করতে পারে; কিন্তু নদ-নদীর প্রবাহ একটি ভিন্ন বিষয়, এবং ট্রানজিটের বিনিময়ে নদ-নদীর প্রবাহ দাবি করা যৌক্তিক নয়। সুতরাং ভারত ও বাংলাদেশ, উভয় দেশের 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার বিরোধিতাকারীরা উপস্থিত সমস্যার কোনো কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করতে পারেন না। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে, আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও এ দুই ইস্যুর উৎস একই। সেটি হল র‍্যাডকিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে ১৯৪৭ সনে নির্ধারিত ভৌগোলিক সীমানা। এই সীমানার কারণেই ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার সম্ভব হচ্ছে। আবার এই সীমানার কারণেই ভারতকে ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে, এবং বাংলাদেশ তা প্রদানে অস্বীকৃত হতে পারে।

সুতরাং, এই দুই ইস্যু একই সমস্যার এপিঠ-ওপিঠ; এবং এই দু'য়ের যুগপৎ সমাধান সম্ভব। 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' হল সেই সমাধানের ফর্মুলা। যত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ ও নীতিনির্ধারকেরা এই ফর্মুলার উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারেন ততোই মঙ্গল, কেননা তার ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কোন্নয়নের পথে মূল বাধাটি অপসারিত হবে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার কাঠামোটি নিম্নরূপ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে যে, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সবটা নির্ধারণ করে না; বরং দ্বিপাক্ষিক বহু সমস্যাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে এরূপ দ্বিপাক্ষিক ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ইস্যুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির ইস্যু। চতুর্থ অনুচ্ছেদে এই ইস্যুটি আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। পঞ্চম অনুচ্ছেদে দেখানো হয় যে, এই সমস্যার উদ্ভবের কারণ হল নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি' (Commercial Approach) যা শিল্পবিপ্লবেরই একটি ফলশ্রুতি। কিন্তু সময়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কুফলসমূহ প্রকট হয়ে ওঠায় এর বিপরীতে নদ-নদীর প্রতি 'প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি' (Ecological Approach) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সূচনাতে উন্নত বিশ্বে প্রসার লাভ করলেও সময়ে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নশীল বিশ্বেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত ফারাক্কা ও গজালডোবাসহ অভিন্ন নদ-নদীর উপর ভারত কর্তৃক নির্মিত বাঁধসমূহের অভিজ্ঞতা আলোচনা করা হয়েছে, এবং দেখানো হয়েছে যে, সামগ্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি বিচারে এসব বাঁধ কল্যাণকর নয়। অষ্টম অনুচ্ছেদে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের বিশেষ পরিস্থিতির আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এসব রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য ট্রানজিট সুযোগের স্ট্র্যাটেজিক মূল্যটি পরিস্ফুট করা হয়েছে। নবম অনুচ্ছেদে দেখানো হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণকে আরও জরুরি করে তুলেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ক্ষেত্রে ভারতের উজানে রয়েছে চীন। এই উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে চীন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি উত্তরাভিমুখী অপসারণের পরিকল্পনা করছে বলে বিভিন্ন প্রত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

দশম অনুচ্ছেদে দেখানো হয় যে, কেবলমাত্র নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের মাধ্যমেই ভারত চীনের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে পারে এবং বাংলাদেশকে সে বিরোধিতায় সঙ্গে পেতে পারে। একাদশ অনুচ্ছেদে 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' প্রস্তাবটি তুলে ধরা হয়। দ্বাদশ অনুচ্ছেদে দেখানো হয় যে, নদী বিষয়ক

আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী এবং 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলাকে সমর্থন করে। সবশেষে ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে কিছু উপসংহার পরিবেশনের মাধ্যমে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা হয় হয়েছে।

দুই.

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

আশির দশকের শেষ পর্যন্ত পৃথিবী মূলত দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবির। অন্যটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলেও সাধারণভাবে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গেই অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক একটা ঘনিষ্ঠতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সংবিধান সংশোধন করে 'সমাজবাদ'কে একটি লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভ্যুদিত বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হিসেবেও 'সমাজতন্ত্র' গৃহীত হয়। ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধুর মস্কো সফরকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশেরও দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুতরাং সেসময় ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ও বাংলাদেশ একই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তা এই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য সহায়ক হয়।

সোভিয়েত-ভারত-বাংলাদেশ অক্ষের বিপরীতে ছিল যুক্তরাষ্ট্র-চীন-পাকিস্তান অক্ষ। মতাদর্শগত ও অন্যান্য কারণে সোভিয়েত বিরোধিতার সূত্রে চীন সেসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র তাতে ইতিবাচক সাড়া দেয়।

মার্কিন-ঘনিষ্ঠ পাকিস্তান চীন-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়নের এই প্রচেষ্টায় দূতিয়ালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সেকারণেই ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ তদানিন্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগারের এত বেশি বিরক্তি উদ্রেক করে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগর অভিমুখে রওয়ানা করায়। কেবলমাত্র সোভিয়েত পাল্টা সামরিক হুমকি এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোই যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করে, এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে সুগম করে।

কিন্তু ১৯৭১ সনের এই পরাজয় মার্কিনিরা সহজে মেনে নেয় না, এবং বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। এই ষড়যন্ত্রের ধারাতেই অবশেষে ১৯৭৫ সনে সামরিক ক্যু'র মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি মার্কিনপন্থী সরকার অধিষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯৭৫ সনের পর থেকে ভারত এবং বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে অবস্থান নেয়। ভারত

থেকে যায় সোভিয়েত শিবিরে; অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রকারান্তরে মার্কিন শিবিরে প্রবেশ করে। এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ডেকে আনে।

১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর দুই পরাশক্তিভিত্তিক দ্বিমেরুসম্পন্ন পৃথিবীর অবসান ঘটে। ভারতও সেসময় থেকে পূর্বতন সমাজতন্ত্রভাবাপন্ন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী মুক্তবাজারমূলক নীতিমালা গ্রহণ করতে শুরু করে। এ দুই ধারার পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সুতরাং, ১৯৯০ দশক থেকে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই পুনরায় একই ভূ-রাজনৈতিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং সে কারণে এই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

কিন্তু গোটা পরিস্থিতি এত সরলও নয়। বাংলাদেশ-ভারত সংশ্লিষ্ট ভূ-রাজনীতিতে আরেক শক্তি হল পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের সম্প্রসারণবাদী ইসলামি মতাদর্শ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে এই শক্তির সম্পর্ক বৈপরীত্যমূলক। ধর্মীয় সূত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে ঐতিহাসিক বৈরিতা, তা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন্দ্রিক দ্বিমেরুসম্পন্ন পৃথিবীর অবসানের সঙ্গে তিরোহিত হয় না। ১৯৭৫ সনের পর থেকে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলের অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট সম্প্রসারণবাদী ইসলামি শক্তি বাংলাদেশের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ ভারতের জন্য একটি সমস্যাসংকুল এলাকা। এই এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পাকিস্তান ও সম্প্রসারণবাদী ইসলামি শক্তি বাংলাদেশকে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র তৎপরতাকে সহায়তা প্রদান করে বলেও অভিযোগ রয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন্দ্রিক দ্বিমেরুসম্পন্ন পৃথিবীর অবসান, এবং আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ও বাংলাদেশ সাধারণভাবে একই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক জটিল থেকে যায়।

তিন.
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাবলি

কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক সমস্যাবলিই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা নয়। এক্ষেত্রে রয়েছে আরও বহু স্বার্থের সংঘাত। এর মধ্যে একটি হল সীমান্ত সংক্রান্ত। ১৯৪৭ সনে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যে সীমান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে বেশ কিছু বিষয় অমীমাংসিত থাকে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিভিন্ন ছিটমহলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের

যাতায়াত সংক্রান্ত সমস্যা। সমুদ্রসীমার বিষয়েও সংঘাত রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের একটা বড় অংশ জুড়ে ভারত ইতিমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে। সীমান্ত ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত হল সীমান্তরক্ষীদের আচরণ। বাংলাদেশের অভিযোগ রয়েছে যে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা অযাচিত ও অন্যায্যভাবে বাংলাদেশীদের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যা করে। কিছুকাল আগে গুলি করে হত্যা করার পর ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা ফেলানী নামে এক বাংলাদেশী কিশোরীকে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়েও রাখে। সম্প্রতি ঘুষ না দেয়ার কারণে এক বাংলাদেশী যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের কর্তৃক উলঙ্গ করে নির্বিচার প্রহারের ঘটনা বাংলাদেশীদের অনুভূতিকে আঘাত করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা হল বাণিজ্য সংক্রান্ত। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে যে, বিভিন্ন শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত বিধিনিষেধ দ্বারা ভারত স্বীয় দেশে বাংলাদেশের পণ্য আগমনকে বাধাগ্রস্ত অথবা নিরুৎসাহিত করছে। ফলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের বিশাল উদ্বৃত্ত বিরাজ করছে। চোরাচালানির মাধ্যমে সম্পাদিত অবৈধ বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে এই উদ্বৃত্ত আরও অনেক বেশি হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাণিজ্যে ক্রমাগতভাবে এক তরফা উদ্বৃত্ত দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতার জন্য অনুকূল নয়।

বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হল বিভিন্ন ধরনের প্রবেশাধিকার। এর একটি উদাহরণ হল টেলিভিশনের সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অসম প্রবেশাধিকার। যেখানে ভারতীয় চ্যানেলসমূহ বাংলাদেশে অবাধে সম্প্রচারিত হতে পারছে, সেখানে বাংলাদেশী চ্যানেলসমূহ ভারতে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান-উদ্ভূত সমস্যাদি ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ সমস্যার ক্ষেত্রে বহুবিধ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়েছে। এসব দ্বিপাক্ষিক সমস্যাবলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা।

চার.

নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা

বাংলাদেশ মূলত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ও মেঘনা দ্বারা গঠিত একটি বদ্বীপ। কিন্তু এসব নদ-নদী (অথবা তাদের উৎস নদীসমূহ) ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং শেষাবধি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ভারত এসব নদ-নদীর পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং এ দেশের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল ফারাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের মাধ্যমে ভারত গঙ্গা নদীর একটা বড় অংশ বাংলাদেশের পদ্মা থেকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের

হুগলী-ভাগিরথী নদীতে প্রবাহিত করছে। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীসমূহ ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। একই ধারার দ্বিতীয় উদাহরণ হল গজালডোবা বাঁধ। এই বাঁধের মাধ্যমে তিস্তা প্রবাহের একটা বড় অংশ ভারত প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফারাক্কা ও গজালডোবা ছাড়াও অভিন্ন নদ-নদীর প্রায় সবকটির উপরই ভারত পানি প্রত্যাহার কিংবা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো নির্মাণ করেছে, নির্মাণে রত, কিংবা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। ভারতের এই আচরণের ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে; এবং তীরবর্তী জনপদসমূহের প্রকৃতি ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এ যাবৎ নদ-নদী ভাগাভাগি সমস্যার বিশেষ সুরাহা হয়নি। ১৯৭৪ সনে ভারত যখন ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ক্ষমতায়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব তখন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এতদসত্ত্বেও ভারত ফারাক্কা বাঁধ সংক্রান্ত স্বীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিধা করে না। এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভূ-রাজনৈতিক বলয়গত অবস্থান, অথবা রাজনৈতিক বন্ধুত্বের ঘাটতিই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নের পথে একমাত্র বাঁধা নয়। তারপর থেকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। সাম্প্রতিককালে তিস্তা নদীর পানির ভাগাভাগি ও বরাক নদীর উপর তিপাইমুখ বাঁধের ইস্যু এই দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নের প্রয়াসকে একটা অচলাবস্থায় উপনীত করেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তাবায়নের আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কোনো দেশের সুপ্রিম কোর্টের মূল কাজ হল নিম্ন আদালতসমূহের বিভিন্ন রায় দেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা ও নিশ্চিত করা। সাধারণত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সম্প্রসারণ কিভাবে অর্জিত হতে পারে, তার জন্য প্রকল্প নির্বাচন করা তার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। বিচারকদের সে পারদর্শিতা থাকার কথা নয়। এ কাজ করার দায়িত্ব দেশের সরকারের। তদুপরি নদী সংযোগ প্রকল্প দ্বারা যেসব হিমালয়প্রসূত নদ-নদীর পানি ভিন্নমুখে প্রবাহিত করার কথা, সেগুলো আন্তর্জাতিক নদী; ভারতের আভ্যন্তরীণ নদী নয়। কাজেই এসব নদ-নদী বিষয়ে বাংলাদেশের সম্মতি ভিন্ন কোনো পদক্ষেপ ভারত নিতে পারে না। এতদসত্ত্বেও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কিভাবে এরূপ একটি আদেশ প্রদান করতে পারল, তা সত্যই বিস্ময়কর।

নদ-নদীর প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ভারত সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে নির্মিত পানি প্রত্যাহারমূলক প্রকল্পসমূহ এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নদী সংযোগ প্রকল্প বিষয়ক উপরি-আলোচিত আদেশের পেছনে কাজ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ভিন্ন ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার নদীর পানি ভাগাভাগি সমস্যার সমাধান অর্জন করা কঠিন। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পাঁচ.
নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি'

ভারত কর্তৃক অভিন্ন নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো নির্মাণের অন্যতম তলবর্তী কারণ হল নদ-নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী'। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নদ-নদীর পানি সমুদ্রে চলে যেতে দেয়া অপচয়; বরং সবটা পানিই বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শুষে নেয়া দরকার। নদ-নদীর প্রতি এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে আরও আছে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ওপর মানুষের অর্জিত প্রভুত্বকে আরও অগ্রসর করার বাসনা। শিল্পবিপ্লবের আগ পর্যন্ত প্রকৃতির ওপর মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল; বরং প্রকৃতির নিকট মানুষ বেশ অসহায়ই ছিল। তখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তির জন্য মানুষ মূলত নিজের এবং এবং পশুর কায়িক শক্তির ওপরই নির্ভর করতো। শিল্পবিপ্লবের আগেও বায়ু ও জলপ্রবাহ শক্তির কিছু ব্যবহার অর্জিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তার চরিত্র ও ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ ছিল।

শিল্পবিপ্লব প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকে সুগম করে। উৎপাদনের চালিকাশক্তি হিসেবে যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমাবস্থায় এসব যন্ত্র জলপ্রবাহজনিত শক্তি নির্ভর হলেও, দ্রুতই তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই অগ্রগতি আরও উঁচু স্তরে উন্নীত হয়।

প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব অর্জনের এই ধারাতেই মানুষ নদ-নদীকে জয় করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, এবং বৃহদাকার বাঁধ দ্বারা নদীপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করে। বাঁধ দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় এসব প্রচেষ্টা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিল্প-পুঁজিবাদী দেশসমূহে বাঁধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতায় পরিণত হয়।

একইসঙ্গে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংঘটিত কতিপয় পরিবর্তনও নদ-নদীকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। শিল্পবিপ্লবসৃষ্ট প্রকৃতির ওপর প্রভূত্ব অর্জনের ধারা কৃষিক্ষেত্রেও অগ্রসর হয়। কৃত্রিম উপায়ে উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়, এবং এসব বীজ দ্বারা ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম সেচব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে ওঠে। এছাড়া শিল্পবিপ্লব জনসংখ্যার স্ফীতি ডেকে আনে; এবং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আরও বেশি জমিতে চাষাবাদের প্রয়োজন হয়, এবং তার জন্য সেচের পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, এবং সেচ সম্প্রসারণ এই ত্রিমুখী উপকারের প্রত্যাশায় নদ-নদীর ওপর ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের ফলশ্রুতিতে অনেক ক্ষেত্রে সত্যিই নদীর পানিকে আর সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়া হয় না; তার আগেই প্রবাহের সবটুকু শুষে নেয়া হয়। আমেরিকার কলোরাডো নদী এ

প্রক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ। প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছানোর আগেই এই নদী এখন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে প্রাণ হারায়। একই পরিণতি ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার ডার্লিং-মারে নদীর।

শিল্প-পুঁজিবাদী দেশসমূহে উদ্ভূত নদ-নদীর প্রতি এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তীকালে উন্নয়নশীল, ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী দেশসমূহেও বিস্তৃত হয়। বিশেষত ভারত এবং চীন নদ-নদীর উপর বাঁধ নির্মাণে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে; বাঁধের সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই দেশ উন্নত, শিল্প-পুঁজিবাদের দেশসমূহকেও ছাড়িয়ে যায়।

ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রকল্পের প্রস্তাবকদের মতে কোনো কোনো নদী অববাহিকা উদ্বৃত্ত পানিসম্পন্ন, আর কোনো কোনো নদী অববাহিকা পানির ঘাটতিসম্পন্ন। সে কারণে প্রথমোক্ত অববাহিকাসমূহ থেকে পানি কৃত্রিম খাল খননের মাধ্যমে শেষোক্ত অববাহিকাসমূহে স্থানান্তর করতে হবে।

বলাবাহুল্য, এ ধরণের চিন্তা হল প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারিতা; বলা যেতে পারে, ‘খোদার ওপর খোদকারী করা’র প্রয়াস। ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রকৃতিরই একটি অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্যের অঙ্গ হিসেবে পৃথিবীর কোথাও পাহাড়, আবার কোথাও নিম্নভূমি। তাই বলে পাহাড় কেটে নিম্নভূমি ভরাট করে পৃথিবীর সর্বত্র একই উচ্চতা অর্জন গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য হতে পারে না। তদ্রূপ, পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়; আবার কোথাও বৃষ্টিপাত কম হয়। প্রথমোক্ত অঞ্চলের নদ-নদীতে শেষোক্ত অঞ্চলের নদ-নদী থেকে প্রবাহ বেশি থাকে। আবার একই অঞ্চলে বছরের সব ঋতুতে একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না। সে কারণে একই নদী অববাহিকায় বর্ষাকালে প্রবাহ বেশি থাকে; আবার শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ কমে যায়। প্রত্যেকটি অববাহিকার প্রতিবেশ, অর্থনীতি, সমাজ, ও সংস্কৃতি এসব স্থান-কাল ভেদসম্পন্ন বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। ভূ-প্রাকৃতিক এই বৈচিত্র্যই উদ্ভিদ ও প্রাণী-বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং ‘উদ্বৃত্ত’ এবং ‘ঘাটতি’ অববাহিকা বলে কিছু নেই। প্রতিটি অববাহিকাই তার নিজ বৈশিষ্ট্যদ্বারা মণ্ডিত ও স্বকীয়। প্রতিটি অববাহিকার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখাই মানবজাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা প্রকৃতি বিষয়ক এই মৌল সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। তারা কেবল নদীর পানির সাক্ষাৎ উপযোগ-মূল্যের সন্ধান করেন। তারা ভুলে যান যে, এক অববাহিকার পানি অন্য অববাহিকায় স্থানান্তরিত করা হলে উভয় অববাহিকারই ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে তারা প্রকৃতি-সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারই প্রতিফলন দেখা যায় ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্পের মধ্যে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থার করুণ পরিণতির সাক্ষ্য দেয়। যেমন মধ্য এশিয়ার আমু দরিয়া ও সির দরিয়া নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদী অনাদিকাল থেকে আরল সাগর অভিমুখে প্রবাহিত হত। কিন্তু ষাট ও সত্তর দশকে কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রে তুলাচাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দুই নদীর প্রবাহের গতিমুখ পরিবর্তিত করা হয়েছিল। এতে সাময়িকভাবে তুলাচাষের কিছু বৃদ্ধি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু দ্রুতই জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, প্রভৃতি সমস্যার উদ্রেক ঘটে। অন্যদিকে আমু দরিয়া ও সির দরিয়ার প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে আরল সমুদ্র ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে ও মৃত্যুমুখে উপনীত হয়। পৃথিবীর আরও বহু স্থানেই নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের এরূপ করুণ ফলাফলের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

ছয়.

নদ-নদীর প্রতি 'প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি'

কিন্তু ভারত ও চীনসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে যখন নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসার লাভ করে এবং এসব দেশ বাঁধ নির্মাণে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হয়, ততোদিনে খোদ উন্নত দেশসমূহে বাঁধের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তার উদ্রেক ঘটে। অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ যাবত বাঁধের লাভের দিকটিকে বাড়িয়ে দেখা হয়েছে, এবং বাধের ক্ষতির দিকগুলোর দিকে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়নি। বাধ বিষয়ক বিশ্ব কমিশনের রিপোর্টে (World Commission on Dams, 2000) এই উপলব্ধিটিই বেরিয়ে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাঁধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রায়শ ঘোষিত মাত্রার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়নি; বন্যা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে অনেক সময় বাঁধ বাড়তি বন্যার কারণ হয়েছে; সেচের নামে পানির অপচয় সাধিত হয়েছে; এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে, বাধ দ্বারা সৃষ্ট জলাধার বিপুল এলাকাকে নিমজ্জিত করে সে এলাকার প্রকৃতিকে বিনষ্ট করেছে; নিমজ্জিত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে; এবং জলাধারসমূহকে মিথেন এবং অন্যান্য উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস উদ্গীরণের উৎসে পরিণত করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব বাঁধ দ্বারা উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ নিমজ্জিত এলাকার জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছায়নি; এবং যে উন্নয়নের নামে বাঁধ নির্মাণ, তা এসব জনগোষ্ঠীকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। বাঁধ নদীবাহিত পলিমাটির বিচ্ছুরণকে বাধাগ্রস্ত করে একদিকে প্লাবনভূমির স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অন্যদিকে জলাধারে অতিরিক্ত পলিমাটিভরণের জন্ম দিয়েছে। বাঁধ নদীকে বিভক্ত করেছে, এবং অবাধ চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে অনেক জলজ প্রাণীকে নিশ্চিহ্নতাপ্রাপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এসব বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিফলের আলোকে দেখা যায় যে, বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিচারে জলবিদ্যুৎ মোটেও শস্তা প্রমাণিত হয়নি; বরং জলবিদ্যুতের জন্য অর্থনীতি ও সমাজকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

এসব অভিজ্ঞতার কারণেই আশির দশক থেকে নদ-নদীর প্রতি ‘প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী’ প্রসার লাভ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নদ-নদীকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং তাদের স্বাভাবিক প্রবাহের পরিমাণ ও গতিমুখ অক্ষুণ্ন রাখাই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কৃষি কিংবা নগরায়নের জন্য পানির প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। কিন্তু লক্ষ করা হয় যে, এসব উদ্দেশ্যে পানির অনেক সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্ভব। বিশেষত সেচের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ হ্রাস করা যায়। যেমন, ড্রিপ পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক কম পানি দিয়েও একই মাত্রার সেচ অর্জন করা যায়। পানি-সাশ্রয়ী ফসল আবাদের মাধ্যমেও সেচের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি-সাশ্রয়ী ফসলের নতুন বীজের উদ্ভাবন করাও সম্ভব। ফলে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে সেচ সম্প্রসারণ অপরিহার্য নয়। বস্তুত সেচের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের মাধ্যমে জমিকে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা থেকেও রক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং, পানি-সাশ্রয়ী কৃষির মাধ্যমে শুধু নদী নয়, জমির স্বাভাবিক গুণাগুণও রক্ষা করা যায়। একইভাবে নগরায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণও হ্রাস করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পানির পুনর্ব্যবহার পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া যায়। সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের মাধ্যমে নগরায়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণও হ্রাস করা সম্ভব।

লক্ষ করা প্রয়োজন যে, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধি অনেকটা আনুভূমিক থেকে উল্লাম্বিক চরিত্র অর্জন করেছে । এই উল্লাম্বিক প্রবৃদ্ধি পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বিপুল চাপের সৃষ্টি করেছে। এই চাপ ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে। উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাসের উদগীরণ বৃদ্ধি ও তদ্বারা সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসব পরিণতি থেকে স্পষ্ট যে, সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী না হয়ে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে, নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক বৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভংগি গ্রহণ আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আশার কথা যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত কর্মতৎপরতার সূচনা ঘটেছে। যেমন, উন্নত দেশসমূহে নদ-নদীর উপর নির্মিত বাঁধ ভেংগে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে পাঁচশ’র বেশি বাঁধ অপসারিত করে নদ-নদীকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে দেয়া হয়েছে। জাপান এবং ইউরোপের অনেক উন্নত দেশেও এখন নতুন বাঁধ নির্মাণ নিরুৎসাহিত হয়েছে, এবং ইতিপূর্বে নির্মিত বাঁধ ভেঙে দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই দৃ ষ্টিভঙ্গী দিন দিন আরও জোরালো হচ্ছে।

নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃ ষ্টিভঙ্গি উন্নয়নশীল বিশ্বেও প্রসার লাভ করছে। তারই উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখি যে, প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার (বার্মা) সরকার

সেদেশের ইরাবতী নদীর উপর প্রস্তাবিত মিয়িৎসোন (Myitsone) বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছে। চীনের সহযোগিতায় এই বাঁধটি নির্মাণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল, এবং তা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট চীনা কোম্পানি আর্থিকভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কারণে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চীনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদও করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নদী, প্রকৃতি, পরিবেশ ও স্থানীয় জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়ে মিয়ানমার সরকার বাঁধ নির্মাণ বাতিলের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। একই ধারার আরেক উদাহরণ দেখা যায় সম্প্রতি লাওস সরকার কর্তৃক সে দেশে মেকং নদীর উপর প্রস্তাবিত শায়াবুড়ি (Shayaburi) বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তের মধ্যে। বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক নদ-নদী ভাগাভাগি আলোচনায় এ উদাহরণটি আরও প্রাসংগিক এ কারণে যে, মেকং নদী ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে, নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল উন্নত বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা ভারত ও বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী দেশসমূহেও পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় আহরণ নিতান্তই জরুরি।

সাত.
ফারাক্কা ও গজালডোবা বাঁধের অভিজ্ঞতা

নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ভারত কর্তৃক নির্মিত ফারাক্কা, গজালডোবা, প্রভৃতি বাঁধের অভিজ্ঞতার আলোকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমেই ফারাক্কা বাঁধের (ব্যারাজের) কথা ধরা যাক। এই ব্যারাজের মূল ঘোষিত লক্ষ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধি, যাতে তা সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে কাজ করতে পারে। ফারাক্কা বাঁধের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। দীর্ঘ এ অভিজ্ঞতার আলোকে আজ স্পষ্ট যে, ফারাক্কা তার কথিত মূল লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। ফারাক্কা ভাগীরথী-হুগলী চ্যানেলে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করলেও কলকাতাকে সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে কার্যক্ষম রাখতে পারেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমুদ্র থেকে প্রায় একশ মাইল অভ্যন্তরে কলকাতা বন্দরের পত্তন করেছিল। তখনকার পালতোলা সমুদ্রগামী জাহাজের আকৃতি এবং গভীরতা ছিল স্বল্প। তিনশ' বছর পরে বর্তমানকালের সমুদ্রগামী জাহাজের আকৃতি ও গভীরতা অনেকগুণ বেশি। পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে কলকাতার পক্ষে সমুদ্র বন্দর হিসেবে কার্যক্ষম থাকা অসম্ভব ছিল; এবং ফারাক্কা সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেনি। অন্যদিকে ফারাক্কা এখন বিহার এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অপ্রত্যাশিত বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বিহারের মানুষ এখন ফারাক্কা ভেঙে দেয়ার জন্য হাতুরি, শাবল নিয়ে নিয়মিত মিছিল করছেন।

এদিকে প্রকৃতি-বিরোধী ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে এখন খোদ গঙ্গা নদীই প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। ফারাক্কায় বাধাগ্রস্ত হয়ে গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ এখন আরও উত্তরে সরে যাচ্ছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে একসময় গোটা গঙ্গা নদীই ফারাক্কা ব্যারাজের বাইরে দিয়ে প্রবাহিত হবে; এবং তখন ফারাক্কা বাঁধ শুষ্ক নদীবক্ষে ভারতীয় অহমিকার একটি নিষ্ফলা দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।

বাঁধের হতাশাকর ফলাফলের বিষয়টি গজালডোবা ব্যারাজের জন্যও প্রযোজ্য। কোনো বন্দরের নাব্যতা রক্ষা গজালডোবা বাঁধের লক্ষ্য নয়। এই বাঁধের পেছনে কেবল একটিই যুক্তি; তা হল সেচের সম্প্রসারণ। কিন্তু আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এ-জাতীয় সেচপ্রকল্প পানির অপচয় ডেকে আনে; জমিকে অনুপযোগী আবাদের দিকে ঠেলে দেয়; জমিতে লবণাক্ততার সৃষ্টি করে; এবং জমির গুণাগুণ বিনষ্ট করে। গজালডোবার ক্ষেত্রেও তাই লক্ষ করা যাচ্ছে।

জল-সাশ্রয়ী ফসলের নির্বাচন, ড্রিপ-সেচের মতো অধিকতর দক্ষ সেচব্যবস্থার প্রচলন, এবং এ জাতীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে গজালডোবার মতো নদীর পানির বৃহদাকার অপসারণভিত্তিক সেচব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়াই কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কৃষিউৎপাদন বৃ দ্ধির এসব বিকল্প পদ্ধতি শুধু পরিবেশ-বান্ধবই নয়, অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিচারেও অধিকতর উপযোগী।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পরিষ্কার যে, অভিন্ন নদ-নদীর উপর ভারত কর্তৃক নির্মিত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত বাঁধসমূহ দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক বিচারে সুফল বয়ে আনতে পারেনি। একদিকে তা বাংলাদেশের প্রকৃতি ও অর্থনীতির সমূহ ক্ষতি ডেকে এনেছে। অন্যদিকে তা ভারতের নিজের জন্যও বিনিয়োজিত সম্পদের অপচয় সংঘটিত করেছে। এসব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের সময় এসেছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন আরও এক কারণে প্রয়োজন তা হল ট্রানজিট।

আট.

ভারতের জন্য ট্রানজিটের প্রয়োজনীয়তা

যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিতে পারছে, সে একই কারণে ভারত স্বীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে পৌঁছানোর প্রয়োজনে ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। অন্যথায় এসব রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য ভারতকে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যবর্তী মাত্র ২২ মাইল প্রস্থের তথাকথিত হংস-গ্রীবার (goose neck) ওপর নির্ভর করতে হয়। এই সরু ও দীর্ঘপথ দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে পৌঁছানো অনেক সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। যোগাযোগের এই সমস্যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের আর্থ-সামাজিক

উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। কিন্তু, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভাব ভারতের এসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম কারণ। সুতরাং ট্রানজিটের ইস্যুর সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ইস্যু জড়িত।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি সম্প্রসারণবাদী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই শক্তি ভারতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। ২০০৬ সনে চট্টগ্রামে চোরাচালানকৃত দশ ট্রাক অস্ত্র আটক এবং পূর্বাপর অন্যান্য ঘটনার আলোকে স্পষ্ট যে, এ প্রচেষ্টায় এই শক্তি যথেষ্ট সফলও হয়েছিল। সুতরাং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে উন্নয়ন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রশমনের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা ভারতের বিশেষভাবে প্রয়োজন।

২০০৮ সনে ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতকে এই সহযোগিতা প্রদানে স্বতোপ্রণোদিতভাবেই এগিয়ে আসে। ভারত বিভিন্ন সময়েই অভিযোগ করে আসছিল যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উতসাহিত ও সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশে, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অনেক ঘাঁটি নির্মিত হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণামতে বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের লক্ষ্যে এসব ঘাঁটি বিলুপ্ত করে।

শুধু তাই নয়। বর্তমান সরকার ট্রানজিটের ইস্যুতেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, এবং এ ব্যাপারে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করে। বস্তুত এরূপ চুক্তিতে উপনীত হওয়ার আগেই বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে তালপতাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পরিবহনের অনুমতি প্রদান করে। যেহেতু এরূপ পরিবহনের উপযোগী সেতু ছিল না, সেহেতু বাংলাদেশ তিতাস নদীর ওপর ক্রসবাঁধও নির্মাণ করে দেয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এতখানি ইতিবাচক সাড়া দেয়ার পরও ভারত নদ-নদীর প্রশ্নে নমনীয়তা প্রদর্শন করছে না। গত সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে অর্ধেক-অর্ধেক ভাগাভাগির ভিত্তিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল, শেষাবধি তা হতে পারেনি। বলা হচ্ছে যে, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অর্ধেক ভাগে সন্তুষ্ট নন। তিনি তিস্তা নদীর ৭৫ কিংবা ৮০ ভাগ পানি চান। তাঁর বিরোধিতার কারণে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারেনি। এদিকে খবরে প্রকাশ যে, সম্ভবত মমতা ব্যানার্জীর আচরণে উৎসাহিত হয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমার দাবি জানিয়েছেন যে, ১৯৯৬ সনে সম্পাদিত গঙ্গা চুক্তির পুনর্নিরীক্ষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ, তিনি মনে করছেন যে, এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশকে যতটুকু পানি দেয়ার কথা, সেটা আরও কমানো প্রয়োজন। অথচ, ১৯৯৬ সনের চুক্তিতে সর্বনিম্ন প্রবাহ সংক্রান্ত কোনো গ্যারান্টি ধারা না থাকার

কারণে অধিকাংশ বছরেই এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের যতটুকু পানি পাওয়ার কথা, তা দেয়া হয়নি। সুতরাং পরিষ্কার যে, নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে নদ-নদী বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ সমঝোতা অর্জন দুরূহ। বরং দিন দিন এ সমস্যা আরও কঠিন হবে, কেননা বাংলাদেশের সীমান্তে পৌঁছানোর আরও বহু পূর্বেই এসব নদ-নদী থেকে ক্রমাগতভাবে পানি প্রত্যাহৃত হবে, এবং ফলে সীমান্তে ভাগাভাগি করার মতো তেমন পানি আর অবশিষ্ট থাকবে না। গঙ্গা ও তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের সমস্যার মধ্যে এই সত্যটিই প্রতিফলিত হচ্ছে। নদ-নদী বিষয়ে ভারত কর্তৃক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন, শুধু যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ট্রানজিট পাওয়ার জন্য তাই নয়। এটা আরও প্রয়োজন, কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভারত আরও এক ধরনের নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হবে, এবং তা মোকাবেলার জন্যও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ সমস্যাটিই আলোচিত হবে।

নয়.

জলবায়ু পরিবর্তন এবং নদ-নদী ভাগাভাগির সমস্যা

সুবিদিত যে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন বিশ্বের ও মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যদিও এই পরিবর্তন ডেকে আনার পেছনে বাংলাদেশের তেমন কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু এই পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেসব বিভিন্ন ধারায় বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা, তার মধ্যে নিম্নের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, নিমজ্জন। যেহেতু বাংলাদেশ মূলত একটি নিচু বদ্বীপ, সেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন-সৃষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা (চিত্র-১৪ এবং ১৫)। দ্বিতীয়ত, লবণাক্ততার প্রসার। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের যে অংশ নিমজ্জিত হবে না, সেখানেও লবণাক্ততা বিস্তৃত হবে। তার ফলে কৃষিসহ সমগ্র অর্থনীতির সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, নদ-নদীপ্রবাহের আন্ত-ঋতু চরমভাবাপন্নতার বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের হিমাবাহসমূহ গলে যাওয়ার কারণে হিমালয় উৎসের নদ-নদীসমূহের শীতকালীন প্রবাহ আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা (চিত্র-১৬)। অন্যদিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে গ্রীষ্মকালে ভারতীয় মহাসাগর হতে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহে আরও বেশি জলীয় বাষ্প থাকার কারণে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ফলে নদীপ্রবাহ একদিকে শুষ্ক মৌসুমে আরও হ্রাস পাবে, অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে আরও বৃদ্ধি পাবে। চতুর্থত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলির সংখ্যা, ব্যাপ্তি, ও প্রকটতা বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমত, বিভিন্ন রোগ ও মহামারী বৃদ্ধি পাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে দিতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখনই ষোল কোটির মতো। আগামীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে একুশ কোটিতে পৌঁছানোর কথা। এত বহুল জনসংখ্যার দেশের যদি এক-পঞ্চমাংশও নিমজ্জিত হয়, তাহলে প্রায় চার কোটি মানুষের বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়বে। এসব মানুষ আমেরিকা, ইউরোপ, কিংবা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাতে পারবে না। তারা নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশেই আশ্রয় খুঁজবে। কোনো কাঁটাতারের বেড়া কোটি কোটি বেপরোয়া মানুষের জনস্রোত ঠেকাতে পারবে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা ভারতকে প্রভাবিত করবে। সুতরাং স্বীয় উন্মীলিত স্বার্থের কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদানে ভারতের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি বর্তমান বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণই এরূপ সহযোগিতা প্রদানের সর্বোত্তম পন্থা। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, নদীবাহিত পলিমাটিভরণের মাধ্যমেই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ইতিপূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মোকাবেলা করেছে। যুগ যুগ ধরে এসব নদ-নদী প্রতি বছর প্রায় দুই কোটি টন পলি এই বদ্বীপে বহন করে এনেছে এবং প্লাবনভূমিতে ও বঙ্গোপসাগর উপকূলে জমা করেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রতি বছর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় দুই মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ বাৎসরিক দুই মিলিমিটার করেই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং, যদি পলিভরণের প্রক্রিয়া পূর্বের মতো অব্যাহত রাখা যায়, তবে বাংলাদেশ নিমজ্জনের বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে; কিংবা অন্ততপক্ষে নিমজ্জনের পরিধি সংকুচিত রাখতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক যে, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং প্রবাহ বিঘ্নকারী অন্যান্য কাঠামো নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে বাহিত পলিমাটির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে পলিমাটির পরিমাণ দুই কোটি থেকে প্রায় এক কোটিতে হ্রাস পেয়েছে (চিত্র-১৭)। যদি ভারত নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং এ দৃষ্টিভঙ্গীসঞ্জাত নদীর প্রবাহ বিঘ্নকারী কাঠামো নির্মাণ অব্যাহত রাখে, তাহলে আগামীতে এ পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের নিমজ্জনের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনসৃষ্ট বিপদের আলোকেও ভারত কর্তৃক নদ-নদীসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

দশ.

চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারের বিপদ

লক্ষণীয় যে, ভারত যেমন উজান-অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করছে, তেমনি চীনও উজান-অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের

পানি প্রত্যাহার করতে পারে। বস্তুত বিভিন্ন সময় চীনের এরূপ পরিকল্পনার কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। চীন দাবি করে যে, উত্তর চীনে পর্যাপ্ত পানি নেই, এবং সে কারণে দক্ষিণের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি উত্তরমুখে অপসারণ করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য যে, চীনের এরূপ চিন্তার পেছনেও নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে। কিভাবে পানির প্রয়োজনীতা হ্রাস করা যায়, সেদিকে চিন্তা ধাবিত না করে বরং নদীর পানি কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন দিকে ধাবিত করে সে পানি শুষে নেয়ার মাধ্যমে পানির অধিক চাহিদা মেটানোর চিন্তা করা হচ্ছে।

প্রণিধানযোগ্য যে, ভারত ব্রহ্মপুত্র নদ সম্পর্কে চীনের এই চিন্তার ঘোর বিরোধী। শুধু তাই নয়, ভারত চায় যে, বাংলাদেশও চীনের এই পরিকল্পনার বিরোধিতায় ভারতের সঙ্গে যোগ দিক। বলা বাহুল্য যে, ভারতের এ অবস্থান ও প্রত্যাশা স্ববিরোধী খুবই। ভারতের বোঝা প্রয়োজন যে, উজান-অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি ক্রমাগতভাবে অপসারণ করে নেয়ার মাধ্যমে সে চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারমূলক পরিকল্পনার বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুত ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প যে যুক্তিতে রচিত, ব্রহ্মপুত্র নদ বিষয়ক চীনের প্রস্তাবিত প্রকল্পের পেছনে সেই একই যুক্তি।

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী কত ক্ষতিকর। নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা দীর্ঘকালের। অধুনাকালে উত্তর প্রদেশ, বিহার, ও পশ্চিমবাংলার মধ্যেও নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির সমস্যা তীব্র হচ্ছে।

সুতরাং, ভারত যদি ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারমূলক চীনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে চায়, এবং আশা করে যে, বাংলাদেশ তার সঙ্গে এ বিরোধিতায় যোগ দিক, তাহলে প্রথমে ভারতের নিজ কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে হবে; বাংলাদেশে প্রবাহিত নদ-নদীর উপর নির্মিত সকল প্রবাহ বিঘ্নকারী কাঠামো অপসারণ করতে হবে; ভবিষ্যতে এ ধরণের কাঠামো নির্মাণ না করায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে; এবং ভারতকে প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প (অন্ততপক্ষে এই প্রকল্পের হিমালয়প্রসূত নদ-নদী সংক্রান্ত অংশ) বাতিল করতে হবে। তাহলেই কেবল নদ-নদীসমূহ প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে সংঘাত ও বৈরিতার উৎসের পরিবর্তে মৈত্রীর রাখিতে পরিণত হতে পারবে।

এগার.

নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট

কিন্তু ভারত সহসাই নদ-নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে, এমন আশা করা দুরূহ। এটা ঠিক যে, ভারতেও নাগরিক পর্যায়ে

প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠছে। নর্মদা বাঁধের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলনই তার একটি বড় প্রমাণ। বর্তমানে তিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধেও মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ও আসামে নাগরিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

কিন্তু নাগরিক পর্যায়ের এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও প্রবল। এই প্রতিরোধের পেছনে রয়েছে স্বার্থ। এই স্বার্থ দুই ধরনের। একটি হল প্রকৃত অর্থের বস্তুগত স্বার্থ। এই স্বার্থের অন্যতম প্রতিভূ হল বাঁধ নির্মাণশিল্প। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে বহু কোম্পানি। মুনাফার প্রত্যাশায় এসব কোম্পানি ক্রমাগতভাবে বাঁধ নির্মাণের প্রকল্পকে উৎসাহিত করে। বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পেশার লোকজনও স্বাভাবিক কারণেই বাঁধ নির্মাণকে সমর্থন করে। সরকারের ভেতরেও বাঁধের পক্ষে শক্তিশালী লবি কাজ করে। যত বেশি বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়, ততোই নদী ও পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের বাজেট ও অর্থসমাগম বাড়ে। সুতরাং কায়েমি বস্তুগত স্বার্থ নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পথে বড় বাধা। রাজনীতিবিদেরাও নিজ নিজ এলাকায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রত্যাশায় বাঁধের সমর্থকে পরিণত হন।

দ্বিতীয় ধরণের স্বার্থ হল ভ্রান্ত স্বার্থবোধ, যার দ্বারা বহু রাজনীতিবিদ, আমলা, পেশাজীবী, ও সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হন, যদিও তারা হয়তো বাঁধ নির্মাণের বাজেট থেকে সরাসরিভাবে উপকৃত হবেন না। তারা ভাবেন, বাঁধ হলে বিদ্যুৎ হবে, সেচ হবে, উন্নয়ন হবে। কিন্তু তারা জানেন না যে, বাঁধ ছাড়াও বিদ্যুৎ হতে পারে, কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে, উন্নয়ন হতে পারে। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সচেতনতা বিস্তারের মাধ্যমে এই ভ্রান্ত বোধ হ্রাস করা যেতে পারে। কিন্ত তা সময়সাপেক্ষ, এবং তার দ্বারা প্রথমোক্ত ধরনের কায়েমি স্বার্থ হ্রাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং, দ্রুতই ভারত কর্তৃক নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থা গ্রহণ, এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের জন্য নদ-নদীসমূহের প্রবাহ উন্মুক্ত করে দেয়ার সম্ভাবনা কম।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সাম্প্রতিক আচরণ থেকে এ সত্যটি আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। তিস্তা নদী বিষয়ক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি সম্পাদনকে সুগম করার পরিবর্তে তিনি এখন আরও অভিযোগ তুলেছেন যে, ফারাক্কা বাঁধের কতিপয় কপাট জীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে বেশি পানি বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে চলে যাচ্ছে। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর দাবি তুলেছেন যাতে অবিলম্বে এসব জীর্ণ কপাট মেরামত করা হয়, এবং বাংলাদেশে গঙ্গার পানিপ্রবাহ হ্রাস করা হয়। বলা বাহুল্য, যেখানে জীর্ণ ফারাক্কা বাঁধটি সম্পূর্ণ অপসারণের সময় এসেছে, সেখানে মমতা ব্যানার্জী সম্পূর্ণ উল্টো দাবি উথাপন করছেন। আরও আশ্চর্য যে, বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীর পানি হ্রাস করাই যেন মমতা ব্যানার্জীর নতুন সরকারের অন্যতম করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বহুবিধ করণীয়র প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নদী প্রবাহ হ্রাস করার বিষয়ে তাঁর এতখানি উৎসাহ একদিকে

বেদনাদায়ক ও অন্যদিকে বিস্ময়কর। সুতরাং অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার যে, কায়েমি ও ভ্রান্ত, এই উভয়বিধ স্বার্থের মুখে শুধুমাত্র অনুরোধ-উপরোধ এবং শুভেচ্ছার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নদ-নদী উন্মুক্ত হবে না। বরং দিন দিন এসবের প্রবাহ আরও বেশি করে অপসারিত হতে থাকবে। এমতাবস্থায় নদ-নদীসমূহ ফিরে পাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য আর কী উপায়?

উপায় একটিই, এবং তা হল, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বিনিময়। এই উপলব্ধি থেকেই 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার প্রস্তাব করা হয়েছে। যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ থেকে পানি প্রত্যাহার করতে পারছে, সেই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ভারত বাংলাদেশের ওপর ট্রানজিটের জন্য নির্ভরশীল। উপরের আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ট্রানজিটের মধ্যে ভারতের গভীর স্বার্থ নিহিত। ট্রানজিট ছাড়া ভারতের ওপর প্রভাব বিস্তারের আর কোনো আইনি উপায় বাংলাদেশের পক্ষে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সুতরাং নদ-নদীর পূর্ণ প্রবাহ ফিরে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশকে ট্রানজিট ইস্যুকে ব্যবহারের কোনো বিকল্প ভারত আপাতত খোলা রাখেনি।

পরিতাপের বিষয় যে, নদ-নদীর ইস্যুতে বাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলার সরকারই এখন যেন সবচেয়ে বৈরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ট্রানজিট ইস্যুতে ভারতের পশ্চিমবাংলার স্বার্থ ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্যের স্বার্থ এক নয়। বিশেষত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের সরকার ও জনগণ ট্রানজিট ও বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগের জন্য বিশেষভাবে উদগ্রীব। মমতা ব্যানার্জী না এলেও এসব রাজ্যের বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী গত সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরকালে তার সঙ্গী হয়েছিলেন। 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলা তাদের জন্য বিশেষভাবে স্বার্থানুকূল। সুতরাং, বাংলাদেশের অবস্থানের পক্ষে পশ্চিমবাংলা সরকারের অবস্থানই এক্ষেত্রে একমাত্র নির্ণায়ক নয়। সঠিক প্রচার ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে ভারতের বহু মহলের পক্ষ থেকেই 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার পক্ষে সমর্থন অর্জন সম্ভব। আশা করা যায় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও এই ফর্মুলার যৌক্তিকতা ও আকর্ষণীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। মমতা ব্যানার্জীকেও বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশে নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস করার প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি পশ্চিমবাংলায় স্বল্পকালের জন্য শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তাতে পশ্চিমবাংলার বিশেষ কোনো প্রগতি সাধিত হবে না; এবং তাঁর নিজের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্যও তা বিশেষ সহায়ক হবে না।

কিন্তু ভারতের সরকার ও জনগণকে 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা বোঝানোর আগে বাংলাদেশের সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই আগে তা বুঝতে হবে।

অনেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং ট্রানজিটের বিনিময়ে প্রাপ্য হিসেবে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দেন। এর পেছনে যুক্তি স্পষ্ট। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশের বিপুল ঘাটতির কথা ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। ভারতে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ঘাটতি হ্রাসের প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লক্ষ করা প্রয়োজন যে, বাণিজ্যসুযোগের জন্য ঋণ, প্রভৃতির জন্য বাংলাদেশকে ভারতের ওপরই নির্ভর করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশের সঙ্গেও বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রয়াসী হতে পারে। এটা ঠিক যে, প্রতিবেশী হওয়ার কারণে ভারতে এবং ভারত থেকে পণ্য পরিবহন খরচ তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। কিন্তু পরিবহন ব্যয়ই বাণিজ্যের একমাত্র অথবা মূল নির্ধারক নয়। সে কারণেই দেখা যায় যে, ভারতের তুলনায় দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে মায়ানমার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ বাণিজ্য বৃদ্ধি করায় প্রয়াসী হতে পারে। চীনের সাথে রেল-সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে চীনের সাথে বাণিজ্য-দূরত্ব আরও হ্রাস পাবে।

একই কথা প্রযোজ্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও কারিগরি সিহায়তার বিষয়ে। বস্তুত এক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য আরও কম গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে অবকাঠামো নির্মাণে চীন অথবা কোরিয়ার ভূমিকা ইতিমধ্যেই ভারতের ভূমিকার তুলনায় অনেক বেশি। সেজন্য এ বিষয়েও ভারতের ওপর বাংলাদেশের বিশেষ কোনো নির্ভরশীলতা নেই।

কিন্তু নদ-নদীর প্রবাহের জন্য বাংলাদেশ ভারতের ওপরই মূলত নির্ভরশীল। এ বিষয়ে ভারতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের বিশেষ কোন বিকল্প নেই। সেজন্য ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছে যা দাবি করতে পারে, তার মধ্যে নদীপ্রবাহই সবচেয়ে মূল্যবান ও স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বের। এ বিষয়টি বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে। পরিতাপের বিষয় যে, ট্রানজিট ইস্যুর স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকেরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট আমলা ও উপদেষ্টাদের কেউ কেউ ট্রানজিটের বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের যে কিছু পাওয়ার আছে, সেটাই যেন ভাবতে উতসাহী নন। তাদের অনেকে ট্রানজিট ইস্যুর সঙ্গে নদীপ্রবাহের ইস্যুর কোনো সংযোগ দেখেন না। অন্যরা যখন এই সংযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তা অবহেলা করেন। এ ধরনের মনোভঙ্গী নিয়ে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের নদ-নদীর অধিকার আদায় দুরূহ।

ট্রানজিটের ইস্যুতে সরকারি আমলা ও উপদেষ্টাদের মূল মনোযোগ এখনও যেন মূলত মাশুল, শুল্ক, অবকাঠামো, ইত্যাকার ইস্যুর ওপর নিবদ্ধ। এসব ইস্যু নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করতে ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন

স্থানেই এক দেশের উপর দিয়ে আরেক দেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হচ্ছে। ইউরোপের জন্য এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। লাতিন আমেরিকার জন্যও তা প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে মেক্সিকো ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় এর উদাহরণ আছে। এসব বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে ট্রানজিট সংক্রান্ত মাশুল, শুল্ক, অবকাঠামো, ইত্যাদি ইস্যু সম্পর্কে সমাধানে পৌঁছানো খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়।

তবে লক্ষ করা দরকার যে, যে হারেই নির্ধারিত হোক-না কেন, ট্রানজিট থেকে মাশুল, শুল্ক, ও অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ খুব বেশি হবে না। বিশেষত, প্রতি বছর প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স অর্থের তুলনায় এর পরিমাণ খুব নগণ্যই হবে। সুতরাং, এই অর্থের মধ্যে ট্রানজিট ইস্যুতে বাংলাদেশের মূল স্বার্থ দেখা ঠিক হবে না। ট্রানজিট ইস্যুতে বাংলাদেশের মূল স্বার্থ নদীপ্রবাহ ফিরে পাওয়ার মধ্যে নিহিত।

কিন্তু আমলা ও উপদেষ্টারা না-বুঝতে পারলেও দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বোধকরি অনেকটা স্বজ্ঞাগতভাবেই ট্রানজিট ও নদীর মধ্যকার সম্পর্কটি কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সে কারণেই দেখা যায় যে, মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরকালে যখন শেষ মুহূর্তে স্পষ্ট হয় যে, মমতা ব্যানার্জীর বিরোধিতার কারণে তিস্তা নদী বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে না, তখন বাংলাদেশ সরকার ট্রানজিট বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনে বিরত থাকে।

এই উপলব্ধি যদি সঠিক হয়, তবে তা শুভ লক্ষণ। কিন্তু এ বিষয়ে অবস্থানটি আরও স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনগণের নিকট ও ভারতের সরকার ও জনগণের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন। নদীর পূর্ণপ্রবাহের দাবিটি বাংলাদেশকে সাহসের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। যদি জোরের সঙ্গে দাবি তোলাই না হয়, তাহলে সে দাবির পূরণ আশা করা বৃথা। ভারতকে পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন যে, নদীপ্রবাহ উন্মুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত ট্রানজিট ইস্যুতে অগ্রগতি সম্ভব নয়। শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ট্রানজিট ইস্যুতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, সেগুলো স্থগিত এবং প্রত্যাহার করে নেয়াই বাঞ্ছনীয়।

এ ধরনের পদক্ষেপ ভারত সরকারকে নদী বিষয়ক বাংলাদেশের দাবিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় প্রবুদ্ধ করতে সহায়ক হবে। ট্রানজিট ও বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহারের মধ্যে পশ্চিমবাংলার বিশেষ স্বার্থ না-থাকলেও সামগ্রিকভাবে ভারত এবং বিশেষত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের স্বার্থ প্রকট। এই স্বার্থের জন্যই শেষ পর্যন্ত ভারত নদ-নদীসমূহকে উন্মুক্ত করায় সম্মত হতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে পরস্পরের স্বার্থ রক্ষায় 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার তেমন কোনো বিকল্প নেই।

বার.

নদ-নদী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন এবং 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলা

লক্ষণীয় যে, নদ-নদী বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, ও অভিমত নদীপ্রবাহ সংক্রান্ত 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলাকে সমর্থন করে।

১৯৬৬ সনে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির বাহান্নতম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদী বিষয়ক আইন প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে 'আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহার সম্পর্কিত হেলসেঙ্কি নিয়মাবলি' (Helsinki Rules on the Uses of Waters of International Rivers) (International Law Association 1967) গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সনে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আরও বিস্তারিত 'আন্তর্জাতিক নদীর পরিবহন-ভিন্ন অন্যান্য ব্যবহার সংক্রান্ত কনভেনশন' (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) (United Nations 2005) গৃহীত হয়। যদিও পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হওয়ার কারণে এই কনভেনশন এখনো আরোপযোগ্য আইনী মর্যাদা লাভ করেনি, তা সত্ত্বেও তা সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রতিফলিত করে। (১৯৯৭ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১০৬ দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ এই কনভেনশনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।) এই কনভেনশনে 'নদীর অংশীদার দেশসমূহের প্রণিধানযোগ্য ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতা' শীর্ষক সপ্তম অনুচ্ছেদে বলা হয় যে,

অভিন্ন নদীর তীরবর্তী দেশসমূহ নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে নদীর ব্যবহার সাধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদার দেশের প্রণিধানযোগ্য ক্ষতিসাধনমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

যদি এরূপ কোনো তৎপরতা দ্বারা অংশীদার কোনো দেশের প্রণিধানযোগ্য ক্ষতি সাধিত হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষতিসাধনকারী দেশ (যদি এ ধরনের ক্ষতিসাধনমূলক ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো চুক্তি না থাকে) এই কনভেনশনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ঐ ক্ষতি নিবারণ ও প্রশমণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের বিষয় আলোচনা করবে।

এই কনভেনশনের বিশতম অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয় যে,

আন্তর্জাতিক নদীর অংশীদার দেশসমূহ এককভাবে এবং, যেক্ষেত্রে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে, যৌথভাবে নদীর ও নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশের সুরক্ষা করবে।

এই কনভেনশনের তেইশতম অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক নদীর অংশীদার দেশসমূহ এককভাবে, এবং যেক্ষেত্রে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ম ও মান অনুসরণ করে নদীর মোহনা অঞ্চল ও সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা করবে।

বলাবাহুল্য যে, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদ-নদীসমূহের প্রবাহ বিঘ্ন ও অপসারণকারী প্রতিটি পদক্ষেপ ও কাঠামো ১৯৯৭ সনের জাতিসংঘের কনভেনশন বিরোধী। এসব ব্যারাজ ও বাঁধ বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও অর্থনীতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব কাঠামো শুধু নদ-নদীর ইকোলজি ধ্বংস করে নাই, আক্ষরিক অর্থে তাদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। এসব কাঠামো নদ-নদীর মোহনা অঞ্চলের এবং সামুদ্রিক পরিবেশের ক্ষতি সাধন করেছে। এই ক্ষতির মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলের সুন্দরবনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ফারাক্কা ব্যারাজ দ্বারা বাংলাদেশের পদ্মা নদী থেকে পানি অপসারণের ফলে ইউনেস্কো চিহ্নিত বিশ্বের প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে অন্যতম এই সুন্দরবন হুমকির সম্মুখীন।

আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ভারত নদী বিষয়ক জাতিসংঘের ১৯৯৭ সনের কনভেনশন স্বাক্ষর করেনি। এই কনভেনশন অনুযায়ী নদীর ব্যবহার সম্পর্কে অংশীদার দেশসমূহের মধ্যে বিবাদ নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান আছে। কিন্তু পর্যাপ্তসংখ্যক দেশের এবং ভারতের নিজ কর্তৃক স্বাক্ষরের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য এই পথ খোলা নেই। এটাও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ভারত চায় না তার প্রতিবেশী অন্যান্য দেশও নদী-বিষয়ক জাতিসংঘের ১৯৯৭ সনের কনভেনশন স্বাক্ষর করুক। প্রথমত, বেশি দেশ স্বাক্ষর করলে এই কনভেনশন আইনি মর্যাদা পাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের নিজের ওপর এই কনভেনশন স্বাক্ষরের চাপ বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়ত, স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশসমূহ ভারতের সঙ্গে নদী বিষয়ক বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হওয়ায় উদ্বুদ্ধ হবে।

লক্ষণীয় যে, সম্ভবত ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে নদ-নদী বিষয়ক ইস্যু নিরসনের আশায়, এবং ভারতের ইচ্ছা উপেক্ষা করে বিরাগভাজন না হওয়ার চিন্তা থেকে বাংলাদেশও এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সনের কনভেনশন স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থেকেছে। বলাবাহুল্য যে, অবিলম্বে এই নীতি ও অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজন। বাংলাদেশের নিজে এই কনভেনশন স্বাক্ষর করা প্রয়োজন এবং ভারত এবং উপমহাদেশের অন্যান্য দেশকেও এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করায় উদ্বুদ্ধ করা জরুরি।

লক্ষণীয় যে, আন্তর্জাতিক নদী বিষয়ক জাতিসংঘের ১৯৯৭ সনের কনভেনশন নদ-নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীকেই উৎসাহিত করে। পূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, এই দৃষ্টিভঙ্গীই এক দেশকে নদীর অংশীদার অন্য দেশের ক্ষতিসাধন থেকে নিবৃত্ত করতে পারে; নদীর ইকোলজি রক্ষা করতে পারে; নদীর মোহনা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষা করতে পারে।

‘নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট’ ফর্মুলা ভারত কর্তৃক নদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে প্রবুদ্ধ করার একটি প্রচেষ্টা। যেহেতু ভারত নিজ থেকে প্রকৃতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে এখনো প্রস্তুত নয়, সেহেতু তার একটি বড় স্বার্থবোধের তাগিদ দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গী

গ্রহণে সম্মত করানোই ‘নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট’ ফর্মুলার অভীষ্ট। যত শীঘ্র ভারত এবং বাংলাদেশ স্বীয় স্বার্থবোধে সাড়া দিয়ে ‘নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট’ ফর্মুলা গ্রহণে এগিয়ে আসে, ততোই উভয় দেশের জন্যই মঙ্গল।

তের.

উপসংহার

বাংলাদেশ ও ভারত, এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সুসম্পর্কই কাম্য। কিন্তু বর্তমানে নদ-নদীর পানি ভাগাভাগির ইস্যু এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট’ ফর্মুলা এই বাধা অপসারণ করে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে পারে। এই ফর্মুলা অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদ-নদীর উপর নির্মিত সকল পানি অপসারণকারী বাঁধ ও কাঠামো অপসারণ করবে যাতে তাদের স্বাভাবিক পূর্ণ প্রবাহ বাংলাদেশে পৌঁছাতে পারে। ভারত প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প (অন্তত তার হিমালয়প্রসূত নদ-নদী সম্পর্কিত অংশ) বাতিল করবে। বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ট্রানজিট সুযোগ প্রদান করবে। ট্রানজিটের বিষয়ে শুল্ক, মাশুল, অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি অন্যান্য আরও অনেক ইস্যু নিশ্চয়ই আছে, এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেসব ইস্যুর মীমাংসা হতে হবে। কিন্তু মূল ইস্যুটি রাজনৈতিক এবং স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বের। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট দেয়া হবে কি হবে না, সেটি বাংলাদেশের জন্য একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নিছক শুল্ক ও মাশুলের নয়। তেমনি ট্রানজিট ভারতের জন্য একটি স্ট্র্যাটেজিক প্রয়োজন; কেননা তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং এসব রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে প্রশমিত করতে সহায়ক হবে। কাজেই ট্রানজিটের সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ইস্যু জড়িত।

বিগত দশকগুলিতে ভারত তার উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের নদ-নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মনে ভারতের এই আচরণ গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। ভারত বললেই বাংলাদেশের মনে মানুষের মনে এখন ফারাক্কা, গজালডোবা, প্রভৃতি বাঁধের কথা মনে আসে। এসব বাঁধ বহাল রেখে বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করা দুরূহ। আর সে কারণেই ভারতকে ট্রানজিট প্রদান বাংলাদেশে ভারতের প্রতি বন্ধুমনোভাবাপন্ন সরকারের পক্ষেও কঠিন হচ্ছে। এসব বাঁধ অপসারণ করলে নদীর প্রবাহ যেমন বাধামুক্ত হবে, তেমনি বাংলাদেশের মানুষের মন গলে ভারতের প্রতি প্রীতি অনুভবের জোয়ার সঞ্চারিত হবে; এবং ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বাধা অপসারিত হবে।

বিভিন্ন নদীর উপর নির্মিত বাঁধসমূহ অপসারণ করা ভারতের জন্যও কোনো সহজ কাজ নয়। এসব প্রতিটি বাঁধকে কেন্দ্র করে প্রবল কায়েমি স্বার্থের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভারতের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিটের সুযোগ ভারতকে এই ইস্যু মোকাবেলায় প্রভূত সহায়তা করবে ।

সুতরাং, 'নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট' ফর্মুলার পেছনে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। আশা করা যায় যে, দুই দেশের জনগণ এবং নেতৃবৃন্দ এই বাস্তবতা স্বীকার করে সাহসী সিদ্ধান্ত নেবেন, এবং এই ফর্মুলা গ্রহণ করে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

নির্দেশিত রচনাবলি

১. Bhattacharya, Dipen, M. Feroze. Ahmed, Nazrul Islam, and Mohd. A. Matin (editors) (2009), Climate Change and the Tasks for Bangladesh, Dhaka: BAPA and BEN

২. DeLong, Bradford (1998), Estimating World GDP: One Million B.C.-Present, Berkeley, California: University of California, Berkeley. Available fromhttp://www.j-bradford-delong.net/TCEH/1998_Draft/World_GDP/Estimating_World_GDP.html.

৩. Hughes, R., Adnan, S. and Dala-Clayton, B. (1994), Floodplains or Floodplans? A Review of Approaches to Water Management in Bangladesh, Institute of Environment and Development, London, and Research and Advisory Services, Dhaka, Bangladesh

৪. International Law Association (1967), The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, London.

৫. Islam, Nazrul (1990), Let the Delta Be a Delta! An Essay in Dissent on the Flood Problem of Bangladesh, The Journal of Social Studies, No. 48, April, pp. 18-41

৬. Islam, Nazrul (1997), Notes on Farakka: The Problem of Water Sharing between India and Bangladesh, The Journal of Social Studies, No. 76, April, pp. 1-9. Also in French as Le barrage du Farakka ou le partage de eau entre Inde et le Bangladesh, in Alternatives Sud, Vol. VIII (2001), No. 4, pp. 257-6441

৭. Islam, Nazrul (1999), Flood Control in Bangladesh: Which Way Now? Journal of Social Studies, No. 83, January, pp. 1-31

৮. Islam, Nazrul (2001), Open Approach to Flood Control: The Way to the Future, Futures: the journal of forecasting, planning, and policy, Vol. 33, No. 8 (October), pp. 783-802
৯. Islam, Nazrul (2006a), The Commercial Approach vs. the Ecological Approach to Rivers: An Essay in Response to the Indian River Linking Project (IRLP), Futures: the journal of forecasting, planning, and policy, Vol. 38, No. 5 (June), pp. 586-605
১০. Islam, Nazrul (2006b), IRLP, or the Ecological Approach to Rivers? Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 17 (April-May), pp. 17-26
১১. Islam, Nazrul (2009), Climate Change and the Tasks for Bangladesh, in Bhattacharya et al. (ed.), Climate Change and the Tasks for Bangladesh, pp. 13-35, Dhaka: BAPA and BEN.
১২. ইসলাম, নজরুল (২০১১ক), "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট," প্রথম আলো, ২৭শে জুলাই, ২০১১।
১৩. ইসলাম, নজরুল (২০১১খ), "মমতাহীনা মমতা?" প্রথম আলো, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১।
১৪. Islam, Nazrul (2011), Transit in Exchange for Rivers? The Daily Star, August 8, 2011.
১৫. Khalequzzaman, Mohamed (1994), Recent Floods in Bangladesh: Possible Causes and Solutions, Natural Hazards, Vol. 9, pp. 65-80
১৬. Khalequzzaman, Mohamed (2011), Geological Aspects of Climate Change and the Fate of the Bengla Delta, Presentation at Widrow Wilson School of International Studies, Washington, D.C.
১৭. Khatun, Tajkera (2004), The Ganges Water Withdrawal in the Upstream at Farakka and Its Impact in the Downstream Bangladesh, in M. Feroze Ahmed, Qazi K. Ahmad, and M. Khalequzzaman (eds.), Regional Cooperation on Transboundary Rivers: Impact of the Indian River Linking Project, Dhaka: BAPA, BEN, BEA, IEB, BUET, DU, and BWP, BGS, BUP, BNGA, and ASB
১৮. Lifshultz, Lawrence (1979), Bangladesh: Unfinished Revolution, London: Zed Press
১৯. Maddison, Angus (2007), Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History, New York: Oxford University Press

২০. Nakicenovic, Neboja (2009), Supportive Measures and Policies for Developing Countries: A Paradigm Shift, Background Paper prepared for World Economic and Social Survey 2009: New York, United Nations
২১. Rahman, Mustafizur (2002), Bangladesh-India Bilateral Trade: An Investigation into Trade in Services, in T. N, Srinivason (editor), Trade, Finance, and Investment in South Asia, New Delhi: Social Science Press, pp. 183-238
২২. United Nations (2005), Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, New York
২৩. United Nations (2011), The Great Green Technological Transformation, World Economic and Social Survey, 2011, New York: UN DESA (http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf)
২৪. World Commission on Dams (2000), Dams and Development: A New Framework: The Report of the World Commission on Dams, London and Sterling, VA: Earthscan (http://www.internationalrivers.org/files/world_commission_on_dams_final_report.pdf)

[লেখক: অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম; অর্থনীতিবিদ, গবেষক এবং সমাজ ও পরিবেশ কর্মী । সহ-সভাপতি, বাপা । আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক, বেন । প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র । ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ ।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের পানিব্যবস্থাপনা বিষয়ে কিছু কথা

আ ই নু ন নি শা ত

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পানিব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলতে গেলে ১. বেশ কয়েকটি বিষয়ে ধারণা নিতে হবে এবং এই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। যে কোন একটি স্থানে কোন একটি সময়ে যে-পরিমাণ পানি পাওয়া যায় তার অনেক দাবিদার থাকতে পারে এবং পানির মোট চাহিদার তুলনায় প্রাপ্যতা কম হলে সেটা সুচারু বন্টনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। আবার প্রাপ্যতা খুব বেশি পরিমান হলে বিপত্তিও হতে পারে। অন্যদিকে কোন একটি স্থানে পানির চাহিদা ও পানির প্রাপ্যতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, সহযেই বলা যায় যে বর্ষার প্রাপ্যতা ও চাহিদার সাথে শীতের প্রাপ্যতা ও চাহিদা কোনভাবেই মিলবে না। অন্যদিকে আমরা কোনপ্রাপ্যতার হিসাব করতে গিয়ে পরিমানের দিকে নজর দেই, অথচ পানির গুণগত মানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হতে পারে। প্রাপ্যতার হিসাবের সময় পানির সব উৎসকে হিসাবে নিতে হবে। চাহিদার হিসাবের সময় প্রকৃতির চাহিদার কথা আমাদেরকেই মনে রাখতে হবে। প্রথমেই কথা বলতে চাই পানির প্রাপ্যতা বিষয়ে; এ-ক্ষত্রে যে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার সিদ্ধান্তে পৌঁছা দরকার সেটি হল, ২. আমরা কোন অবস্থাতেই প্রাপ্যতা হিসাব করতে গিয়ে সারা বছরের গড় হিসাব করব না।

পানি নিয়ে ‘গড় হিসাব’ করলে মারাত্মক ভুল হবে; বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ, সেই তুলনায় এর জনসংখ্যা অনেক বেশি; এখানে স্থান ভেদে এবং কাল ভেদে পানি-প্রবাহ তথা পানির প্রাপ্যতার যে-তারতম্য-সে-বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। ‘স্থান ভেদে এবং কাল ভেদে’ কথাটি এ কারণে বলছি, শুষ্ক মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে প্লেনে যাওয়ার সময় নিচে তাকালে মনে হবে এটি একটি প্রায় মরু অঞ্চল; একই মৌসুমে যদি দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে চোখে পড়বে অনেক বিল ও জলাভূমি। আমাদের কিছু নদী আছে যেগুলো অনেক চওড়া আবার কিছু নদী আছে অনেক সরু; যেগুলোকে মনে হবে এক লাফেই পার হওয়া যায়; বর্ষা মৌসুমে দেখা যায় এসব সরু নদীগুলো পানিতে ফুলে ফেঁপে

ওঠে। একারণে পুরো দেশটাকে যারা একটি একক-এ ফেলে কথা বলেন আমি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত পোষণ করি। আমি অবশ্যই স্থানভেদে ও কালভেদে'র সমস্যাগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখতে চাই। কেননা আমাদের সমস্যার ধরন হল বছরের একসময় প্রচুর পানি, আরেক সময় পানি একেবারেই থাকে না। আমি বলব, বাংলাদেশের পানি-সমস্যা নিয়ে যারা কথা বলেন, তাদের অধিকাংশেরই অবস্থান ঢাকা বা শহরকেন্দ্রিক, গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। সে-কারণে বাংলাদেশের পানি নিয়ে তাদের ব্যাখ্যা ও সমস্যা-নির্ণয় প্রক্রিয়া এবং তাদের নির্ণীত সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে আমার ভীষণ রকমের আপত্তি রয়েছে।

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বছরব্যাপী যে ভূ-উপরিস্থ পানি-প্রবাহ হয়, তার মোট পানির শতকরা ৯২ ভাগ আসে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এবং সারা বছরের হিসাবে কেবলমাত্র শতকরা ৮ ভাগ পানি উৎপাদিত হয় দেশের মধ্য থেকে। প্রতিবছর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে-পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় সেই পানি জমিয়ে রাখা গেলে দেশ জুড়ে অন্ততপক্ষে ত্রিশ ফুট গভীরতা সম্পন্ন একটি জলাধার সৃষ্টি হবে; কিন্তু আমরা এ-পানি সংরক্ষণ করি না বিধায় এ-পানি সাগরে নেমে যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের জলাশয় অর্থাৎ নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, নালা পানিতে টইটম্বুর হয়ে থৈ-থৈ করছে; সে সময় পানি একটু বেশি হলেই বন্যার বা প্লাবনের সৃষ্টি হচ্ছে। পক্ষান্তরে সেই একই জলাশয়গুলো শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে পানিশূন্য হয়ে খটখটে হয়ে যায়। বড় নদীগুলো শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায় আর ছোট নদীগুলো হয়ে যায় প্রায় প্রবাহহীন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সারা বছরে দেশের ওপর দিয়ে সর্বমোট কতটা পানি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে সেই হিসাব আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। কিন্তু যে-কোনোভাবেই হোক সারা বছরই আমাদের ঐ সময়ে যতোটা পানি চাই ততোটা পানি পেতে হবে; এখানে পানির প্রাপ্যতার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়াতে পানির যে প্রবাহকে নদী বলা হয়, বরিশালের মানুষেরা সেটাকে নালা বলতেও রাজি নয়। উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর পানি উজান থেকে এসে ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়; আবার বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা কিংবা চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের নদীর পানি একবার উজানে যায় একবার ভাটির দিকে যায়। অর্থাৎ এসব জায়গার প্রবাহে জোয়ার-ভাটা রয়েছে। একইসাথে আমাদের মনে রাখা দরকার নদী কেবল পানিই বহন করে না, নদী পলিও বহন করে; অবশ্য 'পলি' শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে আমি একমত নই। আমার মতে, আমাদের নদীগুলো পানির সঙ্গে যা বহন করে সেটা হল 'সেডিমেন্ট;। প্রকৃতপক্ষে নদীর পানির সঙ্গে নুড়ি-পাথর, মোটা বালু, চিকন বালু, সিল্ট এবং ক্লে প্রবাহিত হয়। সিল্ট এবং ক্লে অনেকটা ভাসমান অবস্থায় থাকে। ক্লে'র পরিমাণ বেশি থাকলে পানি অনেকটা ঘোলা দেখা যায়। পানিতে ক্লে না-থাকলে অর্থাৎ মাটি না-থাকলে পানিকে স্বচ্ছ দেখা যায়। স্বচ্ছ নদীরও তলদেশ দিয়ে বালু প্রবাহিত হয়। একে পলি বললে সিল্ট নামক সেডিমেন্টের সঙ্গে গোলমাল লেগে যেতে

পারে; কাজেই 'পলি' শব্দটি ব্যবহার না-করে আমি অনেক দিন ধরেই 'সেডিমেন্ট' শব্দটি ব্যবহার করছি। এই সেডিমেন্ট এবং পানি-প্রবাহের মধ্যে নদীতে এক ধরনের ভারসাম্য থাকে। যদি নদীতে পানি-প্রবাহের তুলনায় সেডিমেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে নদীতে চর পড়ে। এই চর নদীর মধ্যে পড়তে পারে নদীর কিনারেও পড়তে পারে। যখনই চর পড়ে তখনই নদীর প্রবাহ সংকুচিত হয়। এবং পরে বর্ষা মৌসুমে নদীর প্রবাহ যখন বেড়ে যায় তখন নদী-ভাঙন শুরু হয়; কারণ তখন যে-পরিমাণ সেডিমেন্ট নদীতে থাকে, সেটা নদীর জন্য পর্যাপ্ত নয়। আবার যখন প্রবাহ কমে যায় অর্থাৎ সেডিমেন্ট বহন করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রবাহের তুলনায় প্রবাহ কম থাকে, প্রবাহের তুলনায় যদি সেডিমেন্ট কম থাকে, অর্থাৎ নদীতে যে-পরিমাণ প্রবাহ বিদ্যমান থাকে এবং সেই প্রবাহ যে-পরিমাণ সেডিমেন্ট বহন করবার ক্ষমতা রাখে তার তুলনায় নদীতে কম সেডিমেন্ট থাকলে, নদী তার দু-পাড় ভেঙে বা তলদেশ থেকে মাটি তুলে নিজের ক্ষুধা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সেডিমেন্টের অভাব পূরণ করে। সে-কারণে নদীর ভাঙা-গড়ার একটি খেলা সবসময়ই থাকে। এই খেলাটাই হচ্ছে প্রকৃতির একটি ভারসাম্যমূলক প্রক্রিয়া।

এই যে পানি-প্রবাহের প্রক্রিয়া, তার স্থান ভেদে প্রাপ্তির পরিবর্তন আনছে, কাল ভেদে চাহিদার পরিবর্তন আনছে; একইসঙ্গে চাহিদারও পরিবর্তন আনছে। আমাদের কিছু চাহিদা অপরিবর্তনশীল; যেমন, আমাদের খাবার, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির জন্য পানির চাহিদা। আবার কিছু চাহিদা পরিবর্তনশীল; জমিতে আমরা যখন ফসল ফলাই তখন কিছু কিছু সময় জমিতে প্রচুর পানি দিতে হয় আবার কিছু কিছু সময় জমিতে পানি যাতে প্রবেশ করতে না-পারে, সে-জন্য পানিকে আটকে দিতে হয়।

যখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, ভাই নদীগুলো তো শুকিয়ে যাচ্ছে তখন জবাবে তাদেরকে আমি বলি, নদী শুকিয়ে যাচ্ছে না, নদীকে আমরা শুকিয়ে ফেলছি। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে চাষবাস করার জন্য নদী-বিল-হাওড়-বাওড় থেকে প্রচুর পরিমান পানি তোলা হয়। তখন বিলগুলো শুকিয়ে ফেলছে চাষাবাদের জন্য। তাই নদী বা জলাভূমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা বা পদ্মা থেকে উজানের দেশ পানি নিয়ে নিচ্ছে বলে গঙ্গা বা পদ্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে দেখা যাবে, যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের পানি এক ফোঁটাও কমেনি, কারণ ব্রহ্মপুত্রের পানি কেউ প্রত্যাহার করছে না। তাহলে যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রকে কেন শুকনা মনে হয়; এর কারণ ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ততা অনেক বেশি ফলে শুষ্ক মৌসুমে স্বাভাবিক নিয়মে পানির স্তর নিচে নেমে যায়। ফলে ব্রহ্মপুত্রকে শুকনো মনে হয়। নদীর পানির সাথে ভূ-গর্ভস্থ পানির সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে শতকরা ৬৯ ভাগ পানি থাকে ব্রহ্মপুত্রে, ১৬ ভাগ পানি থাকে পদ্মায় আর ৫ ভাগ পানি থাকে মেঘনায়; এই হল ৯০ ভাগ পানি। অবশিষ্ট ১০ ভাগ পানি থাকে আমাদের অন্যান্য নদ-নদীতে। এই ১০ ভাগের প্রায় ৯০ শতাংশ আমরা সেচ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছি। এই কারণে ছোট নদ-নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু ছোট নদ-

নদীগুলোতে পানি নেই সেহেতু আমরা ভূ-গর্ভস্থ থেকে পানি তোলার কারণে যে শূন্যস্থান তৈরি হয় সেটা প্রাকৃতিকভাবে পূরণ হওয়ার কথা থাকলেও, ভূ-গর্ভ থেকে পানি তুলতে তুলতে এমন অবস্থা তৈরি হতে পারে যে শূন্য স্থান আর পুনর্ভরণ বা Recharge হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরগুলোতে যে পরিমাণ পানি তোলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভে কোনোভাবেই পুরোপুরি পুনর্ভরণ বা Recharge হচ্ছে না; আমি বলবো 'হয়তো' নয় বরং নিশ্চিত করেই বলা যায় অন্তত ঢাকার ভূ-গর্ভস্থ শূন্য জায়গা পুনর্ভরণ হচ্ছে না। সে কারণে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অন্যদিকে সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারে বিশেষ অসুবিধা আছে, কারণ সেখানকার ভূগর্ভের মিঠা পানি তুলে ফেললে সেখানে নোনা পানি ঢুকে যাবে। আর একবার ভূগর্ভস্থ পানি লবনাক্ত হলে তা আর মিঠা পানিতে ফিরিয়ে আনা যাবে না। সেক্ষেত্রে ওইসব এলাকায় ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করতে হবে, বৃষ্টির পানি পুকুরে ধরে রেখে ফিল্টার করে সে-পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এবারে পানির ওপর চাহিদার বা দাবিদারদের বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যাক। যে-সকল ক্ষেত্রে পানির প্রয়োজন সে-ক্ষেত্রগুলোকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি; এক. মানুষের জন্য অর্থাৎ খাওয়া, গোসল, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার; দুই. উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার; তিন. প্রকৃতির জন্য পানির ব্যবহার। উপরিউক্ত বিষয়গুলোর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি নিয়ে কথা বললে কিংবা একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলে সেটি সঠিক কাজ হবে না। এখন জাতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবকটি বিষয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দেবে নাকি প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোনো একটিকে অতি বেশি গুরুত্ব দেবে; অর্থাৎ আমাদের কি খাদ্যের প্রয়োজন আগে নাকি প্রকৃতি রক্ষার দিকটি আগে দেখতে হবে। খাদ্যের দিকটিকে অতি গুরুত্ব দেয়া হলে প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, একইভাবে প্রকৃতি রক্ষার দিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হলে খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কাজেই কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত কে নেবে? আমি যেহেতু পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করি, তাই আমার কাছে হঠাৎ করে মনে হতে পারে প্রকৃতিকে আগে ঠিক না-করে যদি পানি-ব্যবস্থাপনা করি তাহলে সেটা সঠিক হবে না। অন্যদিকে রাজনীতিতে 'খাদ্যের যোগান' বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; সে-ক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর যদি বিরূপ কোনো প্রভাব পড়েও আর তাতে যদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়,– সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি কোন দিকে যাবে? কাজেই এই পরিবেশ রক্ষা এবং খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টি যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার বর্তমান ... বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের বিদায়কালে আমাদের লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি তখন আমাদের খাদ্য উৎপাদন ছিল সাড়ে ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। (অর্থাৎ ৬৫ লাখ টন) আজকে সেই লোকসংখ্যা ৪ কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ১৬ কোটি হয়েছে। তাহলে বাড়তি এই ১২

কোটি মানুষের জন্য বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ এখন আর ৬ মিলিয়ন মেট্রিকটনে হচ্ছে না, এখন আমাদের ৩০/৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে ৪৮ সালের পরে কোনো জমির পরিমাণ বাড়েনি, কিন্তু আমাদের বাড়তি চাহিদার জন্য খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল জমি বাড়েনি অথচ খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে এটা কী করে সম্ভব হল?

এটা সম্ভব হয়েছে উন্নত বীজের কারণে; এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে, উন্নত বীজ কখনই কাজ করবে না যদি-না সার ব্যবহার করা হয়। আর বীজ এবং সার কখনই কাজ করবে না যদি পানির ব্যবহার সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা না-হয়। উচ্চ ফলনশীল ধান বেশি পানি সহ্য করতে পারে না সে-কারণে বন্যা-ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন ও অন্যদিকে পানি কম থাকলে বা না-থাকলে এ-ধরনের ফসলের ফলন বাড়তে পারে না। সে-কারণে সেচের প্রয়োজন হয়। কাজেই আমাদের দেশটা যেহেতু প্লাবনভূমির দেশ, এ কারণে এখন থেকে কয়েক শত বছর আগে থেকেই কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ তৈরি করে ফসলকে রক্ষা করত; পরে আবার প্রয়োজনমতো বাঁধকে কেটে দিয়ে জমিতে সেডিমেন্ট প্রবেশ করিয়ে জমির উর্বরতা বাড়াত। তখন ফসল হত একটা সেটা হল আমন ধান। বর্তমানে চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে একই জমিতে আমাদের ৩টি ফসল ফলাতে হয়। এই ফসল ফলানোর সাথে পানির একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণ সমতল ফসলি জমিতে বর্ষা মৌসুমে যে পরিমাণ পানি আসে, সেটা বর্ষাকালের প্রচলিত ফসলের কোনো ক্ষতি করে না; তবে ঐসব এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে আবার সেচ দিতে হয়। কিন্তু হাওড়-বাওড় এলাকাসহ যে-কোনো প্লাবনভূমির ক্ষেত্রে যদি পানির প্রবেশ বন্ধ করি তাহলেই কেবল সেখানে উচ্চ ফলনশীল ফসল ফলানো সম্ভব হয়; তবে একই সময় এসব এলাকার ফসলের ক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থাও করতে হবে। কাজেই এক্ষেত্রে নদীর দুই পাড়ে বাঁধ তৈরি করে ফসলি জমিতে পানি ঢুকতে দেয়া হয় না, যাতে বর্ষা মৌসুমে বেশি ফলন পাই এবং শীত মৌসুমে ফলন নিরাপদে তুলে আনা যায়।

সেচের ক্ষেত্রে যেখানে নদীর পানি আছে সেখানে সাধারণত নদীর পানি ব্যবহার করা হয় আর যেখানে নদীর পানি নেই সেখানে ভূ-গর্ভস্থ পানি তোলা হয়। এক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয় হল কত গভীর থেকে পানি তোলা হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি তোলার ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ২৮ ফুট নিচ পর্যন্ত পানির স্তর থেকে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হয়। এর ফলে ভূ-গর্ভে যে শূন্যস্থান তৈরি হয় (সেটা বড় শহরগুলো বাদে) মোটামুটি সারা দেশে বর্ষা মৌসুমে পুনর্ভরণ বা Recharge হয়ে যায়। এই পুনর্ভরনের বিষয়টিও পানি-প্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এবার পানির গুনগতমান নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। পানি নিয়ে জটিলতা অনেক। তার মধ্যে আরেকটি জটিলতা হল আর্সেনিক এবং লবণাক্ততা। শত বছর আগে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে পরিচ্ছন্ন পুকুর ছিল, যেখানে কেউ

গোসল করত না, থালাবাটি, কাপড় ধোয়া হত-না, এবং বাইরের কোনো পানি সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হত না। সারা গ্রামের মানুষ এ-পুকুরের পানি দিয়ে রান্না-বান্না ও খাওয়ার কাজ করত। কিন্তু বর্তমানে ঘরে ঘরে টিউবয়েল এসেছে। এসব টিউবয়েলের পানিতে দেশের অনেক জায়গাতেই আর্সেনিক দেখা দিয়েছে। আর্সেনিকযুক্ত এই পানি দীর্ঘদিন ধরে পান করে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি আর্সেনিকযুক্ত পানি সেচ কাজে ব্যবহার করার ফলে এই আর্সেনিক ফসলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কাজেই আমার ব্যক্তিগত মত হল, শতবছর আগের সেই পরিচ্ছন্ন পুকুর সৃষ্টি করে খাবার কাজে ওই পুকুরের পানি ব্যবহার করা উচিত।

আমরা যতই উন্নয়ন ও প্রাত্যহিক প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহারের কথা ভাবি-না কেন, আমাদের সবার আগে মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে ন্যূনতম পানি রাখা দরকার সেটা রেখে অবশিষ্ট পানি দিয়ে আমাদের উন্নয়ন ও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জন্য পানি-ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কেননা প্রকৃতি তার প্রয়োজনীয় পানি না-পেলে প্রকৃতির মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসবেই; আর প্রকৃতির বিপর্যয় ঘটলে সব ধরনের উন্নয়ন এমনকি আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে। সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রকৃতি নিয়ে কাজ করি বিধায় আমার সিদ্ধান্ত হল প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে সবার আগে এবং প্রকৃতিকে সাধ্যমতো ঠিক রেখে উন্নয়ন ও প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থাপনা করা সমীচীন হবে।

আজকাল আমাকে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায় হতে হয়, বাংলাদেশ সরকার এই মুহূর্তে ড্রেজিং-এর নামে প্রচুর টাকা খরচ করছে এটা কি সঠিক হচ্ছে? আমি এটিকে সঠিক বা বেঠিক বলবার আগে আমি বলব, কেবলমাত্র ড্রেজিং করা হলে সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না; নদীশাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নদীকে প্রকৃতির শর্ত অক্ষুণ্ন রেখে নদীর প্রবাহকে যদি সঠিক মাত্রায় সচল রেখে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহলে সেটিকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। যমুনার প্রশস্ততা যেখানে ১০/১৫ কিলোমিটার সেখানে পরিকল্পনা মাফিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এর প্রশস্ততা ৫ কিলোমিটারে নিয়ে আসা যেতে পারে। এ ধরনের নদীশাসনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার জায়গা সৃষ্টি হতে পারে। নতুন এই সৃষ্ট ৫/১০ কিলোমিটার প্রশস্ত জায়গা চাষাবাদ ও বসতভিটার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নদী শাসনের মধ্য দিয়ে নদীর দুই পাড়ের ভাঙন রোধ করতে হবে; বাংলাদেশে নদী-ভাঙন একটি বড় সমস্যা, ফলে এক্ষেত্রে নদী ভাঙনের মতো অনেক বড় বিপদের হাত থেকেও আমরা আমরা রক্ষা পেতে পারি। কাজেই পানি-ব্যবস্থাপনাকে কেবল একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে সেটি ভুল হবে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় : যিনি ভূ-গর্ভস্থ পানির কথা ভাবেন তিনি ভূ-উপরিস্থিত পানির কথা ভাবেন না; যিনি খাওয়ার পানির কথা ভাবেন তিনি সেচের পানির কথা ভাবেন না; যিনি সেচের কথা ভাবেন তিনি নৌ-চলাচলের কথা ভাবেন না; যিনি নৌ-চলাচলের কথা

ভাবেন তিনি প্রকৃতির কথা ভাবেন না। অন্যদিকে যিনি পানির গুণগত দিক নিয়ে মাথা ঘামান তিনি পানির পরিমাণগত দিক দিয়ে মাথা ঘামান না। আবার যিনি পরিমাণ নিয়ে ভাবেন তিনি গুণাগুণ নিয়ে ভাবেন না। আমি বলব এত মতান্তরের পরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন যে-মতের ওপর সেটা হল, 'কৃষির জন্য পানি'; যেহেতু বাংলাদেশ কৃষিভিত্তক একটি দেশ তাই সমস্ত প্রশ্নকে ছাপিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরের দিকে আমাদের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্তকে নিবদ্ধ করতে হবে সেটি হল সবার আগে কৃষিকাজের জন্য আমাদের পানির পর্যাপ্ততাকে নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় শুষ্ক মৌসুমে আমরা পর্যাপ্ত পানি পাই না; কিন্তু বর্ষা মৌসুমে আমাদের পর্যাপ্ত পানি থাকে। আমি আবারও উল্লেখ করছি যে, আমাদের শতকরা ৯২ ভাগ পানি আসে দেশের বাইরে থেকে; এই পানি আসে প্রধানত বর্ষা মৌসুমে এবং বর্ষাকালে যতটা পানি দরকার হয় তারচেয়েও অনেক বেশি আমরা তখন পাই। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে আমাদের প্রয়োজনমতো পানি পাই না। ফলে শুষ্ক মৌসুমে আমাদের পানি বাড়াতে হবে। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব; বর্ষা মৌসুমে যে-পানি পাই সেটা যদি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ছেড়ে দিতে পারি তাহলে সেটিই হবে আমাদের একমাত্র সমাধান। পানি ধরে রাখার লক্ষে প্রথমেই প্রয়োজন উজানের দেশের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার। কারণ পানি ধরে রাখার জায়গাটা পুরোটাই আমাদের দেশের বাইরে, উজানে অর্থাৎ ভারত, নেপাল ও ভুটানে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া রাজনৈতিক এই উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এরইসঙ্গে একটি মারাত্মক ভয়ের কারণ হল, ভারতের উজানে ক্রমাগতভাবে পানির ব্যবহার বাড়ছে। ফারাক্কা ব্যারেজের প্রস্তাব কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ বিভক্তির পরে গৃহীত হয়নি, তার আগে থেকেই হয়ে আসছিল; তখন বা তারও আগে অর্থাৎ মোটামুটি যদি একশ বছর আগের কথা ধরি, তাহলে দেখা যাবে, পরিবেশ নিয়ে তখন সেভাবে মাথা কেউ ঘামায়নি। এখন সেটা সবারই ভাবনার বিষয়। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে আমি মনে করি অববাহিকা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং নদী-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাই সঠিক ব্যবস্থাপনা। আমরা লক্ষ করেছি যে, গত ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেখানে অববাহিকা-ভিত্তিক এবং নদী-ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার কথা বলা আছে। অর্থাৎ ভারতকে ক্রমাগত দোষারোপ না-করে ভারতকে যদি আমাদের সহযোগিতার জন্য সম্মত করাতে পারি, তাহলে সেটিই হবে সঠিক সমাধানের উপায় বা পথ।

প্রশ্ন উঠেছে ভারতের 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' নিয়ে। বিষয়টি ভারতের দিক থেকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে, দক্ষিণ ভারতে প্রচুর উর্বর জমি আছে কিন্তু সেখানে পানির অভাব রয়েছে, সে-কারণে ভারত সরকার একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেটা হল, গঙ্গার পানি তারা উত্তর প্রদেশ ও নেপালে আটকে ফেলবে এবং খালের মাধ্যমে সেই পানি হরিয়াত্রা, রাজস্থান হয়ে গুজরাটে নিয়ে যাবে। আর

ব্রহ্মপুত্রের পানি জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ, সেখান থেকে উড়িষ্যা হয়ে ভারতের পূর্ব উপকূলে তামিলনাড়ু,অন্ধ্র প্রদেশে নিয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত ব্যায়বহুল প্রকল্প এবং এ প্রকল্প কোনোক্রমেই পরিবেশসম্মত হবে না।

এ প্রকল্প প্রণয়নে ভাটির দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশের কী অবস্থা হবে সেটা ভাবা হয়নি। একইভাবে গঙ্গার পানি যদি উত্তর প্রদেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গের কী হবে? সেটিও ভাবা হয়নি। এই প্রকল্প হল উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের ক্ষমতাশালী লোকদের পরিকল্পনা। এটা এখন ভারতের সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। আমার জানা মতে এই প্রকল্পের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। পরিকল্পনা হয়তো হয়ে আছে এক্ষেত্রে কেবল মধ্য প্রদেশে পরীক্ষামূলভাবে ছোট ছোট নদীতে কিছু কাজ চলছে। এটা নিয়ে ভারতের ভেতরেও বেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাদের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিন্তু বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়; সেটা হল এই পরিকল্পনা খোদ ভারতের জন্যও পরিবেশসম্মত নয়। আমি মনে করি, এটি ভারতের একতরফা এবং অত্যন্ত ভুল একটি পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে ভারতের আন্তঃদেশীয় সমন্বয়ের ভিত্তিতে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন একইভাবে ভারতের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে যে ৫০টি বেশি সংখ্যক নদী বাংলাদেশে এসেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মহাপরিকল্পনা হওয়া প্রয়োজন। (হালখাতার সম্পাদকদ্বয়ের দেয়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।)

[লেখক: অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, প্রাক্তন অধ্যাপক, পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।

International Union For Conservation Of Nature-Gi Country Representative ছিলেন দীর্ঘসময়। বর্তমানে ব্রাক ইউনিভার্সিটির ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নদ-নদী ও বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা সম্পর্কে রয়েছে দেশে-বিদেশের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা। কোপেনহেগেন আন্তর্জাতিক সম্মেলনসহ জলবায়ু বিষয়ে বিভিন্ন সভায় তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়

ম. ইনামুল হক

বাংলার সমভূমি এশিয়ার কয়েকটি বড় নদ-নদী, যথা ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা নদীর মিলনস্থল। এইসকল নদী ও তাদের উপনদীগুলো চীন, নেপাল, ভুটান ও ভারত থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এদের অববাহিকাগুলোর মোট আয়তন ১৭,৪৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই এলাকা থেকে বছরে গড়ে ১৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (১০৯৪ মিলিয়ন একর ফিট) জলসম্পদ সৃষ্টি হয় যা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। গঙ্গা নদী ও এর উপনদীগুলোর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ ঢাল ও মধ্যভারতের উচ্চভূমি থেকে; ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার উপনদীগুলোর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার উত্তর ঢাল ও দক্ষিণ ঢাল থেকে; মেঘনা নদী ও এর উপনদীগুলোর উৎপত্তি নাগা পাহাড়, লুসাই পাহাড় ও মেঘালয়ের উচ্চভূমি থেকে। বঙ্গীয় সমতলের অধিকাংশ নদ-নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার উপনদী অথবা শাখানদী। বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদীসমূহের অবস্থান। দক্ষিণ দিকে এই দু'টি নদীর শাখানদীসমূহের অবস্থান। আর উত্তর-পূর্ব অংশে মেঘনা নদীর উপনদীগুলোর অবস্থান। বাংলার সমভূমিতে কিছু স্বাধীন নদী পশ্চিমে ছোটনাগপুর থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং পূর্বে লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে বাৎসরিক জলসম্পদের যোগান:

মোট অববাহিকা	১৭,৪৯,০০০	বর্গ কিলোমিটার
বাংলাদেশ এলাকা	১,৪৮,৪০০	বর্গ কিলোমিটার
মোট জলসম্পদ	১০৯৪	মিলিয়ন একর ফিট
স্থানীয় যোগান	২৭৬	মিলিয়ন একর ফিট
বাহির যোগান	৮১৮	মিলিয়ন একর ফিট

বাংলার সমভূমি বিগত ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেলে এর অনেক নদ-নদীর প্রবাহপথ দুই দেশের সীমানা ভেদ করে যায়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করলে ৫৪টি আন্তর্দেশীয় নদী ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের পর্যবেক্ষণের আওতায় পড়ে। তবে ভারত ফারাক্কার নিকট গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ করে ১৯৭৫ সাল থেকে প্রায় ৪০,০০০ কিউসেক পানি সংযোগ খালের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগিরথী নদীতে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। একই ভাবে তিস্তা নদীর উপর গজলডোবার কাছে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে এর পানি সেচখালের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে চুক্তি হয়েছে, কিন্তু তিস্তা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে বিরোধ মীমাংসা এখনও হয়নি। ভারত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-দিনাজপুর জেলায় মহানন্দার পানি, দক্ষিণ-দিনাজপুরে আত্রাই ও পুনর্ভবা নদীর পানি, নদীয়ায় ভৈরব নদের পানি এবং উত্তর-চব্বিশ পরগণায় বেতনা ও কোদলা নদীর পানি বাঁধ দিয়ে প্রত্যাহার করে। এ ছাড়া ফেনী নদীর পানি পাম্প দিয়ে তুলে; গোমতি নদীর পানি ড্যামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে; বিজনী, খোয়াই, মনু ও বরাক নদের কিছু উপনদীর পানি জলকাঠামো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেচ ও শহরে জল সরবরাহের জন্য প্রত্যাহার করে।

বাংলাদেশের উজানে বিভিন্ন নদীর পানি প্রত্যাহার হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের নদীগুলো ক্রমশ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। শুধু প্রত্যাহার নয়, নদীর প্রবাহ হ্রাসের আরও দু'টি বড় কারণ নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির অতি-উত্তোলন এবং এর আশেপাশের জলাভূমিসমূহের অতি-নিষ্কাশন। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু করে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক হারে খাল কেটে জলাভূমিগুলোর পানি শুকিয়ে ফেলা ও তাতে ধানের আবাদ করা শুরু হয়। আশির দশক থেকে বাংলাদেশে শীতকালে ব্যাপক হারে বোরো ধানের চাষ হতে শুরু করে। এজন্য লে-লিফ্‌ট পাম্পের মাধ্যমে নদী ও খালের পানি উত্তোলন এবং ভূগর্ভস্থ পানি অগভীর নলকূপের মাধ্যমে তুলে সেচ দেয়া শুরু হয়। বর্তমানে এই ধরনের সেচকাজ সারা দেশব্যাপী হচ্ছে যা' নদীগুলোর প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দিয়েছে। নদীর আশেপাশের জলাভূমিগুলো অতি-নিষ্কাশন করে শুকিয়ে ধানচাষের এলাকা বৃদ্ধি করায় সেখান থেকে আর তলানি প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে নদীগুলোতে বৈশাখ মাসে আর হাঁটুজল থাকছে না। তবে এখনো বর্ষাকালে বাংলাদেশের মোট জলক্ষেত্রের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটার।

বাংলাদেশের জলক্ষেত্র

বাংলাদেশের জলক্ষেত্রের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

মোট মুক্ত জলক্ষেত্র	৪০,৪৭,০০০	হেক্টর
মোট বদ্ধ জলক্ষেত্র	৩,৫১,০০০	হেক্টর
নদী ও মোহনা	১০,৩২,০০০	হেক্টর
পুকুর ও দিঘি	২,১৫,০০০	হেক্টর
বিল ও হাওর	১,১৪,০০০	হেক্টর
বাওড়	৫,০০০	হেক্টর
কাপ্তাই হ্রদ	৬৮,০০০	হেক্টর
উপকূলীয় নিম্নভূমি	১,৪১,০০০	হেক্টর
প্লাবন ভূমি	২৮,৩৩,০০০	হেক্টর

সূত্র: কৃষি ডাইরী

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নদীগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় পরিবেশের দারুণ অবনতি হচ্ছে, জনজীবন বিপর্যস্ত ও জঘন্য হচ্ছে। নদী মরে যাওয়ার ফলে নদীনির্ভর অনেক প্রাণী ও গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ও মাছের প্রজনন হ্রাস পাচ্ছে। শহরাঞ্চলে নদীগুলোর দূষণ অবর্ণনীয়; বিশেষ করে ঢাকা শহরের আশেপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, টঙ্গী খাল ও বালু নদীগুলো মনুষ্য ও শিল্পবর্জ্যে পূর্ণ হয়ে জঘন্য নরকে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রও আইন দূষণকারীদের বিরুদ্ধে একেবারেই অকার্যকর। বর্তমানে ঢাকা নগরীতে অনেক সুদৃশ্য দালান নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর আশেপাশের নদীগুলোর দূষণ ঢাকাকে বিশ্বের নিকৃষ্টতম নগরীতে পরিণত করেছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের নদীগুলোর অতি-উত্তোলন ও অতি নিষ্কাশন অবিলম্বে বন্ধ করে এবং কার্যকর দূষণ প্রতিরোধ করে কেবল নদীগুলোকেই বাঁচানো নয়, শহর ও গ্রামের নাগরিক জীবন সুস্থধারায় প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা জরুরি হয়ে পড়েছে।

নদী ও অববাহিকা

একটি নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে ভাটির কোনো নদীতে বা সাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত তার প্রবাহপথের দু'পাশে বৃষ্টির জলসংগ্রহ এলাকাকে ঐ নদীর অববাহিকা বলে। যেমন কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা ভারতের মিজোরাম এবং বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জেলায় বিস্তৃত। একটি বড় নদীর প্রবাহপথে তার দুই তীরে অনেক ছোট বা বড় নদী (উপনদী) এসে পতিত হয়। এই নদীগুলোর অববাহিকাসমূহ যে নদীতে পতিত হল সেই নদীর অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, মেঘনা নদীর অববাহিকা বলতে ভারত থেকে আসা বরাক নদের অববাহিকা এবং সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, খোয়াই, কংস, সোমেশ্বরী ইত্যাদি উপনদীগুলোর অববাহিকা মিলিতভাবে

বোঝায়। কেবল উপনদী নয়, সাগরে পতিত হবার আগে বদ্বীপ অঞ্চলে বড় নদীর শাখাগুলোও ঐ নদীর অববাহিকা হয়। যেমন, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, চন্দনা ইত্যাদি গঙ্গা নদীর অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে অববাহিকাভিত্তিক জলসম্পদের যোগান:

গঙ্গা	৩৬০ মিলিয়ন একর ফিট	
	অববাহিকা= ৪,২০,০০০ বর্গমাইল	
	ন্যূনতম গড় প্রবাহ= ৩০,০০০ কিউসেক	৩৩%
ব্রহ্মপুত্র	৫৪১ মিলিয়ন একর ফিট	
	অববাহিকা= ২,১৩,০০০ বর্গমাইল	
	ন্যূনতম গড় প্রবাহ= ১,২০,০০০ কিউসেক	৪৯%
মেঘনা	১২৮ মিলিয়ন একর ফিট	
	অববাহিকা= ৩১,৭০০ বর্গমাইল	
	নূ্যনতম গড় প্রবাহ= ৩০,০০০ কিউসেক	১২%
অন্যান্য	৭৬ মিলিয়ন একর ফিট	
	অববাহিকা= ১৯,৩০০ বর্গমাইল	৬%

নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা

যে কেউ বলবেন বাংলাদেশের নদীগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আগে বলা হত নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে। তা-ও যে হচ্ছে না তা নয় তবে নদীগুলোর উজানে মানবসৃষ্ট বাধার জন্য নদীর প্রবাহ কমে যাচ্ছে, নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলে ষাটের দশকে দেয়া বেড়িবাঁধ স্বাভাবিক নদীপ্রবাহ নষ্ট করেছে, ফলে নদীমুখ ভরাট হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। সারা দেশে অনেক নদীতে পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ করে এবং রাস্তা তৈরি করে নদীপ্রবাহে বাধা দেয়া হয়েছে ও ভরাটের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতের দেয়া ফারাক্কার বাঁধের কারণে পদ্মা নদী বালিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদী ভরাট হবার কারণে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলো মরে যাচ্ছে। এভাবে ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন কিছু নদী যথা তিস্তা, মহানন্দা, ধরলা, দুধকুমার, গোমতী ইত্যাদির অনেকগুলোতে ভারত ব্যারেজ ও ড্যাম নির্মাণ করে পানি সরিয়ে নেয়ায় বাংলাদেশের অংশে ঐসকল নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সমতলে উজানের প্রায় ১৫ গুণ এলাকার বৃষ্টির পানি আসে, এই সাথে আসে বছরে প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন টন পলি। এই পলির একটি অংশ প্লাবনভূমির উপর

পড়ে জমির উর্বরতা ও উচ্চতা বাড়ায়, বাকিটা সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু এখন উজানে পানি সরিয়ে নেবার কারণে বর্ষাশেষে হঠাৎ নদীর পানি কমে যায়, ফলে পলির অনেকাংশ সমুদ্রে না-যেতে পেরে নদীর প্রবাহপথে জমা হয়ে যায়। এভাবেই নদীগুলো ভরাট হচ্ছে। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ছোট বড় শহরের নদীগুলো ভরাট হচ্ছে আবর্জনায় ও শিল্প- বর্জ্যে। শহরের যত কঠিন বর্জ্য সরাসরি অথবা শেষমেশ নদীতে গিয়ে পড়ছে। এর ফলে নদী তার নাব্যতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা হারাচ্ছে। ঢাকার সদরঘাটের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীর তলা প্রায় ৩ মিটার চামড়া, প্লাস্টিক, কাপড়, ধাতু, কাচ ও বিল্ডিং-ভাঙা আবর্জনা দিয়ে পূর্ণ। এই নদীতে উজান থেকে আসা পলির পরিমাণ খুবই কম। ঢাকা শহরের বালু, তুরাগ ও টঙ্গী নদী ক্রমশ আবর্জনায় বুজে যাচ্ছে।

নদীদখল সংক্রামক ব্যাধির মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব কাজের প্রধান উদ্যোক্তা রাজনৈতিক মদদপুষ্ট এলাকার দুর্বৃত্ত, শিল্প উন্নয়নের দাবিদার প্রাইভেট কোম্পানিরা, এবং অসম্ভব শক্তিধর হাউজিং কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশের কোনো আইন এদের ওপর প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। এসব দুর্বৃত্তরা সারা দেশে নদীর তলদেশ পর্যন্ত দখল করে নিচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর চতুষ্পার্শ্বসহ সারা দেশের নদী ও জলাভূমিসমূহ জনগণের মিলিত সম্পত্তি যা খাসজমি। কিন্তু সমাজের একটি বিশেষ মহল এই খাসজমিসমূহ ক্রমশ দখল করে নেয়ায় জনগণ তাদের সম্পদের ওপর ঐতিহাসিকভাবে প্রাপ্ত সুবিধা হারিয়ে ফেলছে। দেশের পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ এবং মিডিয়া এই দখলবাজদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সোচ্চার হলেও জনগণের সম্পত্তি দখল রোধ করা যাচ্ছে না।

নদী ও জলাভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, ডাঙা ও জলের জীববৈচিত্র্য ও জীবনচক্র রক্ষা করে, মানুষের খাদ্য যোগায়, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখে। কিন্তু শহর ও মফস্বলে নদীদূষণ এখন একটি সর্বগ্রাসী সমস্যা। নাগরিকদের সামগ্রিক সচেতনতার অভাব ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা না-করার সুযোগে এক শ্রেণীর মানুষের হঠাৎ আয়বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসেছে। তারা অধিক ও ত্বরিত মুনাফার লোভে নদীদূষণ করে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে এরা শিল্প-কলকারখানার অপরিশোধিত রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ করছে। ঢাকার আশেপাশের তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও টঙ্গী নদীর পানি চরমভাবে বিষাক্ত এবং আলকাতরার মতো কালো। এই বিষাক্ত বর্জ্য নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ এলাকার নদীগুলো দূষিত করে জলজ-প্রাণীসম্পদবর্জিত করেছে ও নিকটবর্তী মেঘনা নদীর মাছ প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নদীদূষণের কারণ কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষ। এইসব মিলিত দূষণ সারা দেশে বছরে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকার মাছ উৎপাদন রোধ করছে।

বাংলাদেশের ছোট নদীগুলো যে বিশেষ দু'টি কারণে মরে যাচ্ছে তা'হল অতি-উত্তোলন ও অতি-নিষ্কাশন। সত্তরের দশকে খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জোয়ার বয়ে যায়। সারা দেশের রাস্তার ধারের বরোপিটগুলো গমের মাধ্যমে কেটে ফেলার মহোৎসব হয়। এই সময় নদীর পানি লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করে সেচ দেয়া হয় এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অচিরেই ছোট ছোট নদীগুলোর পানি অতি-উত্তোলিত হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। আশির দশকে নতুন নতুন খাল খনন কর্মসূচিতে ভাটা পড়লেও পুরাতন খালগুলোর সংস্কারের নামে জলাভূমিগুলো নিঃশেষ করে ফেলা হয়। এভাবে জলাভূমির ভেতরে মাছের আশ্রয়স্থলগুলো শুকিয়ে ধানক্ষেতে পরিণত হয়।

জলাশয়সমূহ

বর্ষা আসার পরপরই বাংলাদেশের প্লাবনভূমির একটা বিরাট অংশ পানিতে ডুবে যায় এবং প্রায় চার থেকে ছ'মাস পানিতে ডুবে থাকে। যেসকল স্থান সারাবছর পানির নিচে থাকে যথা নদী, হাওর, বাওড় এবং বিল, এসব এলাকা তার অতিরিক্ত। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিগুলোর একেকটি এলাকা হাওর নামে পরিচিত। এই এলাকা ভূতাত্ত্বিক 'ডাউকী চ্যুতি'র কারণে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমশ বসে গিয়ে নিচু হয়ে গেছে। একারণে সুদূর অতীতে বঙ্গোপসাগরের তীর মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে ঠেকত। ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো দিয়ে বয়ে আসা পলি এই নিম্নভূমিগুলোকে একই সাথে ভরাট করেছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদ বিগত দুশো বছরের অধিককাল যাবৎ তার প্রবাহপথ ক্রমশ পশ্চিম দিকে যমুনা নদীর পথে সরিয়ে নিয়েছে। এখন হাওর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের ঐসকল নিম্নভূমিগুলো শীতকালে শুকিয়ে যায়, কিন্তু এদের মধ্যে অনেক বিল আছে, যেগুলো জলাশয় হিসেবে সারা বছর পানিতে ভরা থাকে। বাওড়গুলোর অবস্থান বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে; এগুলো গঙ্গা নদীর বড় বড় শাখানদী যথা ভৈরব, কালিগঙ্গা, গড়াই ও কুমার নদের পরিত্যক্ত বাঁক। এই বাওড়গুলো অতীতে তাদের মূল নদীর প্রবাহের সাথে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু ঐ মূল নদীগুলো মরে যাওয়ায় অধিকাংশ বাওড় এখন সংযোগ হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।

বিল নামের নিম্নভূমিগুলো সারা দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, বিশেষ করে বড় নদীগুলোর প্লাবনভূমিতে এবং তাদের বদ্বীপ অঞ্চলে। গঙ্গা নদীর তার গতিপথ পরিবর্তন করে তিনটি বিশাল নিম্নভূমি এলাকা রেখে গেছে। এর একটি উত্তর-পশ্চিমে (চলন বিল), অন্যটি মধ্য অঞ্চলে (আড়িয়াল বিল), এবং অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিমে (গোপালগঞ্জ এলাকা)। নদীগুলোর গতি পরিবর্তন এবং ভূমি ধসে যাওয়া উভয় কারণেই নিম্নভূমিগুলো গঠিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি পরিবর্তন মেঘনা নদীর গতিপথের দু'ধারে নিম্নভূমি রেখে গেছে। এইসকল এলাকা বর্ষা ও শরৎকালে পানির

তলায় চলে যায়। উপকূলীয় নিম্নভূমিগুলোর অধিকাংশ বেড়িবাঁধ দিয়ে ঘিরে পোল্ডার করা থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে সুন্দরবন অবস্থিত যা' দেশের সবচেয়ে বড় জলাভূমি এলাকা। এখানে অজস্র খাল এবং নদী ছড়িয়ে আছে, যারা জোয়ারের সময় সাগরের লোনাপানি বয়ে নিয়ে আসে। এখানে নানা ধরনের গাছপালা ও গুল্ম জন্মায় যারা লোনাপানি সহ্য করতে পারে। এখানে সাগর এবং খাঁড়ি উভয় পরিবেশের মাছ পাওয়া যায়, এবং কিছু কিছু জাতের মাছ কেবল এখানেই পাওয়া যায়। কক্সবাজার জেলার মাতামুহুরী নদীর মোহনাতেও একটি সুন্দরবন (প্যারাবন) আছে।

মৌসুমি জলাভূমি

বাংলাদেশে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত বৃষ্টিপাতের কম-বেশির কারণে এর জলাভূমিগুলো আকারও সারাবছর মৌসুমওয়ারি কম-বেশি হতে থাকে। শীত ও বসন্তে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম; তাই মার্চ মাসের মধ্যে সারাদেশের নিম্নভূমি ও হ্রদগুলো থেকে পানি নিষ্কাশিত হয়ে একেবারে তলায় চলে যায়। এপ্রিল মাসে কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে আবার এই নিম্নভূমিগুলো ভরাট হতে শুরু করে। এই মৌসুমে কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত হলে উত্তর পূর্বের নদীগুলোতে আগাম বন্যা দেখা দেয়। যেহেতু হাওর এলাকাগুলোর ভূমির উচ্চতা অনেক কম, তাই আগাম বন্যা যে সকল স্থানে বাঁধ নেই সেসকল স্থান ভরাট করে ফেলে। যদি বন্যার পানির উচ্চতা বেড়ে যায়, তাহলে অল্প উচ্চতার বাঁধগুলো ডুবে যায়, এবং বাঁধের ভেতরের বোরো ফসল ডুবে যায়, এভাবে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়ে যায়। মৌসুমিবন্যা আসে বাংলাদেশের দু'টি বড় নদী, গঙ্গা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানির উচ্চতা বাড়লে। এটি হয় বর্ষা ও শরৎকালে। যদিও বন্যাপ্রতিরোধ বাঁধ দেশের বিশাল এলাকা রক্ষা করে, নদীর পানির স্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া বাঁধের বাইরের জমিকে ডুবিয়ে দেয়, যা' দেশের প্রায় ২০% এলাকা। এভাবে বর্ষা ও শরৎকালে মৌসুমি জলাভূমি ১০% স্থায়ী জলাভূমির সাথে মিলে দেশের স্বাভাবিক জলাভূমি দাঁড়ায় ৩০% এলাকা।

প্রধান জলাভূমিসমূহ

দেশের প্রধান জলাভূমিগুলো সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত, যেখানে টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের সবচেয়ে নিচু এলাকা। সুনামগঞ্জ জেলার অন্যান্য জলাভূমিগুলোর নাম হচ্ছে, সাংগাইর, জেয়ালডোবা, কালনার, খাই, দেখার, নান্দাইর, নলুয়ার, চাপতির, কালিকোটা, ভরমোহনা, হালির, পাগনার, আঙ্গুরালি, করচার, শনির, মাতিয়ান, গুরমের, কানামাইয়া, পশুয়া এবং রুই হাওর। সিলেটের প্রধান জলাভূমি হচ্ছে, হাইলকার, জিলকার, পাথরচাউলি, জৈনকার, চাউলধানি, বালাই, মুরিয়া, এরালি এবং দামরির হাওর। মৌলবীবাজার জেলার প্রধান জলাভূমি হচ্ছে, হাকালুকি, কাওয়াদিঘি, কারাইয়া এবং হাইল হাওর। হবিগঞ্জ জেলার প্রধান জলাভূমি হচ্ছে, গুইঙ্গাজুরি, মকর,

সোনাডুবি এবং আমাদির হাওর। নেত্রকোণা জেলার প্রধান জলাভূমি হচ্ছে, ঘোড়াডোবা, সিঙ্গের, ডিঙ্গাপোতা, মূরালী, এবং করমোহুরী হাওর। কিশোরগঞ্জ জেলার প্রধান জলাভূমি হচ্ছে, বড় দিঘা, ঢাকির, গোপ দিঘী, বাদলা, সোনাবান্ধা, ধনপুর এবং হুমাইপুর হাওর। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রধান জলাভূমি হচ্ছে, মেদির, পত্তন এবং আকাশি শাপলা হাওর। হাওর ছাড়াও দেশব্যাপী বেশ কিছু বড় বিল আছে যথা, চাঁদপুরে ঘুঘুরাজলা, খুলনার বিল ডাকাতিয়া, সাতক্ষীরার মথুরা বিল, বাগেরহাটের কেন্দুয়া বিল, গোপালগঞ্জের বাঘিয়া বিল, পিরোজপুরের চাতার বিল, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভেওয়া বিল, রাজশাহী ও নাটোরের চলন বিল, সিরাজগঞ্জের লাউতরার পাথার, পাবনার ঘুঘুদহ বিল ও গণ্ডহস্তী বিল এবং ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের আড়িয়াল বিল।

জলাভূমির মাটি

মৌসুমি জলাভূমিগুলো যেহেতু নদীর প্লাবনভূমি, তাই এগুলো বালিমাটি বা পলিমাটি বা উভয়ের মিশ্রিত মাটিতে পূর্ণ থাকে। এর কোনো কোনো অংশে কাদামাটি থাকে যা নদীবাহিত হয়ে কোনো অংশে এসে জমে। কিন্তু বছরব্যাপী জলাভূমিতে থাকে জৈব উপাদানে পরিপূর্ণ কাদামাটির পুরু স্তর। এর কারণ নদী দূরবর্তী উৎস থেকে সূক্ষ্ম কণা ও কাদা বহন করে এনে নদী থেকে দূরে অভ্যন্তরীণ নিম্নভূমিতে জমা করে। বছরব্যাপী জলাভূমিতে আরও জমে ভাসমান জৈব পদার্থ এবং জলজ উদ্ভিদের মরা ফসিল। যে সকল মাটিতে ফসিলের পরিমাণ বেশি সেসকল মাটিকে পিট-কয়লামিশ্রিত মাটি বলা হয়। এগুলো মরা গাছপালার অর্ধকার্বনিকৃত অশক্ত স্তর, যার মধ্যে ৬০% কার্বন এবং ৩০% অক্সিজেন থাকে। দেশের দু'টি এলাকা, যথা, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট এবং পিরোজপুর এলাকা এবং সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ এলাকায় পিট-কয়লার মাটি ভূমির কাছাকাছি কয়েক মিটার গভীরেই পাওয়া যায়। পিট -কয়লার মাটি কখনো অন্যান্য জলাভূমিগুলোর চারপাশে ও কিছুটা পলি বা বালিমাটির তলায় পাওয়া যায়। এগুলো হয় যখন পার্শ্ববর্তী নদী তার প্রবাহপথ ত্যাগ করে নিকটে আসে, এবং বন্যার সময় বালি ও পলি বহন করে এনে ফসিল মাটিকে চাপা দেয়।

জলাভূমির উদ্ভিদ

হাওর এলাকার উদ্ভিদ এরকম যে, তারা পানির তলায় বাঁচতে পারে, অথবা দীর্ঘ বন্যায় টিকে থাকতে পারে। কিছু কিছু উদ্ভিদ দেশের অন্যান্য এলাকার নিম্নভূমিতেও পাওয়া যায়। ডুবে যাওয়া উদ্ভিদগুলো হচ্ছে, পানিকোলা, ঘেচু; ভাসমান উদ্ভিদ হচ্ছে, কচুরিপানা, কুরিপানা; শিকড়-গাড়া উদ্ভিদ হচ্ছে, শাপলা, পানিফল, মাখনা; প্লাবনভূমির উদ্ভিদ হচ্ছে, বিন্না, খাগ, নলখাগড়া; জলাভূমির বন হচ্ছে, হিজল, করচ, বরুণ ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল আছে, যেসব স্থান জোয়ার ও

জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায়। এর অধিকাংশ এলাকা বাঁধ দিয়ে ঠেকানো হয়েছে। যেসকল এলাকা ঠেকানো নেই সেখানে বাদাবন আছে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন এই রকমই একটি বন।

জলাভূমির পাখি

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জলাভূমিগুলো পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এই বিখ্যাত জলাভূমিগুলো হচ্ছে, টাঙ্গুয়ার হাওর, পশুয়া বিল, গুরমের হাওর, হাকালুকি হাওর, খালিয়াজুরি এলাকা, কোম্পানিগঞ্জ এলাকা, বড় হাওর, কাওয়াদিঘি হাওর এবং বালাই হাওর। রামসার কনভেনশন যা' জলজ পাখির আবাসস্থল হিসেবে জলাভূমিগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, তা' ছিল ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সভার ফল। এই কনভেনশন জলাভূমিতে পাখি গণনার এটি বিশেষ সীমা চূড়ান্ত করে যার ভিত্তিতে কোনগুলোকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দেয়া যায়। এগুলো হল যখন কোনো জলাভূমি নিয়মিতভাবে ২০,০০০ জলজ পাখি ধারণ করে; অথবা নিয়মিতভাবে কয়েকটি পরিবারের বহুসংখ্যক পাখি ধারণ করে, যা' ঐ জলাভূমির গুরুত্বের লক্ষণ, বৈচিত্র্য এবং ক্ষমতা বিষয় নির্দেশ করে; অথবা যেখানে পাখির গণনা করা হয়, এবং দেখা যায় ঐ জলাভূমি কোনো জলজ পাখি পরিবারের ১% পাখির নিয়মিত আবাসস্থল। ফ্লাড একশন প্লাবন করার সময় (ফ্ল্যাপ ৬) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯২ এবং এপ্রিল-মে ১৯৯২ দু'টি পাখি গণনা করা হয়। দেখা যায়, কেবলমাত্র দু'টি এলাকা যথা, টাঙ্গুয়ার হাওর এবং হাকালুকি হাওর ২০,০০০-এর বেশি জলজ পাখি ধারণ করে। টাঙ্গুয়ার হাওর এবং সুন্দরবনকে সংরক্ষণ করার জন্য বর্তমানে তারা রামসার সাইট হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০০০ সালে হাকালুকি হাওরকে এর জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য Environmentally Critical Area হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

Bangladesh Birds Club ১৯৮৭ সাল থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাখি-এলাকায় পাখি গণনা করে। এরা ২০০২ থেকে ২০০৪ সালে মোট ৬১টি এই ধরনের সাইটে পাখি গণনা করে যা' ২০০৭ সালে Wetlands International, Malaysia-Gi Asian Waterbird Census শীর্ষক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই ৬১টি সাইটের মধ্যে ২৭টি বরিশাল, ১০টি চট্টগ্রাম, ৭টি ঢাকা, ২টি খুলনা, ৫টি রাজশাহী এবং ১২টি সিলেট বিভাগে অবস্থিত। বাংলাদেশ বার্ডস ক্লাব ২৯৪,৮০৮টি পাখি ২০০২ সালে ৩৩টি সাইটে, ৪২৮,৬৭৪টি পাখি ২০০৩ সালে ৩০টি সাইটে এবং ৫৭০,৮৯৩টি পাখি ২০০৪ সালে ৪২টি সাইটে গণনা করে। তারা এই গণনায় ১০৫টি

প্রজাতির জলজ পাখি, ৭টি প্রজাতির মাছরাঙ্গা এবং ১১টি প্রজাতির শিকারি পাখির সন্ধান পায়। তারা দেখে, জলজ পাখিদের প্রধান হুমকিগুলো হচ্ছে অগ্রসরমান কৃষি, জলাভূমির নিষ্কাশন, দেশীয় গাছপালা বিদায় করে দিয়ে বিদেশি গাছপালা লাগানো এবং অবৈধভাবে পাখি ধরা এবং মারা।

জলাভূমির ফসল

বাংলা পঞ্জিকা একটি স্পষ্ট ফসলি পঞ্জিকা, যা' চার মাস করে আউশ, আমন এবং রবি নামের তিনটি ফসলি মৌসুমে ভাগ করা আছে। ঐতিহ্যগতভাবে আউশ ফসল উঁচু ভূমিতে চাষ হয়। আমন ফসল চাষ হয় জলাভূমিগুলোর আশেপাশে যেসব এলাকা বন্যার সময় ডুবে যায়। নিম্নভূমিগুলোর তলা এবং জলাভূমিগুলোতে জৈব উপাদান জমা হওয়ায় প্রচুর উর্বর থাকে। যে সকল ধান শীতকালে হাঁটুপানির জলাভূমি এলাকায় আবাদ করা হয় তাদেরকে বোরো ধান বলা হয়। জলাভূমিগুলো নিষ্কাশিত করে এবং সেখানকার জমি আবাদযোগ্য করে বোরো ধান করার এলাকা বৃদ্ধি করা যায়। এভাবে, বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ ধানকেও বাছাই করে রবি মৌসুমের শেষে অথবা আউশ মৌসুমের পূর্বেই লাগানো হয়ে থাকে। এই ধরনের চাষকে এখন বোরো ধানের চাষ হিসেবেই গণ্য করা হয়। এসব ধানে ভূগর্ভস্থ জল তুলে অথবা পার্শ্ববর্তী নদী থেকে পানি তুলে সেচ দেয়া হয়। সমস্যা হল, যদি দেরি হয়ে হয়ে যায় তা'হলে এই বোরো ধান গ্রীষ্মের আগাম বন্যায় মার খেতে পারে।

বোরো মৌসুমে যেসকল ধান উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে হাসি (বিআর-১৭), শাহজালাল (বিআর-১৮) এবং মঙ্গল (বিআর-১৯) প্রজাতির ধান হাওর এলাকায় চাষের জন্যে শ্রেয়। এইসকল প্রজাতির ধানের জীবনকাল কম; তাই, বসন্ত শেষ হবার কালে সম্ভাব্য আগাম বন্যার আগেই কেটে নেয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে বিআর-১৪, বিআর-২৬, বিআর-২৯, ইত্যাদি প্রজাতির কিছু ধান হাওর এলাকায় প্রবেশ করানো হয়েছে, যাদের ফলন অনেক বেশি। কিন্তু এসব ধান চাষে অন্যদের চেয়ে বেশি বন্যার ঝুঁকি নিতে হয়, কারণ তাদের জীবনকাল বেশি। বোরো ধান চাষে উৎপাদন বেশি হয়, যথা এর বর্তমান গড় উৎপাদন ৩.৫৮ টন প্রতি একর, যেখানে আউশ ও আমনের গড় ২.০৬ টন প্রতি একর। এই উৎপাদন ৪.০ থেকে ৫.০ টন প্রতি একর করা যায়, যদি অধিকতর জমিতে বোরো চাষ বিস্তৃত করা যায়, এবং ভালো পানি ব্যবস্থাপনার সাথে প্রতি হেক্টরে বেশি সার দেয়া যায় (৩০০ থেকে ৩৫০ কেজি)। আমাদের দেশে জমিতে সার দেবার বর্তমান গড় পরিমাণ ৬০ কেজি প্রতি হেক্টর।

জলাভূমির বর্তমান অবস্থা

নদীসমূহের উজানে অবস্থিত জলাভূমি ঐ নদীর জলের উৎস এবং আধার। এইসব জলাভূমির নিষ্কাশন পথ থাকে যা' নদীদের উৎপত্তিস্থল। সকল নদীমুখে একটি তলানি প্রবাহ থাকে, যা' এত কম হতে পারে যে তা' নদীর তলদেশের মাটির তলা দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে, এবং ভাটিতে কোথায়ও গিয়ে তা' বেরিয়ে আসবে। যা'হোক, জলাভূমিগুলোর আধার ক্রমশ তাদের তীরবর্তী এলাকায় অতি-উত্তোলনের ফলে এবং তাদের বাহির-পথ দিয়ে অতি-নিষ্কাশনের জন্যে ক্ষীয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ জলাধার থেকে অতি-উত্তোলন সাধারণত সেচের জন্যে করা হয়ে থাকে। আর, কোনো জলাধারের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সেচ বা জল সরবরাহের জন্যে যদি ভূগর্ভস্থ জলের অতি-উত্তোলন করা হয়, তাহলে জলাধারের পানি মাটির গভীরে বেশি প্রবেশ করবে ও জলাধারের পানির উচ্চতা নেমে যাবে। বাংলাদেশের উত্তর, পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বহু জলাভূমি এই ধরনের উত্তোলনের ফলে শুকিয়ে গেছে। জলাভূমি গুলোর নিষ্কাশন খালের পলি অপসারণের নামে কখনো শ্রমিক লাগিয়ে কখনো যান্ত্রিক ড্রেজার লাগিয়ে এগুলো কেটে অতি-নিষ্কাশন করা হয়। বহু লোকজন, বহু টাকা, এবং দুর্নীতি কাজ করে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে। এটাই হল জলাভূমিসমূহের শুকিয়ে যাওয়া আর পরিবেশের ক্ষতি হবার মূল কারণ। এটি বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যা। চাষের জমি বৃদ্ধির নামে অতি-নিষ্কাশন করায় প্রধানত উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ বাংলাদেশের বহু স্থানে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে গিয়েছে।

হাওর এলাকায় বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্যে নদীতীরে যে বাঁধ নির্মাণ করা হয় তা' অল্প উচ্চতার হয় এবং তাতে নিষ্কাশন কাঠামো থাকে। হঠাৎ বৃষ্টি হলে বাঁধের ভেতরের পানি এই কাঠামো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মের শুরুতে হঠাৎ বন্যা এসে গেলে তা' এই নিষ্কাশনপথ রোধ করে দেয়। তাই চাষিরা ধান পাকার সময় ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে থাকে, কারণ ঐ সময় জলাভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা ৩ থেকে ৬ মিটার বৃষ্টির পানি অথবা বন্যার পানিতে কয়েক দিনের মধ্যে ডুবে যেতে পারে। বসন্তঋতু শেষ হলেই নদীতে বন্যার পানি আসতে শুরু করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকাগুলো খুবই নিচু, সুনামগঞ্জ জেলার ভূমি গড় সমুদ্রতল থেকে মাত্র ২ থেকে ৪ মিটার উপরে অবস্থিত। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা (বন্যায় ডুবে যাওয়া বাঁধ) যথাযথ মনে হয়। যেহেতু এলাকাগুলো নিচু, তাই এসব এলাকা কেবল শীতকালেই জেগে ওঠা সম্ভব, যখন নদীতে পানিতে কম থাকে। তাই হাওর এলাকাগুলো বছরে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য একটি ফসলেরই উপযোগী।

[লেখক: ম. ইনামুল হক। প্রকৌশলী । চেয়ারম্যান, জল পরিবেশ ইন্সটিটিউট।]

নদী মরলে মানুষ কী করে বাঁচে?

আ নু মু হা ম্ম দ

বাংলাদেশ নদীনালা খালবিল ভরা একটি দেশ হিসেবে পরিচিত। এখন বলতে হবে যে, নদীনালা খালবিলে 'ভরা ছিল' এই দেশ। আগের বহু নদী শুকিয়ে গেছে কিংবা আধমরা হয়ে আছে। একের পর এক পাকা বাঁধ, স্লুইস গেট বা বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প আটকে দিয়েছে অনেক প্রবাহ। বরাল নদী এর এক ভয়ংকর চিহ্ন। অনেক খাল-বিলও হয় শুকিয়ে গেছে নতুবা যাওয়ার পথে। ডোবা-জলাশয় যেগুলো আবার নানাভাবে পানিপ্রবাহের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে সেগুলোর অনেকগুলোই এখন অট্টালিকার নিচে হারিয়ে গেছে কিংবা সড়ক বা আশেপাশের কোনো নির্মাণকাজের জন্য মুচড়ে গেছে। নদীনালা-খালবিল-ডোবা-জলাশয়ের এই অকাল মৃত্যু কিংবা হাত-পা-বাঁধা পঙ্গু অবস্থার কারণে তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছে ভয়াবহ। বন্যা আর ভাঙন দুটোই বেড়েছে। বেড়েছে জলাবদ্ধতাও। জলাশয় আর খাল ঢাকা শহরের অতীত। অট্টালিকা আর জৌলুসের আড়ালে বাড়ছে বিপদ।

এরকম যুক্তি আসতে পারে যে, বন্যা এবং ভাঙন তো কেবল আজকের ঘটনা নয়। যখন নদীর ওপর বা পানির স্বাভাবিক প্রবাহের ওপর মানুষ কোনো হামলা করেনি, যখন মানুষ সেই ঔদ্ধত্য দেখাবার মতো ক্ষমতা অর্জন করেনি বা প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে পারেনি তখনও বন্যা হয়েছে, ভাঙন হয়েছে, নদীর গতিপথ বদলে গেছে, নদী মরেছেও। তাহলে? এখান থেকে সিদ্ধান্ত একটাই আসতে পারে যে, এইসব ঘটনা নিছকই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক ঘটনা। এবং মানুষের দুর্ভাগ্য। মানুষের এখানে কিছু করবার নেই।

বিশেষভাবে খেয়াল করবার ব্যাপার হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করবার জন্য, নিজেদের অসহায়ত্ব এবং কথিত 'দুর্ভাগ্য' দূর করবার জন্য মানুষ নানা পথ অনুসন্ধান করেছে, নানারকম যে উদ্যোগ নিয়েছে তার বয়স দীর্ঘ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এসব উদ্যোগ মানুষকে অনেক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার পথ দেখিয়েছে, অনেক 'দুর্ভাগ্য' মানুষ অতিক্রম করেছে। কিন্তু সেই উদ্যোগ যখন হস্তক্ষেপ-এর আকার নিয়েছে, যখন তা বোঝাপড়ার সীমা অতিক্রম করেছে তখন তার ফল হয়েছে উল্টো। দুর্যোগ আর দুর্ভাগ্য আরও বেড়েছে। বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকে যা হয়েছে তা এর প্রমাণ।

আমরা পর্যালোচনা করলে দেখব যে, বিশেষত নদীর আর সেইসঙ্গে বন, পাখিজগতের বিষণ্ন কিংবা বিপর্যস্ত চেহারা লাভ এই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নপ্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। যারা এদেশের গত কয়েকদশকের উন্নয়নপ্রবাহের শারীরিক বা জ্ঞানগত অংশীদার এবং দেশি-বিদেশি যারা এর সুফলভোগী, তারা বলে থাকেন যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীশাসন দরকার ছিল, কৃষিব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নদী নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ দরকার ছিল। বলেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ দরকার ছিল। বলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বাঁধ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অপরিহার্য ছিল। বলেন বসতির প্রয়োজনে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বন ধ্বংস না-করে, পানি লবণাক্ত না-করে, জলাশয় ভরাট না-করে উপায় কী ছিল?

এগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। আমাদের সকল মানুষের জন্য খাদ্য দরকার, আমাদের জীবন আরও গতিশীল করবার জন্য বিদ্যুৎ দরকার, আমাদের বন্যার প্রকোপ থেকে বাঁচা দরকার, আমাদের সীমা বাড়ানো দরকার যোগাযোগ বাড়ানো দরকার, আমাদের বসতি দরকার। আমরা তো অযান্ত্রিক যুগে ফেরত যেতে পারি না। পারি কি? অনেকে রোমান্টিকভাবে সেই যুগে ফেরত যাবার জন্য পেছন ফিরে বসে আছেন কল্পনায় সৃষ্টি করছেন এক সুখময় স্বর্গজগৎ, আক্ষেপে কাতর হচ্ছেন। কিন্তু প্রথমত ইচ্ছা করলেই পেছনের জগতে যাওয়া যাবে না; দ্বিতীয়ত মানুষ সেই জগতের অসম্পূর্ণতা সীমাবদ্ধতা বৈরিতা শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা ও অপমানের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির চেষ্টা করতেই করতেই এ পর্যন্ত এসেছেন। অতীতের যে ভয়াবহতা, রোমান্টিকতা দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলা যায় না। বর্তমানের নতুন অসঙ্গতি দেখে পেছনে যাবার ঘোর সৃষ্টি করে বসে থাকার চাইতে দরকার এই অসঙ্গতি বোঝা এবং তা দূর করবার রাস্তা খোঁজা। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল, প্রকৃতি ও তার থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের সৃজনশীল এবং গতিময় ভারসাম্য কেন সম্ভব হবে না? বাধাটা কোথায়?

এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং ক্ষমতাবান আন্তর্জাতিক সংস্থা-গবেষক-সরকার-বৃহৎ মালিক প্রভৃতির কথাবার্তা যুক্তিবিন্যাস থেকে তো এই প্রশ্নই প্রবল হয়ে উঠে যে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য, তার জীবনে আয়েশ আনবার জন্য, মানুষের জীবন সম্প্রসারণের জন্য, নতুন দিগন্ত উন্মোচনের জন্য কি তবে নিজের জীবনের প্রাণই বিনাশ করতে হবে? প্রকৃতি ধ্বংস হবে, নদীনালা খালবিলসহ পানিপ্রবাহ বিষাক্ত হবে, সবুজ গাছপালা হলুদ হবে কিংবা শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত হবে, পাখি ছটফট করতে করতে মরবে কিংবা পালাবে, নতুন সাজে সজ্জিত ফসল ফল ভেতরে বিষ নিয়ে হাজির হবে চোখহারানো মানুষের সামনে। এছাড়া আর কোনো গতি নেই? তবে কী জ্ঞান অর্জন করল মানুষ লক্ষ লক্ষ বছরে? এটাই তবে উন্নয়ন? বটেই, বর্তমান অধিপতি জ্ঞান অনুযায়ী এটাই উন্নয়ন। কিন্তু এটা আসলে কী?

দুই.

বন্যার ইতিহাস যেমন প্রাচীন, বাঁধের ইতিহাসও তেমনি প্রাচীন। বাঁধ ছাড়াও অন্য নানা ব্যবস্থা মানুষ গ্রহণ করেছে জমির ফসল-ঘরবাড়ি-বসতি রক্ষা বা ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টায়। সেসব চেষ্টার মধ্যে নানা পরিবর্তন সংশোধন ও পরিমার্জন দেখা যায়। তবে এসবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল অস্থায়িত্ব এবং স্থানিকতা। নিয়ন্ত্রণ যেহেতু স্থায়ী ছিল না এবং যতটুকু ছিল তা-ও ছিল স্থানিক তার ফলে নদীর প্রবাহের উপরও কোনো স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি। ফলে প্রতিক্রিয়া হয়েছে এখনকার তুলনায় অনেক কম, যখন বাঁধ মানেই একটি স্থায়ী প্রতিরোধ।

বাংলাদেশে স্থায়ী বাঁধসহ ব্যাপকভাবে কনক্রিটের নানা কাঠামো নির্মাণের শুরু পঞ্চাশ দশকে। শুধু পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ সহ) নয় ভারতসহ আরও অনেক দেশেই আমরা এই দশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমধর্মী উদ্যোগ দেখি । প্রকৌশল দৃষ্টিভঙ্গীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য এটি ছিল অভিন্ন অপরিহার্য ব্যবস্থা। তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন চিন্তার সঙ্গেও এই হস্তক্ষেপমূলক আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাবলি ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ:

১.যান্ত্রিক প্রকৌশল দৃষ্টিভঙ্গী নদীকে পানি হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, জীবন্ত নদী হিসেবে নয়, সমগ্র প্রকৃতির অংশ হিসেবে নয়।

২.তার ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নদীর সঙ্গে অন্য আরও হাজারো জীবন্ত সত্তার যোগ দেখতে ব্যর্থ হয়।

৩.এই দৃষ্টিভঙ্গি নদীর বিভিন্ন অংশকে কম্পার্টমেন্ট হিসেবে দেখে, দেখে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকারে।

তার ফলে তার কর্মপদ্ধতি উপেক্ষা করে অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন নদীর প্রবাহকে।

৪.এই দৃষ্টিভঙ্গি হিসাব করে ঐ কম্পার্টমেন্ট-এ এবং স্বল্প মেয়াদে (কিংবা স্বল্প মেয়াদ থেকে প্রজেকশন

করে দীর্ঘমেয়াদে) কত ব্যয় হল, কত লাভ হল। এই লাভ-ক্ষতির যে আরও এলাকা আছে এবং আরও লম্বা মেয়াদ আছে তা হিসাবে আসে না।

যে উন্নয়ন দর্শন সেসময় বাংলাদেশ সহ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) উত্তর-উপনিবেশ দেশগুলোতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তা ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গীরই সহযোগী। এই উন্নয়ন দর্শন ছিল উপনিবেশ থেকে সদ্য 'স্বাধীনতাপ্রাপ্ত' দেশগুলোতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান বিকশিত করা, একই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী কেন্দ্র বা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এগুলোকে নতুনভাবে সমন্বিত করা এবং এমন একটি সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করা যারা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার যুক্তি হিসেবে লর্ড কর্নওয়ালিস যা বলেছিলেন,

‘নিজেদের স্বার্থেই আমাদের টিকাইয়া রাখিবে’। এই উন্নয়ন দর্শন আবার যে অর্থশাস্ত্রীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটি এখন বিশ্ব-ক্ষমতায়। এই অর্থশাস্ত্র,

প্রথমত, সকল তৎপরতার প্রাণ এবং শেষ গন্তব্য হিসেবে মুনাফাকেই প্রথম ও শেষকথা মনে করে। যা কিছুই মুনাফার মাধ্যমে মূলধন সংবর্ধন করতে পারে সেটাই এই অর্থশাস্ত্র ধন্য ধন্য রব দিয়ে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, এই শাস্ত্রে ব্যক্তিই মূল ইউনিট। সমষ্টি ব্যক্তির যোগফল ছাড়া আর কিছু নয়।

তৃতীয়ত, প্রকৃতি এখানে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র ভিন্ন কিছু নয়।

চতুর্থত, দুনিয়ার সকল কিছুই বিক্রিযোগ্য।

পঞ্চমত, দুনিয়ার সকল কিছুই ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে আনা সম্ভব। এবং

ষষ্ঠত, ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন ও বিতরণ সবচাইতে দক্ষ ও কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা।

আমরা বর্তমানে উন্নয়ন তত্ত্ব বা আধুনিকতার তত্ত্ব হিসেবে যেগুলোকে দেখি সেগুলোর উদ্ভব ৪০ দশকের শেষদিকে বা ৫০ দশকে। সময়কালটি তাৎপর্যপূর্ণ। বহুদেশ তখন ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসছে এবং প্রয়োজন গুরুতর এসব দেশকে বৈশ্বিক অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা, পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে সজীব রাখা। সেই নিয়তেই এসব তত্ত্বের উদ্ভব এবং কেন্দ্র সংস্থাগুলো কর্তৃক আদৃত হওয়া। বলাই বাহুল্য যে, সব তত্ত্ব এককথা বলে না বা একইভাবে ‘অনুন্নত’ দেশগুলোর ‘উন্নয়ন যাত্রা’ বিশ্লেষণও করে না। কিন্তু তারপরও এসব তত্ত্বের কেন্দ্রীয় সুরের মধ্যে অভিন্ন তাল-লয় পাওয়া যায়। অভিন্ন তাল-লয় আসে অভিন্ন মতাদর্শিক অবস্থান-অভিন্ন অনুমিতি, লক্ষ্য, অগ্রাধিকার এবং অভিন্ন কেন্দ্র-র কারণে।

সবগুলো তত্ত্বেই কমবেশি বলা হচ্ছে: (১) উত্তর-উপনিবেশ দেশগুলো অনুন্নত বিভিন্ন দিক থেকে। এর কেন্দ্রীয় সমস্যা হচ্ছে ‘পুঁজি’র অভাব, দক্ষতার অভাব, অধিক জনসংখ্যা। (২) কেন্দ্র থেকে যদি পুঁজি ও বুদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন নেয়া হয় তাহলেই কেবল সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। (৩) এই পুঁজি ও অন্যান্যের যোগান হতে পারে দুটো পথে: এক. ‘বিদেশি সাহায্য’ এবং দুই. ‘বিদেশি বিনিয়োগ’। বিশ্বাসটা এভাবেই দাঁড়ায় বা দাঁড় করানো হয় যে, যে কোনো ভাবে এগুলোর প্রবাহ হোক-না কেন তা এসব দেশের মূল সমস্যা দূর করবে এবং এর মধ্য দিয়ে ‘অনুন্নত’

দেশ শনৈ শনৈ উন্নতি করতে থাকবে। আর (৪) বাজার ও ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশই উন্নয়নের পথ। এবং (৫) জ্ঞানের কেন্দ্র যেহেতু ঔপনিবেশিক কেন্দ্র, আর 'উন্নয়ন' যেহেতু তাদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত সুতরাং এবিষয়ে শিক্ষা-জ্ঞান-বুদ্ধি-পরামর্শ তারাই দেবেন, সেক্ষেত্রেও 'বিশেষজ্ঞ' 'তদারককারী' প্রধানত সেসব অঞ্চল থেকে আসবেন। ক্রমে তাদের মতো জ্ঞানী-গুণী বিশেষজ্ঞরা এসব দেশেও তৈরি হবে তখন আরও সুবিধা হবে।

'অনুন্নত' দেশ শনৈ শনৈ উন্নতি করতে থাকবে মানে-হতে থাকবে ক্রমান্বয়ে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোর 'মতো'। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, 'মতো' মানে বাস্তবে যা দাঁড়িয়েছে তা হল পোশাক, ভাষা, ভবন, শোওয়া, খাওয়া, গাড়িবাড়ি, চিন্তা... । আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিংবা শিল্পভিত্তি কিংবা শিক্ষা-স্বাস্থ্য ভিত্তি? দূরস্ত! এবং অনাবশ্যক!!

ক্রমে এসব তত্ত্ব আরও সমৃদ্ধ হয়েছে, সংযোজিত হয়েছে নতুন অনেক কিছু। বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক-তদারককারী এবং বহুজাতিক সংস্থার রাস্তা পরিষ্কারকারী ও লবিস্ট হিসেবে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ কেন্দ্রীয় ক্ষমতাধর সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে বা আগে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএইডসহ তার যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এডিবি সহ বিবিধ আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক ঠিকাদার বা লবিস্ট সংস্থা। একে একে এসেছে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্যাপ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার নানা কর্মসূচি (ফ্যাপ) এবং দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা হ্রাসকরণের নানা আয়োজন (প্যাপ)। শেষে আগের সবকিছু মিলিয়ে, স্যাপ-ফ্যাপ ও প্যাপ মিশিয়ে, নতুন চিনিমাখা মোড়ক লাগিয়ে আবির্ভূত হয়েছে পিআরএসপি। তারপর? একই বস্তু নানাভাবে পরিবেশন।

তিন.

৫০ দশক থেকে বাংলাদেশে, তৎকালীন পাকিস্তানের কাঠামো থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত উন্নতি কম হয়নি। এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা 'পুঁজি' এসেছে, তার সঙ্গে অসংখ্য 'বিশেষজ্ঞ' এসেছে, আর দেশের মধ্যে সেই জ্ঞান, দৃষ্টি, ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন একটি 'সিভিল সোসাইটি' গড়ে উঠেছে। আর এদের, দেশি-বিদেশি সম্মিলিত মহিমায়, কাজ, উন্নয়ন, জ্ঞান, কর্মের ফলাফল আমাদের সামনে। এসবের একটি বড় ক্ষেত্র ছিল এবং আছে বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) ব্যাপক বন্যা হয়। পাকিস্তানে সেসময় প্রবল দাপটে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনশক্তি তৈরি এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণে মার্কিনি বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞরা কাজ করছিল। বস্তুত এই বন্যার পর বাংলাদেশে পানিসম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ তৈরি হয়। জে.এ.ক্রুগ-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন এসে বন্যা নিয়ন্ত্রণ-এর বিষয়ে অনুসন্ধান এবং সুপারিশ

করেন। রিপোর্টে সর্বব্যাপী একটি প্রস্তাবনা উপস্থিত করা হয়। বস্তুত এই প্রস্তাবনাই বাংলাদেশে পানি সম্পদের ওপর একদেশদর্শী যান্ত্রিক আগ্রাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ শুধু নয় এর সাথে ক্রমে যুক্ত হয় সেচ প্রকল্প। বিশ্বব্যাপী 'সবুজ বিপ্লব'-এর মাধ্যমে প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক কৃষির প্রবর্তন, ৬০-এর দশকে যার শুরু, তার সঙ্গে এর যোগাযোগ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুতরাং এটা ধারণা করা খুবই সঙ্গত যে, আন্তর্জাতিক মনোযোগ বন্যা নিয়ন্ত্রণের চাইতে সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থার দিকেই ছিল। আর এই মনোযোগ নিছক বন্যা সমস্যার সমাধান নয়, প্রান্তস্থ দেশগুলোতে নতুন পর্বের ভিত্তি স্থাপনই বটে।

ক্রুগ কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা) প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৫৯ সালে। পানি বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবার জন্য এই সংস্থার সঙ্গে প্রথম থেকেই কনসালট্যান্ট হিসেবে সংযুক্ত ছিল একটি মার্কিনি প্রকৌশল কোম্পানি, যার নাম: ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। বিশ বছরের মাস্টার প্ল্যান তৈরি শেষ হল ১৯৬৪ সালে। ১৯৮৫-এর মধ্যে ৩২ লাখ একর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ছিল এর লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে ৫১টি বড় প্রকল্প নেয়া হয় যার মধ্যে বড় বড় নদীগুলোর সবগুলোই ছিল। একদিকে হল বিভিন্ন ধরনের নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে হল ভূ-উপরিস্থ পানিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা, বাধাগ্রস্ত করা। নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন।

খরস্রোতা নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি পরিচিত পদ্ধতি। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কিন্তু এর ফলে যাদের লাভ হয় আর যাদের ক্ষতি হয় তারা যদি ভিন্ন হয় এবং যে লাভ হয় আর যে ক্ষতি হয় তার হিসাবে ক্ষতি যদি বেশি হয় তাহলে তা ভয়ংকর বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশে এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ বর্তমান রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা থানার কাপ্তাই গ্রামে কর্ণফুলি নদীর উপর নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে এর নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বাঁধের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল: বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ও পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নৌপরিবহনের সুবিধা বৃদ্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে প্রবেশসুবিধা এবং পরে যা যুক্ত করা হয়েছিল মৎস্যচাষ। লক্ষ্য আংশিক পূরণ হয়েছে তবে এখন আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রচলিত লাভক্ষতির হিসাবে প্রকল্পের শুরুতে এখান থেকে যত লাভের কথাই বলা হয়েছে সেটিও ঠিক প্রমাণিত হয়নি। দেখা গেছে লাভের দিক কমে গেছে, ব্যয়ের দিক বেড়েছে। কিন্তু এই হিসাবের বাইরেও এর তৎক্ষণাৎ ও দূরবর্তী ফলাফল হয়েছে ভয়ংকর।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের পূর্ণ সমর্থন ও জ্ঞান-ঋণ (পুঁজি) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বাঁধ, যা বিশাল উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত, তা খোলা চোখে দেখলে উপস্থিত হবে শুধু মানববিধ্বংসী বা প্রকৃতি-বৈরী নয় বর্ণবাদী জাতিবিদ্বেষী একটি প্রকল্প হিসেবেই।

বাঁধের মাধ্যমে কাপ্তাই লেক নামে যে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয় তাতে পুরনো রাঙামাটি বিলুপ্ত হয়। এক লাখ একর আবাদি জমি ডুবে যায়। একলাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। আর বিদ্যুৎ, যা হয় চলে যায় বাইরে। কাপ্তাই লেক হয় পর্যটন স্পট! এটি নিয়ে আরও বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র দাঁড় করানোর জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে। এই বাঁধ পুরো অঞ্চলে জাতিগত অবিশ্বাস, দূরত্ব, বিদ্বেষ ও সহিংসতার রক্তাক্ত অধ্যায়ের যে একটি কারণ তা কে অস্বীকার করতে পারে? এর মূল্য কত? পরিমাপ করাই খুব কঠিন। সমতল এলাকার বাঁধগুলোর অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন দিক থেকে কথিত 'লাভ'-এর ব্যাখ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

চার.

বাংলাদেশের জমিতে সেচ আজকের কথা নয়। বিশেষ করে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ প্রয়োজন হয়ই। হাজার বছরের এই সেচব্যবস্থা বরাবরই ছিল অনাড়ম্বর এবং এতে ভূ-উপরিস্থ পানিই ব্যবহার হত। তার মানে নদী, নালা, খাল, বিল-এর পানিই বিভিন্ন অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমি পর্যন্ত নেয়া হত। এসব পদ্ধতির মধ্যে খাল খনন, নালা কাটা, পানি জমিয়ে রাখা, সেখান থেকে পানি জমিতে দেবার জন্য মাটি-কাঠ-বাঁশের নানা মাধ্যম (দোন, সেউতি, কলসি) ব্যবহার করা ছিল অন্যতম। বাংলাদেশে যেসব প্রজাতির ধান চাষ হত তার সঙ্গে এই ধারার সেচ ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সুলভ করে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিতে তাকে ধানের গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার এই কাজে সামগ্রিক পানি-জমি-প্রাণী ভারসাম্যে কোনো বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা ছিল না।

এই সেচ পদ্ধতি অকার্যকর হয়ে গেল নতুন 'উচ্চ ফলনশীল (উফশী)' বীজের চাষের ক্ষেত্রে। হাজার বছরের জৈব সার পদ্ধতিও অকার্যকর হয়ে গেল এই বীজের ক্ষেত্রে। এই বীজের চাহিদা ভয়ংকর। আর কথিত সবুজ বিপ্লবের কেন্দ্র হচ্ছে এই বীজ। এই বীজের উদ্ভাবন ঘটেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সমর্থিত ম্যানিলায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট বা ইরি-তে। সেই জন্য এই বীজের নাম মূল নাম 'ইরি'। এখন এর নানা ধরন অনেক নম্বর দিয়েও প্রকাশ করা হয়। এই বীজ উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন দেশে তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার, ঋণ সম্প্রসারণ, কনসালট্যান্ট ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা ছিল মার্কিন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইউএসএইড-এর। ইউএসএইড-এর এই আগ্রহের রহস্য হল এই পুরো প্যাকেজ-এ কৃষিভিত্তিক বহুজাতিক সংস্থাসমূহের বিশাল বাণিজ্যের সম্ভাবনা। এছাড়া রাজনীতিও ছিল। 'লাল বিপ্লব' ঠেকানো তখন খুবই জরুরি ছিল!

সবুজ বিপ্লবের প্যাকেজ-এ ছিল চারটি উপাদান যা একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলোর কোনোটিই এদেশের কৃষিতে পরিচিত নয় এবং সবগুলোই ছিল আমদানি করবার পণ্য। এই চারটি উপাদান হল: ১. উফশী বীজ; ২. রাসায়নিক সার;

৩. যান্ত্রিক সেচ; ৪. কীটনাশক ওষুধ। উফশী বীজ উৎপাদনের জন্য মাটিতে জৈব সার মেশানো মোটেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য দরকার রাসায়নিক সার ইউরিয়া, পটাশ, সুপার ফসফেট ইত্যাদি। পরিমাণও লাগে বেশি। এই বীজ-এর পানির চাহিদাও খুবই বেশি আর তা অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। আর ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়েও এই যোগান সম্ভব নয়। সুতরাং এল যান্ত্রিক পদ্ধতি, গভীর নলকূপ অগভীর নলকূপ; আর পানি তোলা শুরু হল মাটির নিচ থেকে। নলকূপ বিদেশ থেকে দেশে আমদানি আর পাতালের পানি ভূমির উপরে টেনে আনা শুরু হল। কিন্তু আরও এক সমস্যা দেখা দিল কীটপতঙ্গ নিয়ে। কীটপতঙ্গ সবসময়ই ছিল, দেশি বীজের ধান উৎপাদনের অভিজ্ঞতায় কৃষককে কম কীটপতঙ্গ মোকাবিলা করতে হয়নি। এই মোকাবিলার পদ্ধতি ছিল এখানকারই, গাছ-রস-লতা-পাতা ইত্যাদি, অজানা অতীত থেকে যার চর্চা ও বিকাশ। এসব কীটপতঙ্গ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল নিয়ন্ত্রণযোগ্য। কিন্তু ইরি ধানগাছের পাতাই দেখা গেল এরকম যে তা অনেক বেশি কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করে। এসব কীটপতঙ্গ আরও বিপজ্জনক। সংখ্যাও বেড়ে গেল অনেক। দেশি পদ্ধতি দিয়ে এসব কীটপতঙ্গ থেকে ধান রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং প্রয়োজন পড়ল রাসায়নিক কীটনাশক ওষুধ। বিষ। বিপুল পরিমাণ এই বিষও শুরু হল আমদানি।

এইসব কিছু কেন গ্রহণ করবেন বাংলাদেশের কৃষক? করবার কথা নয়, তারা গ্রহণ করেনওনি। প্রত্যাখ্যান ছিল সেসময় কৃষকদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। কৃষকদের এইসময়কার এই প্রত্যাখ্যান ও এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তির কোনো প্রামাণ্য দলিল পাওয়া কঠিন। কিন্তু অভিজ্ঞতা এখনও শোনা যায়। আর তার জোর অনুমান করা যায় সরকারি ক্যাম্পেইন বিশ্লেষণ করলে। ব্যাপক সরকারি প্রচারণা সংগঠিত হয় তখন। রেডিও, তথ্যচিত্র, পোস্টার, লিফলেট, আলোচনা, নাটক, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার এমনকি ঘরে ঘরে গিয়ে সারের গুণাগুণ বর্ণনা এবং লোকশিল্পীদের অনেক অর্থ দিয়ে ইরি-র পক্ষে গান লেখা ও গাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। সেসময় পাকিস্তানের লৌহমানব বলে কথিত সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ছিলেন ক্ষমতায়। ক্ষমতায় এরকম শাসন পুরো কর্মসূচি বাস্তবায়নে খুবই সুবিধাজনক হয়েছিল। এসব কাজ হয়ে দাঁড়ায় পরে জাতীয়ভাবে উদযাপিত আইয়ুবি 'উন্নয়ন দশক'-এর এক-একটি সাফল্যের ভিত।

পাঁচ.

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থা (ইপিআইডিসি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। এরকম একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা ছিল এসব আমদানিকৃত পণ্য গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য অপরিহার্য। সেকারণেই বিশ্ব খাদ্য সংস্থার পরামর্শে এবং ইউএসএইড সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার কাজ ছিল একদিকে জনমত গঠন করা, অন্যদিকে আমদানিকৃত রাসায়নিক সার, গভীর নলকূপ,

অগভীর নলকূপ, কীটনাশক বাজারজাতকরণে নেটওয়ার্ক তৈরি করা। যেহেতু এসব নিয়ে কৃষকদের কোনো আগ্রহ ছিল না-বরঞ্চ প্রতিরোধ ছিল সেহেতু এইকাজে রাষ্ট্রের নানা উদ্যোগ ও লোভনীয় প্রস্তাবনা হাজির করতে হয়। বিনা পয়সায় চা খাইয়ে একসময়ে চা-এ অভ্যস্ত করে তারপর চা-এ দাম বসানোর কাজ সফলভাবেই করেছিল চা-কোম্পানিগুলো।

উফশী বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, গভীর-অগভীর নলকূপ বাজারজাতকরণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিজেকে এসে এসব কাজ করতে হয়নি, এই কাজ করবার জন্য ঋণের টাকা আর জনগণেরই করের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকরকম প্রতিষ্ঠান। ইপিআইডিসি, পরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বা বিএডিসি, এসব সংস্থার মধ্যে প্রধান। সার বিতরণ প্রথমে নমুনা হিসেবে বিনা অর্থেই দেয়া হয়। বাণিজ্যিকভাবে যখন বিতরণ শুরু হয় তখন ছিল উচ্চ ভর্তুকি। ৬০ দশকের মাঝামাঝির পরও বিএডিসি ইউরিয়া ও পটাশ সারের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ ও ফসফেট সারের ওপর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ভর্তুকি দেয়। একই সময়ে কীটনাশক ওষুধও বিতরণ শুরু হয়। ১৯৭৪ পর্যন্ত কোনো কোনো কীটনাশক ওষুধ শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ভর্তুকি দিয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। পরে কৃষক অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সবক্ষেত্রেই ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হতে থাকে। এমনিতেই সব কীটনাশকই বিষ, তারপরও ভয়ংকর ফলাফলের কারণে অনেক দেশে নিষিদ্ধ 'ডার্টি ডজন' বলে কুখ্যাত ১২ ধরনের কীটনাশক বাংলাদেশের পানি ও মাটিকে দীর্ঘদিন বিষাক্ত করেছে।

ইপিএডিসি প্রতিষ্ঠাকালে কিছু লো-লিফট পাম্প দিয়ে পানি-ক্ষেত্রে তাদের যাত্রা শুরু করে। এগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধানত নিচু ও হাওড় এলাকায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান গভীর নলকূপ কার্যক্রম দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন শুরু করে। গভীর ও অগভীর নলকূপ দীর্ঘদিন সরকারি ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হত। গভীর নলকূপ দেয়া হত সমবায় গঠনের ভিত্তিতে, বড় আকারের ভর্তুকির মাধ্যমে। ক্রমে আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভর্তুকি কমতে থাকে এবং বেসরকারিকরণ ঘটতে থাকে। একপর্যায়ে সারা দেশে যখন রাসায়নিক সার-কীটনাশক-যান্ত্রিক সেচ-উফশী (বর্তমানে হাইব্রিড) নির্ভর কৃষির একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হল তখন বিএডিসি পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সারা দেশে রাসায়নিক সার-কীটনাশক-যান্ত্রিক সেচ-বীজ বিতরণ তৎপরতা এখন নিজেই একটি বিরাট বেসরকারি অর্থনৈতিক তৎপরতা। শুধু ধান নয় সবজি, ফল, হাঁস মুরগি, গরু-ছাগল সবক্ষেত্রেই 'মোটা তাজাকরণ' কর্মসূচি এখন বাজারকেন্দ্রিক তৎপরতা।

৬০ দশকের শেষে চালুকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল ১০২টি, ১৯৯১-৯২ সালে এই সংখ্যা ২৫৫০০-এ পৌঁছায় কিন্তু পরে আবার চালু গভীর নলকূপের সংখ্যা কমে যায়। অগভীর নলকূপের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৭১ পর্যন্ত এর সংখ্যা ছিল তিনশ'র মতো– এখন এর সংখ্যা ৪ লক্ষেরও বেশি। রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ব্যবহারের

মধ্য দিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ক্রমান্বয়ে পান-অযোগ্য হতে থাকে। নলকূপের চাহিদা বাড়তে থাকে। রাষ্ট্র থেকেও নলকূপ বসানোর ব্যাপারে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। সারা দেশে নলকূপ ছড়িয়ে পড়ে। এর জোরেই সারা বিশ্বকে জানানো হয় যে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপদ পানি পান করেন। সেচসহ ভূগর্ভস্থ পানি প্রত্যাহারের ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতা 'পানের নিরাপদ পানি'র মিথ ভেঙেচুরে চুরমার করে দেয়। বহুদিন গোপন রাখা হলেও একসময়ে আর্সেনিকের খবর প্রকাশিত হয়।

একইসময়ে অর্থাৎ ৬০ দশকের মধ্যেই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় যেগুলোর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইউএসএইড, বিশ্বব্যাংক এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। স্থাপিত হল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রকল্প, উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষা করলে এটা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে যে উপরে বর্ণিত 'সবুজ বিপ্লবের' মতাদর্শিক জ্ঞানগত ভিত্তি এবং সমর্থক গোষ্ঠী দেশের ভেতর কিভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে থাকাই শিক্ষক-গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের ক্যারিয়ার গঠন, স্বীকৃতি লাভ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য শর্ত ঠিক রেখে দেশীয় বীজ ও জৈবসার ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা মোকাবিলার জন্য পাকা কাঠামো ভিন্ন অন্যান্য পথ অনুসন্ধান সেজন্য মূলধারার গবেষণায় কখনোই জায়গা পায়নি। ব্যক্তি গবেষক কেউ কেউ দেশীয় বীজ, জৈব সার ইত্যাদি নিয়ে যে গবেষণার উদ্যোগ নেননি তা নয় কিন্তু খুব বোধগম্য কারণেই তা সরকারি বা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে কোনো সহায়তা পায়নি।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ক্ষেত্র এবং অধিপতি প্রকৌশল দৃষ্টিভঙ্গিও এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই গড়ে উঠে। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রেও সেইসব পদ্ধতি গ্রহণযোগ্যতা পায় যেগুলো এদেশের পানি, নদী এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা অনীহ। বাংলাদেশে স্থাপত্যবিদ্যার প্রয়োগ থেকে এরকম স্থানিক বৈশিষ্ট্য অনীহ জ্ঞানের প্রকাশ অনেক নগ্ন। অর্থশাস্ত্রসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য অঞ্চলগুলোও এরকম আধিপত্যের মধ্যেই আছে। এই আধিপত্যই ধ্বংসাত্মক বিষময় 'উন্নয়ন'কে অপরিহার্য, অগ্রগতি এবং উন্নয়ন হিসেবে সমাজে গ্রহণ করানোর জ্ঞান, বিদ্যাচর্চা, চিন্তা, গবেষণা ও মিডিয়ার ভাষা গঠন করেছে।

ছয়.

'সবুজ বিপ্লব' অর্থাৎ বাংলাদেশের কৃষি, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ, সার ও কীটনাশক দিয়ে মাটি ও পানি বিষাক্তকরণ, বাজারজাতকরণে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবসায়িক তৎপরতা, উপরের সঙ্গে সঙ্গে মাটির নিচের পানিসম্পদ ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান মাত্রা, যোগাযোগ সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশ, নতুন নতুন পেশার উদ্ভব, নতুন নতুন বিনিয়োগ ইত্যাদি সব মিলিয়ে শুধু কৃষি নয়, সমাজ অর্থনীতি ও পরিবেশ ক্ষেত্রে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তার একমাত্র তুলনা হতে পারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে।

দখল-লুণ্ঠন, প্রাণহীন উন্নয়ন কৌশল, অর্থশাস্ত্রের নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল দর্শন, পশ্চিম-এর আধুনিক যন্ত্রমুখী প্রকৌশল-চিন্তা ও বিদ্যার যথেচ্ছ প্রয়োগ এবং সর্বোপরি পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র বিন্যাস একে অন্যের সঙ্গে খুব ভালো মিলে যায়। এসব ক্ষমতা ও উন্নয়ন চর্চা মিলে যায় এই সমাজের ক্ষমতাবান শ্রেণীসমূহের বিকশিত হবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, নয়া উদ্ভূত শ্রেণীসমূহের বিকলাঙ্গ লুম্পেন ধাঁচের সঙ্গে। তাই এই সম্মিলিত 'উন্নয়ন' চর্চায় এদেশে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানিসম্পদ, নদীপ্রবাহ, জলাশয়, বন্যার গতি, বনসম্পদ এবং জ্বালানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি। উল্লেখ্য যে শুধু সরকার নয়, বিশেষ করে অর্থশাস্ত্র, কৃষি ও প্রকৌশলশাস্ত্রসহ বিভিন্ন ধারায় 'শিক্ষিত' ও অশিক্ষিত দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'উন্নয়নে'র এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে, বলাই বাহুল্য, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

[লেখক: বাম ধারার রাজনীতিক। সদস্য সচিব, তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর জাতীয় রক্ষা কমিটি। প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, অর্থনীতি, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের নদ-নদী : ভবিষ্যৎ

শ হী দু ল্লা হ মৃ ধা

.....উত্তরে হিমালয়ের ছায়া থেকে বেরিয়ে এই যে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে বিপুল জলরাশি প্রত্যহ বিসর্জন দিচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ কী? এটা ভাবতে গেলে অনেক ধরনের প্রতিচ্ছায়া ভেসে ওঠে মানসক্ষেত্রে। না, আমাদের ভূগোল বিজ্ঞানী বা নদী-বিশারদরা এ সম্পর্কে একটাও প্রবন্ধ লেখেননি এ পর্যন্ত। তাই একজন রসায়নবিদের পক্ষে নদীর ভবিষ্যৎ বলা ধৃষ্টতা বৈকি। তবে নিজের দেশের নদীগুলোর ওপর দুই যুগ ধরে পড়াশোনা ও নাড়াচাড়া করার পর এ ব্যাপারে কিছু বলার সাহস জেগেছে। এর ওপর সম্ভাব্য চিন্তাভাবনা করতে আমার তিন বৎসর লেগেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর ওপর দীর্ঘকাল লেখালেখি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য এবং বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার বি. এম. আব্বাস। তাঁদের কিছু লেখা আমি পড়েছিলাম অনেককাল আগে। বিস্মিত হতে হয় তাঁদের পর্যবেক্ষণক্ষমতা দেখে। নদী গবেষণায় পিএইচডি পেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ড. দিলীপ বড়ুয়া। এককালে তিনি FAP তথা 'ফ্ল্যাড অ্যাকশন প্রজেক্ট'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে বিদেশে চলে গেছেন। নদী-বিশেষজ্ঞ ড. দিলীপ বড়ুয়ার সঙ্গে আমার কয়েকবার আলাপ হয় FAP 24 River Survey Project নিয়ে। তিনি আমাকে তাঁর সংকলিত ৩২০ পৃষ্ঠা সংবলিত বাংলাদেশের নদীগুলোর গঠনপ্রণালীর প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা প্রবন্ধ পড়তে দিয়েছিলেন। আর ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অনুজপ্রতিম প্রকৌশলী শাহনেওয়াজ তো এ ব্যাপারে বরাবর সাহায্য করে আসছে গত একদশক ধরে। আমি বাংলাদেশের সমুদ্র 'বঙ্গোপসাগর' নিয়ে তিন খণ্ডে একটি বই লিখেছিলাম দীর্ঘ সাত বৎসর পরিশ্রম করে। সাগর এত বিশাল, ব্যাপক এবং মহান তা লিখতে এতগুলো বৎসর কেটে গেল। সেই তুলনায় নদী কত ছোট। ক্ষুদ্র, তবে সদা প্রবহমান। কিন্তু নদীর ওপর কোনো বই আজও লিখে উঠতে পারিনি। কারণ? নদী বড় জটিল, রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, রূপ বদলায় বারে বারে এবং অতি দ্রুত। নদী বড় গভীর, তাকে বোঝা যায় না। দুরন্তপনা নদীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাই তার পরিচয় সহজে জানা যায় না।

তাই বাংলাদেশের নদীগুলোর ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। সব আরম্ভের যেমন শেষ আছে, জীবনের অবসান আছে মৃত্যুতে, তেমনি নদীও ব্যতিক্রম নয়। নদীর মৃত্যু আছে। একটি দেশের মৃত্যুও ঘটে। একটি সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে যায়। তার প্রমাণ সাহারা মরুভূমি, গোবি মরুভূমি, মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এবং যথাক্রমে পনেরো ও পাঁচশতাধিক বছরের আগের মায়া-আজটেক সভ্যতা। নদীগুলোর ভবিষ্যৎ তার ভূখণ্ডের ভবিষ্যতের সঙ্গেই জড়িত। যা কিছু ঘটার তা এই একুশ শতকেই ঘটবে। বাংলাদেশে মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলে ১২ কোটি লোক বসবাস করে। এটা একটা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সামান্য ভূখণ্ডের ওপর এত অধিক জনসংখ্যার চাপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশেও তা হবে। আঘাতটা আসছে পরিবেশের ওপর দিয়ে। তারপর সামাজিক পরিবেশ। ম্যালথাসের থিয়োরি অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে। সমুদ্রপৃষ্ঠের স্ফীতির দরুন বাংলাদেশের এক-ষষ্ঠাংশ তলিয়ে যাবে আগামী শতকে। ইতোমধ্যে উত্তরবঙ্গে মরুভূমির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের অপমৃত্যুর সবগুলো চিহ্ন বর্তমান শতকেই সূচিত হয়েছে।

আমাদের আলোচনা নদী নিয়ে। তাই ঐসব প্রসঙ্গ বাদ। দুটি কারণই যথেষ্ট নদীর মৃত্যুর জন্য। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ, যথা ভূমিকম্প, জলস্ফীতি, মহাশূন্য থেকে ভারী বস্তুর পতন; দ্বিতীয়টি হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট। তা আবার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এই দু'উপায়েই হতে পারে।

১৮৮৭ সালের ১২ জুন আসামে ৮.৭ রিখটার মাত্রার সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়েছিল। এ ছাড়া গত এক শতাব্দীতে সংঘটিতে মাত্র ২টি তীব্রতর ভূমিকম্পের 'ভূপৃষ্ঠ কম্পনকেন্দ্র' (epicentre) বাংলাদেশে অবস্থিত। এর একটি ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাই সংঘটিত বেঙ্গল আর্থকোয়েক, যার (epicentre) ছিল শেরপুরের নিকট, মাত্রা ছিল ৭। অপরটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে, ৮ জুলাই, এপিসেন্টারটি ছিল শ্রীমঙ্গলের নিকট এবং মাত্রা ৭.৬। এ ছাড়া ১৯৫০ সালের ১৫ আগস্ট আসামে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল।

এছাড়া 'কলকাতা-ময়মনসিংহ হিঞ্জ জোন' একটি ভূকম্প কেন্দ্রীভূত এলাকা। বাংলাদেশকে মূলত তিনটি ভূকম্পন জোনে ভাগ করা হয়, এর মধ্যে জোন-১ : সিলেট-ময়মনসিংহ-রংপুর। এই এলাকায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বেশি, কারণ এখানে ভূকম্পন শক্তির ত্বরণ ০.০৮ যা রিখটার স্কেলে সম্ভাব্য মাত্রা ৭। জোন-২ : চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-ঢাকা-টাঙ্গাইল। এই এলাকায় ভূকম্পন শক্তির ত্বরণ ০.০৫ (মাত্রা ৬) এবং জোন-৩ : দেশের বাকি অংশ যেখানে ভূকম্পন ত্বরণ ০.০৪ এবং রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৬-এর নিচে।

বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর গতিপথ অবিশ্বাস্যভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কখনও নদী আপন খাত ত্যাগ করে এক নতুন পথে বয়ে যাচ্ছে, কখনো-বা নদী তীর

ভেঙে এগিয়ে গিয়ে এক নূতন খাতের সৃষ্টি ক'রে, আবার কিছুকাল পরে হয়তো সেই পরিত্যক্ত খাতেরই সন্ধানে চলেছে। প্রশ্ন হল নদী কি আপন খেয়ালেই তার গতিপথ পরিবর্তন করে? কিন্তু আমরা জানি কোনো কারণ ছাড়া কোনো ঘটনা ঘটে না। এক্ষেত্রে মনে করা হয় ভূকম্পনের ফলেই কোনো স্থান উঁচু হয়ে পড়লে নদী অন্যদিক ধরে ঢালুতে ছুটে যায়। সুতরাং আগামীতে যদি ৮ রিখটার স্কেলের কোনো ভূমিকম্প বাংলাদেশে হয় তাহলে প্রধান নদীগুলোর প্রবাহপথ পরিবর্তিত হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। গঙ্গা-পদ্মা, যমুনা, মেঘনা এই তিনটি প্রধান নদী-ব্যবস্থার একটিতেই আঘাত হানলেই এর অন্তর্গত শাখা ও উপনদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুকিয়ে যাবে মরে যাবে। ভূমিকম্পজনিত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য দৃশ্যাবলি (scenario) আমি বর্তমানে আঁকতে চাচ্ছি না এতে এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হবে বলে।

পানি নিয়ে ভাবনা বেড়েই চলেছে। বিশ্বের অনেক অঞ্চলেই ভূগর্ভের পানিস্তর নাগালের বাইরে চলে যেতে শুরু করেছে। মানুষের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা আর অদূরদর্শী ও অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ পানির ভাণ্ডারকে কলুষিত করছে ক্রমাগত। এমনতর পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে পানির ঘাটতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কখনও কখনও পানি নিয়ে বিবাদ আর সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে। কেউ কেউ বলে থাকেন আগামী শতকে পানি নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ হবে। এমনকি ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধ বাঁধবে নদীর উৎসমুখ বন্ধ করা তথা পানি নিয়েই। ব্যাপারটা খুব সম্ভবত ঘটবে আগামী ২০২০ সালের মধ্যেই। বিশ্বের জলাধার নদী ও হ্রদগুলো যেভাবে দূষিত ও শুষ্কতার দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে এ আশংকা করা অযৌক্তিক হবে না যে অচিরেই পানি নিয়ে পারস্পরিক লড়াই দেশগুলোর মধ্যে আরো বিস্তৃত হবে।

দেশ-বিদেশের পত্রিকাগুলোর প্রায় প্রতিদিনের রিপোর্টেই এমনতর আলামত দেখা যাচ্ছে। ১৯৮২ সনে আমার এক রুশ বিশেষজ্ঞ বন্ধু আমাকে বলেছিলেন 'পানির জন্য যুদ্ধ' হবে একুশ শতকের প্রথম দিকে। গেন্নাদি সেমিনের ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই ফলে যাবে মনে হচ্ছে।

মনুষ্য-সৃষ্ট কারণে নদীর মরে যাবার ব্যাপারে এবার দৃষ্টি ফেরাই। দু'শ বছর আগে পদ্মা নদী নোয়াখালীর কাছে সমুদ্রোপকূলে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হত। মেঘনাতে তখন ব্রহ্মপুত্রের পানিই পতিত হত। ১৭৮৪ সনের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের যাত্রা ময়মনসিংহ দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় আর ক্ষীণস্রোতা যমুনা নদী প্রবল হয়ে ওঠে। বর্তমানে মেঘনা ভৈরব বাজারের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়। বর্তমানে এর ওপর পানির চাপ সর্বাধিক হওয়ায় এ নদী ভীষণ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। এর ভাঙনের ফলে নোয়াখালির বর্তমান লক্ষ্মীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও চাঁদপুরের ভীষণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনা প্রতি বৎসর ১,৪০০ ফুট করে ভাঙছে। অগ্রসর হচ্ছে পূর্বদিকে। পদ্মানদীর ভাঙার গতি হচ্ছে বৎসরে গড়ে

২০০ ফুট পূর্বদিকে। বন্যার সময় নদীগুলো ৫,৫০০ ফুট পর্যন্ত ভাঙে। গ্রিনহাউসের প্রতিক্রিয়া শুরু হলে পর বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে উত্তরে সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড় এলাকা পর্যন্ত মেঘনা নদীর অস্তিত্ব থাকবে না। সাগরের লবণাক্ত পানি ঐ পর্যন্ত ঢুকে যাবে।

এককালে তিস্তা উত্তরবঙ্গের বহু ছোটোখাট নদী, যথা মহানদী, নাগর, পুনর্ভবা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতির জলপ্রবাহের মূল উৎস ছিল। ১৭৮৬ সালের প্লাবনের ফলে তিস্তা, পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়। তাতে এসব ছোট ছোট নদীগুলোর পানি সরবরাহ ব্যবহৃত হয়ে এগুলো আস্তে আস্তে মরে যায়। ধলেশ্বরী বর্তমানে যমুনার একটি শাখা নদীরূপে পরিগণিত হলেও যমুনার চাইতে এই নদী প্রাচীন। আগে করতোয়ার সঙ্গে এর যোগ ছিল। বর্তমানে শুকনোর দিনে ধলেশ্বরী পানির অভাবে প্রায় শুকিয়ে যায়। সুদিনে ধলেশ্বরী প্রবলাকার ধারণ করে প্রাচীন নদী ইছামতীকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ইছামতি ছিল পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ। এককালে যশোর জেলায় ৩৬টি নদী ছিলবলে হান্টার উল্লেখ করেছিলেন। সংস্কারের অভাবে ও পরিকল্পনাহীন রেল ও সড়ক নির্মাণের ফলে এসব নদী মরে গেছে। ইউরোপ, আমেরিকায় রেলপথগুলো নদীপথের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, আর আমাদের দেশে রেলপথ নদীগুলোর জন্য হয়েছে কাল। জঙ্গল কেটে, বাঁধ বেঁধে, বেড়িবাঁধ দিয়ে আমরা নদীর স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করছি।

দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং না-হওয়ায় জেগে উঠেছে অসংখ্য ছোট ও বড় চর। ফলে নদীগুলো নাব্যতা হারাচ্ছে। ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের নৌ-পথ। ১৮.০২.৯৬ তারিখের *জনকণ্ঠ*র রিপোর্ট : নাটোরের নারদ নদী শুকিয়ে গেছে। নদীর বুকে এখন তৈরি হচ্ছে ঘরবাড়ি।

ভারতের উজানে নির্মিত তিস্তা-মহানন্দা ব্যারেজের কারণে উত্তরাঞ্চলের নদীসমূহ শুষ্ক বালুচরে পরিণত হয়েছে। পঞ্চগড় জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত সকল নদীর উজানে ভারত একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করায় সকল নদী নৌবাহন যোগ্যতা হারাচ্ছে। জেলার সীমান্তবর্তী তেঁতুলিয়া থানার শেষ সীমান্ত বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের বিপরীতে ভারতের ফুলবাড়ি এলাকায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তিস্তা-মহানন্দ এবং করতোয়া নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করায় বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমি হতে চলেছে। আর সেই কারণেই করতোয়াসহ চাওয়াই, কুরুম, হাতুড়ি, নাগর, টাঙ্গন, চিলকা প্রভৃতি নদীতে বর্ষা মৌসুমেও কোনো পানি থাকে না। ভারত তাদের ব্যারেজে আটকানো পানি ফিডার ক্যানেলের সাহায্যে উত্তরবঙ্গের হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও বিহারে সেচকার্য চালাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের অংশে নদীগুলো মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। নদীগুলোকে আর নদীই মনে হয় না। এগুলোর স্থানে স্থানে গেলে মনে হবে যেন পগার বা ডোবা। আর বেশির ভাগই শুকনো।

‘এক কালের প্রমত্তা ও খরস্রোতা হামজুড়া নদী আজ মৃত। নদীটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় ডুমুরিয়ার বিভিন্ন বিলের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা।’ ০৬.০২.৯৯ *ভোরের কাগজ*-এ প্রকাশিত রিপোর্টে আরো প্রকাশ : ‘উত্তরাঞ্চলের নদ-নদীগুলোর পানিপ্রবাহ মারাত্মকভাবে কমে গেছে’, গজালডোবা ব্যারেজ দিয়ে ভারতের এক তরফা পানি প্রত্যাহার, তিস্তা মৃতপ্রায়। ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীগুলোর মৃত্যুর জন্য দায়ী। অথচ পানিপ্রবাহের বিষয়টি নাকি ‘রাষ্ট্রীয় গোপনীয়’। জনসাধারণ বলছে পানি অনেক কম।’

‘পুনর্খননের উদ্যোগ নেই। ভরে গেছে সুনামগঞ্জের ১০টি নদী বৌলাই, সুরমা, রকতি, পাতইল, নলজুর, পুরান যাদুকাটা, ডাউক, ইটখোলা, সোদীয় ও পুরান সুরমা। ১১.০৪.৯৯ তারিখের *জনকণ্ঠ* পত্রিকার প্রকাশ ‘কুশিয়ারার উৎসমুখে ভারতের বরাক বাঁধ নির্মাণের প্রস্তুতি। ক্ষতিগ্রস্ত হবে সিলেট। এর প্রভাবে সিলেট অঞ্চল শুকনা মৌসুমে মরুভূমি এবং বর্ষাকালে বন্যায় ভেসে যাবে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমাঘাট এলাকায় খোয়াই নদীর উপর ও ত্রিপুরার বিরাশি নাম স্থানে মনু নদীর উপর দু’টি বাঁধ ভারত তৈরি করেছে। কুশিয়ারা নদীর তলদেশে পাথর ফেলে সম্প্রতি ভারত গ্রোয়েন নির্মাণ করেছে। যার ফলে নদীর পানিপ্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ এলাকায় ব্যাপকহারে নদীভাঙনের সৃষ্টি করছে।’

গঙ্গা-ভাগীরথীর মিলন ঘটতে যাচ্ছে। এটা ফারাক্কা ঘটলে ব্যারেজটি অকেজো হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে। ব্রহ্মপুত্রকে নিয়ে চীনের ‘বিস্ফোরক’ পরিকল্পনা রয়েছে। চীন চাইছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই নদীপ্রবাহ বদলে দিতে। গোবি মরুভূমিসহ চীনের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা চীনের রয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা খুবই সরু। গড়ে ৪০ কিলোমিটার চওড়া। ১৯২০ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে এখানে ৪৬৪টি ভূমিকম্প হয়েছে (৫-৮ মাত্রার)। ফলে কয়েকটি স্থানে ব্রহ্মপুত্র পার্শ্ববর্তী ভূভাগের চেয়ে বেশি ফুলে উঠেছে।

২৭.১২.৯৮ *জনকণ্ঠ*’র প্রথম প্রষ্ঠায় ‘ভারতের এবার সীমান্ত সড়ক প্রকল্প, মিনি ফারাক্কা’। দেখা যাচ্ছে ভারতের সাথে আমাদের ৫৪টি নদীর সবক’টিতে ভারত তার নিজ প্রয়োজনে বাঁধ, সড়ক, গ্রোয়েন ইত্যাদি নির্মাণ করছে। এসবের একমাত্র ফলাফল বাংলাদেশের নদীগুলো মরে যাবে। সৃষ্টি হবে এখানে মরুভূমি ধুধু বালুচর।

নদীতে চর পড়ায় নদী আর নদী থাকছে না ছোট খাল আর ফসলের ক্ষেতে পরিণত হচ্ছে। নদীর বুকে হচ্ছে আবাদ। খবরে প্রকাশ, নেত্রকোনার নদীর মতোই মাগুরার শ্রীপুর থানার কুমার নদ শুকিয়ে আজ মরা নদে পরিণত হয়েছে। একদিকে ভারতের কারণে আমাদের নদীগুলো মরে যাচ্ছে অপরদিকে জনসংখ্যার চাপে আমাদের লোকেরাই নদীবক্ষে নির্মাণ করছে বাড়িঘর, দোকান, কারখানা। চাঁদপুরে দখল হয়ে গেছে ডাকাতিয়া নদী। এই নদীর তটভূমিতে গড়ে ওঠা দ্বিতল আবাসিক হোটেলের ছবিও পত্রিকায় দেখেছি। রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গাসহ দেশের বিভিন্ন নদী দখল হয়ে

যাচ্ছে। স্থানীয় প্রভাবশালী মহলই এই দখলকারীতে জড়িত। বুড়িগঙ্গার পর এখন ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের মুখে শীতলক্ষ্যা নদী। একটি জীবন্ত নদীতে পাথর ফেলে এভাবেই চিরতরে মেরে ফেলা হচ্ছে। অবহেলা, অযত্ন আর গোষ্ঠীস্বার্থের কাছে কীভাবে জাতীয় স্বার্থ ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে তার উদাহরণ শীতলক্ষ্যা নদী।

ধলেশ্বরীর পানি নিকষ কালো। কর্ণফুলিকে বাঁচানো এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তা না-হলে কর্ণফুলির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। ওদিকে সদরঘাট টার্মিনাল থেকে গাবতলী ব্রিজ পর্যন্ত নদীর দু'ধারে গড়ে উঠেছে অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা। এগুলো মাটি ভরাট করে সূক্ষ্মভাবে বেদখল করা হয়েছে। যাতে সহজে কেউ টের না-পায়। রাসায়নিক দূষণেও বুড়িগঙ্গা মৃতপ্রায়। বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায় কামরাঙ্গীর চরের কাছে বুড়িগঙ্গা সংকুচিত হয়ে একটি খালে পরিণত হয়েছে। পাথর জমা করেও বুড়িগঙ্গা ভরাট করা হচ্ছে। সরকার এখনও এদিকে নজর দেয়নি।

বাংলাদেশের অনেক ছোট নদী জোর করে আশেপাশের মানুষ বেঁধে ফেলেছে। সরকার তা রোধ করেনি –এর জন্য কে দায়ী? দায়ী তো আমরা গোটা জাতিই। ঠিক এভাবেই গণতন্ত্র চলতে থাকলে আমাদের সবগুলো নদী আগামী ৩০ বৎসরে পুরো হারিয়ে যাবে মানচিত্র থেকে। দেশ হবে মরুভূমি। সবুজ মানচিত্র পাল্টাবার কেউ থাকবে কি?

পুনশ্চ : বাংলাদেশের নদীগুলোর ভবিষ্যৎ-চিত্র প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই আঁকতে চেয়েছিলাম। পরে তা করিনি। ভবিষ্যৎ সব সময়ই অন্ধকারে থাকে। অনিশ্চয়তায় ভরা। ধোঁয়াশার মতোই ব্যাপার ভবিষ্যতের। তাই বক্ষ্যমাণ অংশটুকুও খাপছাড়াভাবে লিপিবদ্ধ করলাম। এতে শুধু ইঙ্গিতই রয়েছে, কোনো রেখাচিত্র বা কোয়ান্টাম বিজ্ঞান দেয়া হয়নি।

[পুরো প্রবন্ধের অংশবিশেষ]

গ্রন্থপঞ্জি :

১. *গঙ্গার কথা*, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২৮০
২. *ভারতের নদনদী*, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, পৃ. ২০০
৩. *বাংলাদেশের নদী*, এস. এম. হক, ১৯৮৫, পৃ. ১০৩
৪. *বাংলাদেশের পানিসম্পদ*, বি.এম. আব্বাস, ১৯৮৫, পৃ. ১০৩
৫. *নদী*, সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত, ১৯৮২, পৃ. ৬০
৬. *নদী কাহিনী*, অসীমকুমার বসু, ১৯৮০, পৃ. ৫৬
৭. *গঙ্গাপথের ইতিকথা*, অশোককুমার বসু, ১৯৮৯, পৃ. ২৩০
৮. *বাংলাদেশের নদীমালা*, আব্দুল ওয়াজেদ, ১৯৯১, পৃ. ১২৯

৯. *বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা*, কপিল ভট্টাচার্য, ১৯৫৯, পৃ. ১৬০
১০. *বাংলার নদ-নদী*, নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৪৭, পৃ. ৫০
১১. *নদী মেখলা বাংলাদেশ*, বিপ্রদাস বড়ুয়া, ১৯৯৪, পৃ. ৬৯
১২. বাংলাদেশের পানিসম্পদ, *সচিত্র বাংলাদেশ*, ১৯৯৫, পৃ. ১৫২
১৩. *বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর পানি সঙ্কট*, আব্দুস সাত্তার, ১৯৯৮, পৃ. ১২৭
১৪. পূর্বপাকিস্তানের নদ-নদী, *রেডিও পাকিস্তান*, ১৯৫৯, ৮০
১৫. *নদী*, দিলীপ ভট্টাচার্য, ১৯১৪, পৃ. ৬০
১৬. নদী সংখ্যা, *ধান শালিকের দেশ*, ১৯৯৬, পৃ. ১৮০
১৭. *Brahmaputra River : Channel process and Sedimentation*, J.M. Coleman, 1969, P.-110
১৮.*Deltaic Formation : Ganges & Brahmapurta*, C. Streokland, 1940, P.-160
১৯.*History of the River—Gangetic Delta*, C. Adams Williams, 1966 (reprint), P.-120
২০.*The Ganges Delta*, Kanongopal Bagchi, 1944, P.-160
২১.*Rivers of Bengal Delta*, S.C. Majumdar, 1942, P.-124
২২.*Changing Face of Bengal : Study in Riverine Economy*, Rudhakamal Mukherjee, 1938, P.-300
২৩.*Rivers of Bangladesh*, Dilip Barua, 1994, P.-166
২৪.*Sea Level Changes in the Bay of Bangal*, R.A. Warrick, 1993, P.-24
২৫.*Morphological Processes in the Bangladesh River system : a Compitation of Papers*, ed. Dilip Kumar Barua, 1993, P.-318

উৎস : *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা,* নদী সংখ্যা

[লেখক: ড. শহীদুল্লাহ মৃধা, প্রাবন্ধিক, গবেষক । কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন ।]

বাংলাদেশের জলাশয়, নদ-নদী ও জীববৈচিত্র্য: সংকট ও সম্ভাবনা

এ ম. এ ম. ইফতেখার হাসান

"এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদীতটে
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
এই আমার দেশ, এই আমার প্রেম
কত আনন্দ বেদনা, মিলন বিরহ সংকটে"

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিটি আমাদেরকে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সত্যিই নদী প্রকৃতির আপন হাতে অতি সযতনে নির্মিত এক অন্যবদ্য খেয়ালি সৃষ্টি। হিমালয় পর্বতমালার সন্নিকটে ও বিশ্বের বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার আমাদের এই প্রিয় নদীমাতৃক বাংলাদেশ যার রয়েছে একটি চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে, কালে-কালে, সময়ে-অসময়ে নিরন্তরভাবে আমরা নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ছি নদ-নদী কিংবা জলাশয়ের সঙ্গে। আবহমান কাল হতেই মানুষের চিরায়ত আগ্রহ-উদ্দীপনা এই নদীকে ঘিরেই। অনাদিকাল হতেই নদী নিয়ে কবি-সাহিত্যিকগণ কতই-না কবিতা, গান, গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন। নদীকে জীবনের পরতে পরতে স্বমহিমায় স্থান দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ও জলসম্পদ

১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনের এই ছোট্ট অথচ আর্কষণীয় ব-দ্বীপে নদীগুলো সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বাংলাদেশের মানচিত্রে এ নদ-নদীগুলোর অবস্থান দেখলেই বুঝা যায় যেন শিরা-উপশিরার মতো রক্তস্রোত নিরন্তর বয়ে নিয়ে চলছে দেশের এক স্থান হতে অন্য স্থানে, এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে। আমাদের এই দেশে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল হাওড়-বাওড়, পুকুর-দিঘিসহ বিস্তীর্ণ জলাশয় ও জলাধার। শাখা-প্রশাখাসহ এরকম প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ কি.মি. জায়গা দখল করে দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে আন্তর্জাতিক নদী ৫৭টি; ভারতের সাথে ৫৪টি এবং মায়ানমারের সাথে ৩টি নদী। তাছাড়া দেশে প্রায় ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর আয়তনের ১৩ লক্ষাধিক দিঘি-পুকুরও রয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, আমাদের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০,২৪,৯৩৪ হেক্টর যার মধ্যে নদী-মোহনা ৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর এবং প্লাবনভূমি

২৮,১০,৪১০ হেক্টর এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন ৬,৭৮,৭২৪ হেক্টর যার মধ্যে পুকুর প্রায় ৩,৭১,৩০৯ হেক্টর। সব মিলিয়ে মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪৭,০৩,৬৫৮ হেক্টর। অপরদিকে সামুদ্রিক জলায়তনের মধ্যে সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত) ২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল এবং একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ–তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত) ৪১,০৪০ বর্গ কি.মি., মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম পর্যন্ত বিস্তৃত) ২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি ৭১০ কি.মি.সহ বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক এলাকা প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গ কি.মি. ।

বাংলাদেশের জলাশয়, নদ-নদী ও জীববৈচিত্র্য

বাংলাদেশ পৃথিবীর জলজ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ দেশে সুবিশাল জলরাশির মধ্যে মিঠাপানির মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা ২৬০টি; বিদেশি মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা ১২টি; মিঠাপানির চিংড়ি প্রজাতি ২৪টি সহ মিঠা পানির অন্যান্য জলজ প্রজাতি। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা ৪৭৫টি এবং সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতির সংখ্যা ৩৬টি। তাছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অপ্রচলিত জৈব সম্পদ যেমনঃ শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, সরীসৃপ, কাছিম, ব্যাঙ, স্ত ন্যপায়ী প্রাণী, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীসহ বিপুল উদ্ভিদরাজি। এত এত বৈচিত্র্যময় জলজ জীবগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্য কোনো ছোট দেশে আছে কিনা সন্দেহ। শুধুমাত্র মাছের ক্ষেত্রেই বলা যায় মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ স্থানে। চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার পরপরই বাংলাদেশের অবস্থান। তাছাড়া প্রজাতিবৈচিত্র্যের দিক থেকেও বাংলাদেশে একটি অনন্য দেশ।

বাংলাদেশে জলাশয় এবং নদ-নদীর সংকট ও সম্ভাবনা

কথিত আছে যে, পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পানিপ্রবাহিত হয় বাংলাদেশ হতে। আমাজান এবং কঙ্গোর পানিপ্রবাহের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ দুই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ভাটির দেশ হিসেবে ন্যায্য প্রাপ্যতার পরিবর্তে গ্রীষ্মকালে পানির অভাব এবং বর্ষাকালে উক্ত পানিরই দানবরূপী আগ্রাসন পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে উভয় সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে। ভাটির দেশ হওয়ায় বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ৩টি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর পানিপ্রবাহের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হচ্ছে। যদিও ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার ফলে আমরা মনে করেছিলাম উক্ত চুক্তিটি হয়ত-বা আমাদের জন্য সম্ভাবনার নতুন একটি দ্বার উন্মোচন হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সে সম্ভাবনার সুবাস ফিকে হতে বেশি সময় লাগেনি। একতরফাভাবে ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণ করে প্রায় ২৫ বছর পরে ‘গঙ্গা

চুক্তি’ গরু মেরে জুতা দানের মতোই ঘটনা বৈকি। সেজন্যই বলা হয় পানি আমাদের জন্য একই সাথে আশীর্বাদ এবং অভিশাপও বটে।

উজানের দেশ ভারত কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের বাঁধের প্রভাবে বিশেষ করে পদ্মা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে উক্ত নদীতে পানিপ্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় এই নদীর প্রায় সকল শাখা-প্রশাখা হয় ভরাট হয়ে গেছে নতুবা শুকিয়ে গিয়ে মরা নদী বা খালে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

প্রতি বছর শুধুমাত্র গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীসমুহের মাধ্যমেই ২১৯৭ মিলিয়ন টন পলি বঙ্গোপসাগরে নিষ্কাশিত হয় (Curry & Moore-১৯৭১)। তাছাড়াও দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলো দিয়ে উজান হতে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বিপুল পরিমাণ পলি আসায় নদীর গতিপথ পরিবর্তনসহ নদীর তলদেশের গঠন ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদী তার স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ তথা নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে যার ফলে নতুন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে আমাদের জলজ জীবের অভিযোজন, অভিপ্রায়ন ইত্যাদি বন্ধ হওয়ার উপপক্রম হয়ে জীববৈচিত্র্যে ঋণাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

উজান হতে উক্ত নদ-নদীগুলো শুধুমাত্র পলি নিয়ে আসলেও না হয় কথা ছিল, সাথে সাথে বয়ে নিয়ে আসছে আমাদের জলজ পরিবেশ দূষণের সকল সম্ভার। ভারত, নেপাল বা চীনের এই আন্তর্জাতিক নদীগুলো আমাদের জলসীমায় প্রতিনিয়ত নিরন্তর দূষিত পদার্থ বয়ে নিয়ে আসছে। এছাড়াও দোর্দণ্ড প্রতাপে আমরাও আমাদের নদ-নদীগুলোর তীরে বৃহৎ শিল্পকারখানা গড়ে তুলে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলে নদীমাতাকে করে তুলছি বিষাক্ততায় পরিপূর্ণ একটি দোজখে। “বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ কেড়ে নিয়েছে আবেগ” বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নই আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, উক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরিণামদর্শী, অপরিমিত ও অযৌক্তিক ব্যবহার-ই আবার কোথাও কোথাও ডেকে আনতে পারে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর সংকটময় অবস্থা। আজকের বাস্তবতায় আমরা দেখছি উন্নত রাষ্ট্রসমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন কার্যক্রম (যা নিজ রাষ্ট্রের জন্য ভালো কিন্তু প্রতিবেশীর জন্য মন্দ) একদিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে চরম এক পরিবেশ বিপর্যয়ের জীবনমরণ সমস্যার দিকে অন্যদিকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মানবসভ্যতার নিরাপদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরাপদ ও সর্তক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর-ই হতে হবে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। নীতিহীন কোনো উন্নয়ন বা কোনো সভ্যতা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না, টিকে থাকেও না। একটি জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে অন্য জাতিগোষ্ঠীর কাছে অতি জনপ্রিয় হওয়ার মতো অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বলি আজ আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। সুতরাং আমাদের ভাববার সময় এসেছে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমদের

প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা কেমনতর উচ্চতায় নিয়ে যাব। পরিবর্তন-ই জগতের নিয়ম। ১০০ বছর আগের পৃথিবী আর ১০০ বছর পরের পৃথিবী নিশ্চয়ই এক নয় এবং এক হওয়ার কথাও নয়। কিছু পরিবর্তন হয় প্রাকৃতিকভাবে এবং তা অবশ্যম্ভাবী আবার কিছু পরিবর্তন হয় মানবসৃষ্ট এবং তা একই সঙ্গে পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবন-ধারণের পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ঠ। সত্যিই বলতে কি, মানুষ নিজেই নিজেদের বাসযোগ্য অসীম সম্ভাবনাময় এই পৃথিবী ধ্বংসের মহাযজ্ঞে মেতে উঠেছে এবং অবিরত ভাবে তার কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটিয়েই চলছে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে।

বাংলাদেশ জলাশয়, নদ-নদীতে মৎস্যসম্পদ

স্মরণাতীত কাল হতেই আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমি নদীমাতৃক বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। এককালে এদেশের মানুষের ছিল গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ। বিগত ষাট এবং সত্তরের দশকেও এ দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৯০% পাওয়া যেত অভ্যন্তরীণ এসব জলাশয় হতে। কিন্তু কালের বিবর্তনে বর্তমানে প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জলাভূমির গুণগত অবক্ষয় ও এর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদন গত তিন দশকে একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপিও সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ২০১০- ২০১১ অর্থবছরে দেশের বার্ষিক মাছের উৎপাদন সব মিলিয়ে প্রায় ৩০.৬২ লক্ষ মে. টন যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে উৎপাদিত হয়েছে ২৫.১৫ লক্ষ মে. টন মৎস্য । অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে উৎপাদিত ২৫.১৫ লক্ষ মে. টনের মধ্যে উন্মুক্ত জলাশয় হতে উৎপাদিত হয়েছে ১০.৫৫ লক্ষ মে.টন এবং প্রায় ১৪.৬১ লক্ষ মে. টন উৎপাদিত হয়েছে বদ্ধ জলাশয় হতে এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫.৪৬ লক্ষ মে. টন।

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশাল জলসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে এদেশে মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশের মাটি ও পানির উৎপাদনশীলতা, অনুকূল জলবায়ু এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির প্রাচুর্যের কারণে মৎস্যখাতে উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছ দেশের জনগণের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬৩% যোগান দিয়ে থাকে। দেশের মোট উৎপাদিত মৎস্যসম্পদের পরিমাণ ৩০.৬১ লক্ষ মে. টন, জিএনপিতে মাছের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৯,৫৬৭.৯০ কোটি টাকা যা জিডিপিতে অবদান ৪.৪৩% এবং কৃষিখাতে অবদান ২২.২১%। উক্ত উৎপাদিত মৎস্যের মধ্যে বিদেশে রপ্তানি হয়

৪,৬০৩.৮৩ কোটি টাকা মূল্যের মাত্র ৯৬,৪৬৮.৭০ মে. টন মৎস্য যা মোট উৎপাদনের মাত্র ৩.১৫% এবং রপ্তানি আয়ে অবদান ২.৭৩% ।

দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী ও মোহনায় মৎস্য আহরণের বর্তমান অবস্থা

পরিবেশে উপস্থিত সকল জীবেরই গুরুত্ব রয়েছে এবং একটি বিশেষ প্রজাতির সর্বনিম্ন পরিমাণের উপস্থিতি সেখানে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। জলাভূমিতে উপস্থিত প্রতিটি প্রজাতিই কোনো না কোনো স্বাভাবিক গুরুত্ব নিয়ে প্রকৃতিতে স্বমহিমায় অবস্থান করছে। পুকুর-দিঘি ছাড়াও জলজসম্পদে ভরপুর ডেল্টয়িক বাংলাদেশের অন্যান্য জলাশয় যেমন: খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, পাহাড়ি ঝরনা ক্রিক, ছড়া, খাড়ি ইত্যাদি প্রয়োজনে তাগিদে ধীরে ধীরে মৎস্য ব্যবস্থাপনা আওতায় চলে আসছে।

বাংলাদেশের নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চল হতে আহরিত মাছের পরিমাণ বা আহরণের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ২০০০-২০০১ সাল এবং ২০১০-২০১১ সালের উৎপাদন পরিসংখ্যানের তুলনামূলক পর্যলোচনা নিম্নরূপ:

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, দেশের নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চল হতে মাছের আহরণের পরিমাণ বিগত ২০০০- ২০০১ সালের জন্য তুলনায় ২০১০-২০১১ সালে গড়ে প্রায় ৩.৭০% হ্রাস পেয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চলে মাছের উৎপাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।

জীববৈচিত্র্যের অন্যতম প্রজাতি মৎস্যকুলের ধ্বংসে নদ-নদীর প্রভাব

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা, প্রকৃতি ও মানুষের বৈরীতার কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সুযোগের অপ্রতুলতা, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত আধার ইত্যাদির সমন্বয়হীন ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশ একই সাথে সংকট ও সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। মাছের উৎপাদন হ্রাসের জন্য একই সাথে প্রাকৃতিক কারণ এবং মানবসৃষ্ট কারণগুলোও সমভাবে দায়ী।

প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

সময়মতো বৃষ্টিপাত না-হওয়া।
নদ-নদী ভরাট হয়ে নাব্যতা কমে যাওয়া।
নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়া।
প্লাবন ভূমির সাথে সংযোগ খালসমূহ ভরাট হয়ে যাওয়া বা সংকুচিত হয়ে যাওয়া।

হাওড়-বাওড়-খাল-বিল ইত্যাদির গভীরতা হ্রাস পেয়ে মাছের প্রজননক্ষেত্র সংকুচিত বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ।

অপর দিকে মানবসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

উজানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ।

পানি নিষ্কাশন ।

বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণ ।

নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ নিধন ও পোনা নিধন ।

বসতভিটা তৈরি করে জলাশয় ভরাটকরণ বা সংকোচন ।

ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হওয়া ।

বিভিন্ন নদীশাসন কার্যক্রমের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, উজানে বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে পদ্মা মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রসহ এসব নদ-নদীর অসংখ্য শাখানদীর নাব্যতা আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে । বিগত কয়েক দশকে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে এদেশের এককালের প্রমত্তা নদীগুলো । পলি ভরাট, জেগে ওঠা চর বন্ধ করে দিয়েছে অসংখ্য উপনদী ও খালের সাথে প্লাবনভূমির সংযোগ । ভরাট হয়ে পড়েছে হাওর-বাওড়, ছড়া এবং কোনার বিলগুলো, ফলে মাছ প্রজননের জন্য নদী থেকে প্লাবনভূমিতে যেতে পারছে না অথবা ফিরে আসতে পারছে না । প্লাবনভূমি থেকে নদীতে নগর ও শিল্প বর্জ্যের পলিবাহিত ঘোলা পানি নষ্ট করে দিয়েছে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রগুলো ।

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ করে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনে আমাদের করণীয়

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ । ভবিষ্যতের খাদ্যনিরাপত্তা বলয় তৈরি করার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছে । বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দিনে দিনে খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে । মাটি, পানি এবং মানবসম্পদ এই তিনটি হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এ তিন সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহারের ওপরেই নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ।

প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার জৈব বা অজৈব সম্পদের পরিমাণ অফুরান নয় । সেদিক থেকে বিবেচনা করলে মৎস্যসম্পদও এর ব্যতিক্রম নয় । মৎস্যসম্পদ একটি জীবিত এবং সতত পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য সম্পদ । দক্ষতার সাথে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মত সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পদের আহরণ নিশ্চিত করতে পারলে অনাদিকাল ধরে এ সম্পদের যোগান পাওয়া যেতে

পারে। অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন, অবকাঠামো ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, জলাভূমিকে ব্যপকভাবে মৎস্যখামারে রূপান্তর, বনাঞ্চল ধ্বংস করা, নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং অন্যান্য অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

*মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে নতুন কোনো বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ কিংবা সেচ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণের পূর্বেই এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা যাতে করে মাছের অভয়াশ্রম বা অভিপ্রায়নের চলাচলের পথকে বন্ধ না-করে অবাধ পানিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়।

*দেশের নদ-নদীগুলোতে অব্যাহত পলি ভরাটের ফলে নদীর গতিপথ এবং তলদেশের গঠন ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় কার্যকর নদীখনন কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে পলি ভরাট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

*জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। প্রয়োজনে সমন্বিত কীটদমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

*জলাশয়, নদ-নদী, মোহনা বা অন্যান্য উৎসের পানির দূষণ রোধকল্পে নদীতীরে স্থাপিত বিভিন্ন ছোট-বড় শিল্পের স্থায়ী পরিবেশ বান্ধব ইটিপি (Effulent Treatment Plant) চালু করতে হবে।

জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে মৎস্যকূলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কতিপয় সুপারিশমালা:

৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নদী দিবস। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। এই বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে বাংলাদেশের জন্য এই দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘ফিরে চল নদীর টানে’। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিকুলকে তার উৎসমূলের দিকে ধাবিত হতেই হয়। এ যেন সৃষ্টি চিরন্তন এবং নিয়তির এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা আর সেজন্যই–

*দেশের সকল জলাশয়, দিঘি নদ-নদী, মোহনা হাওড়-বাওড় ও উপকূলীয় এলাকাসহ সকল প্রকার জলাধারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় মাছ উৎপাদন ও জলজসম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীব ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সহনশীল টেকসই আধুনিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

*জীববৈচিত্র্য রক্ষা, বংশবৃদ্ধি, অভয়াশ্রম, কৃত্রিম পোনা মজুদ এবং সহনশীল আহরণ ইত্যাদির সুসমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়ন করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে ।

*উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া সকল জলাশয় পর্যায়ক্রমে খনন, পুনঃখনন ও সংস্কারের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন করতে হবে ।

*জলজ পরিবেশের বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি যেমন: পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, পিএইচ, তাপমাত্রা, অ্যামেনিয়া, মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি যা মৎস্যের জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা রাখে তা বজায় রাখতে হবে ।

*উন্মুক্ত জলাশয়ে নির্বিচারে পোনা নিধন, ডিমওয়ালা মাছ নিধন ও অতিমাত্রায় আহরণ বন্ধ করতে হবে ।
*অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোর মালিকানা-সমস্যা নিরসনসহ পানির বিকল্প ও প্রতিযোগিতামূলক অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ করতে হবে ।

*মৎস্যচাষ সংক্রান্ত উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ সহ মৎস্যচাষে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দিতে হবে ।

*আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলো দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তার সাথে সাথে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি হয় এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিপ্রায় ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ।

*পরিবেশগত সংকটপন্ন এলাকা, জীববৈচিত্র্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত এলাকা ও সামুদ্রিক সম্পদের আধারসহ অন্যান্য নাজুক অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

*জাতীয় পানি নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সহ মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হবে ।

উপসংহার
পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিমিত আহরণ অভিযোজন-অভয়াশ্রম সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম যদি সত্যিকার অর্থেই আমরা কার্যকর করতে পারি তাহলে এসব কর্মকাণ্ডের ফলে উক্ত বিপন্নতার মাত্রাকে কমিয়ে দেবে । ভবিষ্যৎ খাদ্যনিরাপত্তা এবং এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত

মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এখন থেকেই সর্তক হয়ে এ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এদেশের দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে মৎস্য জীববৈচিত্র্যকে বিশেষ বিবেচনায় আনা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশের মানুষের আমিষের চাহিদার প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ এবং মোট প্রাপ্ত প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬৩% আসে মাছ হতে। জলজ পরিবেশের নানাবিধ জীববৈচিত্র্যের মধ্যে মৎস্য-জীববৈচিত্র্যই প্রধানত লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে মহামূল্যবান মৎস্য প্রজাতি এবং জাতের বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া দিনে দিনে বেড়েই চলছে বিধায় মৎস্য-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

সত্যিকার অর্থে নদীর কোনো সীমারেখা নেই। আমরা মানুষেরাই নদীর সীমারেখা টানি এবং বিবেধের দেয়াল গড়ে তুলে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনছি। আমাদের সম্পদ আছে কিন্তু পরিকল্পনা নেই; আইন আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। তাই সমন্বয়ের অভাবে আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আজ বিরান হতে চলেছে। এখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে বিশ্বের ১৭৩ টি দুযোর্গপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম। তাই পানির টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই মানবসভ্যতা বিকাশের অবারিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে বলে আমরা সকলেই বিশ্বাস করি।

[লেখক: এম.এম. ইফতেখার হাসান; পরিদর্শক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ২০৯, এন. এম. খাঁন হিল, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।]

নদীর মৃত্যুঘণ্টা

মুশফিকুর রহমান

‘নদী যদি হয়রে ভরাট
কানায় কানায়
হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ
তাতে কী মানায়...’

লোকগানের এ চরণ যখন কোনো দরদী গলায় শুনি, সত্যি বিষণ্ন বোধ করি। যারা প্রতিবছরের বানে নদীর দুকূল উপচানো জলে অসংখ্য ভোগান্তির শিকার হন, তারা আমাকে দোষারোপ করতে পারেন। কখনো নদীর বয়ে আনা বন্যা জাতীয় ট্র্যাজেডিরও কারণ বটে। নিকট অতীতের (১৯৯৮-এর বন্যা) শতাব্দীর ভয়াবহতম দীর্ঘ স্থায়িত্বের বন্যা আমাদের জন্য এখনও স্মৃতি হয়নি বরং এর ক্ষয়ক্ষতির ভার দেশবাসীকে প্রতিদিনই বইতে হচ্ছে। অবশ্য ১৯৮৮-র বন্যাকে এতদিন মহাপ্লাবন আখ্যা দিয়ে আসার পর একেবারের বন্যা নতুন বিশেষণ খুঁজছে। কে জানে, আগামীতে আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও আগ্রাসী বন্যা আমাদের যদি আঘাত হানে তাকে কী নামে ডাকা হবে। ১৯৯৮-এর বন্যা তো ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৪ এবং ১৯৮৭-র ব্যাপক বন্যাকে অনুল্লেখযোগ্য তালিকায় ঠেলে দিল তার তীব্রতা এবং স্থায়িত্বের বিবেচনায়।

১৯৭৪ সনের বন্য দেশীয় রাজনীতিকে কেবল তোলপাড় করেনি, এবারের নোবেলবিজয়ী দার্শনিক-অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার উপাদানও যুগিয়েছে। নিত্যসঙ্গী বন্যা তাই মনে হয় আমাদের নিয়তি-নির্ধারিত। অবশ্য মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড বন্যার তীব্রতা এবং স্থায়িত্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী সে তথ্যও এখন আর অজানা নয়। মানুষের প্রতিরোধের শক্তি যে বন্যার তীব্রতায় নগণ্য, আমাদের ভূখণ্ডের অভিজ্ঞতা বারবারই তা মনে করিয়ে দিয়েছে। তবু ‘বন্যা প্রতিরোধের’ প্রলোভন নানাভাবে জাগতিক লাভে লাভবান হবার প্রয়াসী গোষ্ঠীকে বিরত রাখেনি। এতদিনে পরিবেশ চেতনার প্রসারে অবশ্য বন্যার সাথে কত দক্ষভাবে সহাবস্থান করা যায় তার প্রযুক্তি অনুসন্ধানে মনোযোগ বাড়ছে।

আমার বন্যার নিয়ত সঙ্গী কেননা প্রাকৃতিকভাবে আমাদের ভূখণ্ড নদীর জালে বোনা। আমাদের সীমানার চারপাশের ভূখণ্ডগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক নদী এসে মিশেছে আমাদের ভূখণ্ডে। কেবল ভারতীয় ভূখণ্ডের ৯৪টি নদী এবং সে সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তিলাভ করা সবগুলো ছোট-বড় নদী মিলিয়ে প্রকৃত অর্থেই নদ-নদীর এক জাল ছড়িয়ে রয়েছে পুরো ভূখণ্ডে। সুতরাং দেশের ভেতরে যত বৃষ্টিপাত হয় তার সাথে উজানের নদীগুলোর বয়ে আনা বৃষ্টি ও বরফগলা জলের মিলিত জলধারা প্রায় নিয়মিত নদী অববাহিকার সমতল বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে। অতীতের বন্যাগুলোতে মানুষ অপেক্ষাকৃত কম ঘরবাড়ি হারাত, কেননা, নদীর পানি স্বাভাবিক বর্ষায় উপচে পড়ত, তেমন নিচু জায়গায় ঘর বাঁধবার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু মানুষ বাড়ছে যে গতিতে, তাতে অব্যবহৃত জায়গা রাখার বিলাসিতার সুযোগও সংকুচিত হচ্ছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিপাতেই অনেক নদীসংলগ্ন প্লাবনভূমির উপর গড়ে উঠা লোকালয় ডুবিয়ে দিচ্ছে। ফসলের মাঠ, মাছের বা গবাদিপশুর খামার ডুবে বিপুল ক্ষতির বোঝা বাড়ছেই।

বন্যা তো কেবল কষ্ট আর ট্র্যাজেডিরই বাহন নয় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনের বন্যার আশীর্বাদও কম নয়। এত নদীর এবং বৃষ্টির দেশ হবার সুবাদে মাথাপ্রতি পানির প্রাপ্যতা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষের চেয়ে আমাদের বেশি। নদী আমাদের অঞ্চলে বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতোই সভ্যতা বিকাশের অন্যতম ইন্ধন। প্রাচীন নগরী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর পাশে সচরাচর যেমন নদীর নিশ্চিত অবস্থান পৃথিবীর দেশে দেশে পাওয়া যায়, আমাদের ভূখণ্ডেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ব্যবসা, শিল্প, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রগুলোও তাই নদীর তীরে ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে। স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত দীর্ঘ পানির চ্যানেলকে বিশেষজ্ঞগণ নদী নামে চিহ্নিত করেন।

পর্বতমালার হিমবাহ বা পর্বতখাদে জমা হওয়া বরফগলা জল, পাহাড় বা পর্বতমালার গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনাধারা, উচড়ে-পড়া হ্রদের জল এবং বৃষ্টির জলাধারা মিলেমিশে নদীর জলের উৎস। নদী তার উৎপত্তির মুহূর্ত থেকে ছুটে চলে সাগর বা নিচু অবস্থানের কোনো হ্রদ, বড় নদী বা ন্যূনপক্ষে কোনো নিচু জলাশয়ের দিকে। চলার পথে আরও অসংখ্য ঝরনাধারা, পাহাড়ি ছড়া বা ছোট নদী (উপনদী) নদীর ধারায় এসে মেশে। এভাবেই তৈরি হয় বড় নদী। আফ্রিকার এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম নীলনদ (৬,৬৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ), দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী (৬,৪৩৭ কিলোমিটির দীর্ঘ), উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি ও চীন দেশের ইয়াংজি (৬,৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম) বা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, মেকং, রাইন, ভল্গা ও সিন্ধুসহ সব বড় নদীর ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। অবশ্য দৈর্ঘ্যে বড় না-হয়েও আমাজন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কেননা নীলনদ, মিসিসিপি ও ইয়াংজি

নদীর মিলিত জলধারার সমপরিমাণ প্রবাহ একা আমাজন আটলান্টিক মহাসগরে পৌঁছে দেয়।

নদী নিয়ে গর্ব আমাদের একার নয়; রাইন নদী (১,১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ) ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জার্মানির শক্তি ও ইতিহাসের প্রতীক। ইউরোপের দীর্ঘতম ভল্গা (৩,৫৩১ কিলোমিটার) নিয়ে রুশদের গর্ব আর ইতিহাস তো প্রবাদসম। দানিয়ুবের (২,৮৬০ কিলোমিটার) নীল জলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ অস্ট্রীয় সংগীত পরিচালক ও সুরকার য়োহান স্ট্রাউস খ্যাতিছড়ানো 'On the beautiful blue Danbue' শীর্ষক ওয়ালজ (waltz) রচনা ক'রে অমর হয়ে আছেন।

নদীর উৎপত্তি এবং তার চলার পথ বিশ্লেষণে অসংখ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাস জানা যায়। একইভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় নদীর গতিপথ কতভাবে বদলে দেয় সভ্যতা, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্র। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বিস্তারিত জানতে হলে এর নদীর সিস্টেমকে জানার কোনো বিকল্প নেই।

সাধারণভাবে বলা হয়, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সিংহভাগ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার বয়ে আনা পলি দিয়ে গড়ে উঠেছে। নদীর প্রবাহ মোহনার কাছে এসে নাটকীয়ভাবে গতি হারায়। ফলে বয়ে আনা খনিজের ভগ্নাংশ, নদীর স্রোতে ক্ষয়ে এসে নদীর জলে মেশা জৈব-অজৈব উপাদান, বালি-পাথর নদীর মোহনায় জমা হয়। এভাবেই গড়ে উঠে বদ্বীপ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো এখনও বছরে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন টন পলি সাগরে বয়ে নিয়ে যায়। সেকারণেই সাগরমোহনায় নতুন দ্বীপ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেমে নেই। টারসিয়ারি যুগে (৬৫-২ মিলিয়ন বছর) হিমালয় পর্বতমালা গড়ে উঠবার সাথে সাথে আমাদের ভূখণ্ড গড়ে উঠবার সম্পর্ক নিবিড়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী এবং তার উপনদী, শাখানদীর মিলিত অবদান এই ভূখণ্ড গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চল (Pleistocene Terraces) এবং টারসিয়ারি যুগের পাহাড়সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সিংহভাগ অঞ্চল বর্তমান যুগের পলিগঠিত (Recent aliuvial deposit)। ডেলটা বা বদ্বীপ গড়ে উঠবার নিয়মে বাংলাদেশ ভূখণ্ড অসংখ্য নদনদী, শাখানদী, জলাভূমি, বিল-হাওড়, ছড়া, খাড়ি ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। পদ্মা (গঙ্গা নদীর নিম্নভাগ), যমুনা (ব্রহ্মপুত্র নদের পরিবর্তিত প্রধান ধারা) এবং মেঘনা নদীর মিলিত স্রোতোধারা চাঁদপুর থেকে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। মাত্র ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বিশাল মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। কেননা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত প্রবাহ এই নদীপথে সাগরে গিয়ে মেশে।

ভারতের হৃদয় বলতে যে গঙ্গা, হিমালয়ের গঙ্গোত্রী থেকে ১৯ কি.মি. দূরে ৭০০০ মিটার উঁচু গোমুখে তার জন্মে। এর ড্রেনেজ অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় ৯,০৭,০০০ বর্গ কি.মি.। ২৫১০ কি.মি. পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পড়ে সে হয়ে গেল পদ্মা। পদ্মা

নদী প্রথমে তার প্রধান শাখা গড়াই-মধুমতীর প্রবাহ এবং পরে আড়িয়াল খাঁ নদ এবং তারও পরে বর্তমান ধারায় বহমান। অবশ্য বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশের আগে ভারতের ফারাক্কার নিকটবর্তী হুগলি নদীও গঙ্গার অন্যতম প্রবাহ ছিল। বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ায় গঙ্গা গত প্রায় চার হাজার বছর কাল সময় ধরে পশ্চিমের গড়াই-মধুমতী থেকে পূর্বের হুগলি এবং পরে আবারও মধুমতীর দিকে সরে এসেছে। হুগলি নদী গঙ্গার শাখা হিসেবে দীর্ঘদিন তার অবস্থান অটুট রাখলেও মধুমতী থেকে গঙ্গা বরং একটি অপেক্ষাকৃত কম সময়েই আরও পূর্বে সরে গেছে। ঈশ্বরদীর কাছাকাছি স্থান থেকে গঙ্গার একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধারা একসময় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মূল প্রবাহের সাথে মুন্সিগঞ্জের কাছাকাছি জায়গায় এসে মিশেছিল। ১৬১০ খ্রি. মোগল রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর সেই ক্ষীণধারার গঙ্গার শাখার তীরেই স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পলি জমে সে নদী প্রায় অচেনা বুড়িগঙ্গা হয়ে আজও টিকে আছে। তবে নতুন পরিচয়ে ধলেশ্বরীর একটি শাখা হয়ে।

বঙ্গীয় বদ্বীপের অপর প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র। হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমাংশের তিব্বত মালভূমির ইয়া-রু-জান-বু (Ya-Ru-Xan-Bu) নামক স্থানের হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। ২,৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র নদের (গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত) ড্রেনেজ অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় ৫, ৮৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার। উৎপত্তিস্থল থেকে বেরিয়ে মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক পথ হিমালয় পর্বতমালার সমান্ত রালে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়েছে। এরপর আসাম উপত্যকার ৭২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে রংপুরের দইখাওয়া হয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে যুক্ত হয়েছে দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা এবং হুরাসাগর নদী। ব্রহ্মপুত্র প্রধানত মধ্য ও পূর্ববাংলার ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে অধিকাংশ সময় জুড়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে সাগর অভিমুখী ছিল। মৃৎবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, কুমিল্লা এবং নোয়াখালি জেলার সিংহভাগ ব্রহ্মপুত্র নদবাহিত পলি দিয়ে গড়ে উঠেছে। এ থেকেই সঙ্গত অনুমান ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ বর্তমান অবস্থানের চেয়ে আগে আরও অনেক পূর্বদিকে ছিল। ১৭৭২ সনের তীব্র ভূমিকম্পে সম্ভবত মধুপুর অঞ্চলের অনেকটুকু উপরে উঠে আসে এবং ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের দীর্ঘদিনের চেনা গতিপথে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই থেকে ময়মনসিংহের পাশ দিয়ে ক্ষীণকায় আদি ব্রহ্মপুত্র এখনও প্রবহমান রয়েছে।

অপরদিকে জেনাই নামের ক্ষুদ্র একটি জলধারা মূল ব্রহ্মপুত্র নদের ডানপার্শ্ব দিয়ে প্রবহমান ছিল। ১৭৭২ সনের ভূমিকম্প-পরবর্তী ৬০ বছর সময়কালে সেই ক্ষুদ্র জেনাই নদী ব্রহ্মপুত্র নদের পরিবর্তিত মূলধারা হয়ে যমুনা নাম ধারণ করেছে। নদী গবেষকদের দাবি অনুযায়ী যমুনার বিশালতা নিয়ে জেনাই নদীর বদলে যাওয়া সম্পূর্ণ হয় ১৮৩০ নাগাদ। প্রবল ব্রহ্মপুত্র নদ যতদিনে তার গতিপথ বদলে পশ্চিমে সরে যমুনায় ঠাঁই নিয়েছে, ততদিনে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ক্রমশ গড়াই-মধুমতী থেকে

আড়িয়াল খাঁ নদ এবং আরও পূর্বে সরে গিয়ে আদি বিক্রমপুর অঞ্চল ভেঙে নিয়ে বর্তমান অবস্থানে জায়গা নিয়েছে।

এদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ তার মূল প্রবাহ জেনাই নদীতে সরিয়ে আনায় পদ্মার প্রবাহ মাত্র কয়েক বছরে ফুলে-ফেঁপে ওঠে এবং আরিচার কাছাকাছি চাঁদপুর পর্যন্ত বিশাল চওড়া এক নদীর জন্ম হয় এবং চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত ধারা গড়ে তোলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জল পরিবাহী নদী।

এদিকে মাত্র ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেঘনা দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও তার ড্রেনেজ অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় ৬৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। আসামের পাহাড়ি বরাক নদী বাংলাদেশের সিলেট সীমান্তের নিকটবর্তী আমালসিদ-এর কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি ভিন্ন নদী হয়ে প্রবাহ অব্যাহত রাখে। সুরমা সিলেট জেলার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে এবং কুশিয়ারা দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সুরমার প্রবাহিত হবার পথে সারিনদী, শিংগের খাল, পিয়ানাগাং এবং সারিগোয়াইন নদী এসে তার সাথে মিশেছে। অপরদিকে জুরিনদী মনু ও খোয়াই নদী মিলেছে কুশিয়ারার সাথে। পরবর্তীকালে সারকুলি নামক স্থানে সুরমা এবং কুশিয়ারাও একত্রিত হয়ে নাম নিয়েছে কালনী। কুলিয়ার চরের কাছে গৌরাঙ্গ এসে মিশেছে কালনী নদীর সাথে এবং এখান থেকেই মিলিত প্রবাহের নাম মেঘনা। ভৈরব বাজার রেলওয়ে ব্রিজের কাছে মেঘনা নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের উত্তরপ্রান্তে পদ্মার সাথে একীভূত হয়েছে মেঘনা। মোট ৮০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বরাক-মেঘনা নদীর অর্ধেক বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

প্রায় দেড়শত বছর আগেও আজকের বৃহত্তর বরিশাল ও সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে মেঘনার শাখাগুলো প্রবাহিত হত। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বরিশাল জেলার সুন্দরবনের সিংহভাগ উজাড় হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বালেশ্বর নদীর পশ্চিম পাশের সুন্দরবন এলাকা কোনোরকমে টিকে থাকে যা ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে। বালেশ্বর হল মধুমতীর নিচের অংশের নাম। বর্তমানের সুন্দবনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর মধ্যে বৃহত্তম পশুর বা পসুর নদী। মধুমতী নদীই এর মূল প্রবাহের উৎস। খুলনার উপরের অংশে কপোতাক্ষ ও নবগঙ্গা একসময় বড় নদী ছিল। কিন্তু কালের প্রবাহের পদ্মার মূল প্রবাহ সরে যাওয়ায় কপোতাক্ষ বা নবগঙ্গার কথা অনেকেই বিস্মৃতপ্রায়। ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম প্রধান উপনদী তিস্তা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোরাঘাট, আত্রাই, হুরাসাগর হয়ে এই জলধারা বুড়িগঙ্গায় মিলিত হত। আজকের করতোয়ার ক্ষীণধারা সে স্মৃতির ইঙ্গিত বহন করছে মাত্র। ১৭৭২-এর প্রবল ভূমিকম্প এই নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বাইরে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ফেনি নদীর পূর্ব পার্শ্বের চট্টগ্রাম অঞ্চল। পাহাড়ি এই অংশের প্রধান নদী কর্ণফুলি। এছাড়া ফেনি, সাংগু, মাতামুহুরী, বাগখালি উল্লেখযোগ্য। হালদা, ইছামতি, চেঙ্গী, শুভলং, রাইনখেওং এবং কাশালং নদী এসে মিলেছে কর্ণফুলির সাথে। পাহাড়ি এই নদীগুলো একটানা খানিকক্ষণের বৃষ্টিতেই চারপাশ প্লাবিত করে। আবার পানি নেমে গিয়ে দ্রুত ফিরে পায় নিজ রূপ।

জালের মতো ছেয়ে থাকা নদীগুলোকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের মানুষের জীবন, কৃষি, পরিবহন, ব্যবসা, সভ্যতা, ইতিহাস বিকশিত হয়েছে। ঘনবসতির এই দেশে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ধানচাষের ওপর চাপ বেড়েই চলেছে। ধানচাষের প্রয়োজনে সেচের পানির চাহিদাও বাড়ছে। একই সাথে একাধিক ফসল তুলবার প্রয়োজনে নদীকে কৃত্রিম বাঁধ দেয়ার এবং নদীর পানি পাম্প করে জমিতে ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। মূলত ধার করে আনা এই উন্নয়ন কৌশল সময়ের পরীক্ষায় উপযোগী কিনা সে প্রশ্ন এখন বিশেষজ্ঞদের ভাবিত করছে। মেঘনা-ধনাগোদা, ডিএনডি প্রকল্পের স্থায়ী জলাবদ্ধতা এবং বিশ্লেষণে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া এ-জাতীয় নদীশাসন প্রকল্প উপর্যুপরি বন্যা-জলাবদ্ধতা এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম ইন্ধন। আর্থিক বিবেচনাতেও এ-জাতীয় প্রকল্প অলাভজনক।

নদীপ্রবাহ এবং গতিপথ পর্যালোচনা থেকে মোটামুটি স্পষ্ট নদীর ভাঙাগড়া আমাদের ভূখণ্ডে নিত্যসঙ্গী। বড় নদীগুলো গতিপথ বদল করলে অনেক শাখানদী শুকিয়ে যায়। প্রচুর পলি পড়ার কারণে ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, গড়াই নদী, আড়িয়াল খাঁ নদ শুকনো মৌসুমে মৃতপ্রায়। একই সাথে নদীশাসনের নামে এলোপাথাড়ি বাঁধ প্রকল্প, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নদী ভরাট করে লোকালয় সম্প্রসারণ, নদীতে গৃহস্থালি, হাসপাতাল, বাজার এবং শিল্পের নির্বিচার অপরিশোধিত বর্জ্য নিক্ষেপ বড় শহর-নগর সংলগ্ন অনেক নদীর দ্রুত মৃত্যু ডেকে আনছে। নদী বেঁচে থাকলেও নদীর পানি হয়ে পড়ছে বিষাক্ত, জলজ প্রাণীদের বসবাসের অনুপযোগী।

ভৌগোলিক কারণেই আমাদের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে নদীগুলোর ৮৫% ভারত থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আবার ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে আসা নদীগুলোর এক-তৃতীয়াংশ নেপাল এবং এক-দশমাংশ ভুটান থেকে প্রবাহিত। ফলে এই অভিন্ন নদীগুলো কেবল আমাদের ভূখণ্ডের বর্জ্যই বহন করছে না, এ সাথে যোগ হয়েছে উৎসের দেশগুলোর নিক্ষেপিত বর্জ্য। নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে পানি উত্তোলন, নদীর গতিমুখ পরিবেশের বিবেচনা-ব্যতিরেকে ঘুরিয়ে দেয়া এবং নির্বিচারে জৈব-অজৈব বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নিক্ষেপে নদীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ঢাকার বুড়িগঙ্গা, টঙ্গীর বালুনদী, চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এবং খুলনার ভৈরব মারাত্মকভাবে দূষণাক্রান্ত। পয়ঃনালী এবং শিল্পের বর্জ্য এই নদীগুলোর পানি

দূষণে প্রধান ভূমিকা রাখছে। ফলে ঘনবসতির এই দেশে নদীর পানি বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়াচ্ছে। জলজ প্রাণী এবং মাছের জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেন দূষণাক্রান্ত নদীর পানিতে প্রায়শ অনুপস্থিত থাকছে। কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার প্রতি ১০০ মিলিলিটার পানিতে ০-৪ কলোনির সহনীয় সীমা এ সকল নদীর পানি প্রায়শই কয়েকগুণ অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি নমুনা জরিপে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি উক্ত সহনসীমার কয়েকগুণ থেকে কয়েক হাজার গুণে উন্নীত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদী এ বিবেচনায় তীব্রভাবে দূষণাক্রান্ত নদী। হাজারিবাগের কাছাকাছি জায়গায় বুড়িগঙ্গার পানিতে প্রতি লিটারে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২ মিলিগ্রাম বা তার চেয়ে কম। অথচ প্রতি লিটার পানিতে অন্তত ৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেন না-থাকলে মাছের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ-কারণেই পুরো বুড়িগঙ্গা শুকনো মৌসুমে প্রায় মাছশূন্য হয়ে পড়ে। অথচ সাভারের দক্ষিণে ধলেশ্বরী থেকে উৎপত্তি লাভ করে ফতুল্লার দক্ষিণে আবারও ধলেশ্বরীতে গিয়ে মেশা বুড়িগঙ্গা ঢাকার উত্থানের ইতিহাসের সাক্ষী। এই বুড়িগঙ্গা অগণিত মৎস্যজীবীর নিশ্চিন্ত জীবিকার যোগান দিয়েছে সারা বছর। বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্যে মুগ্ধ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব-পুত্র শাহজাদা আজম ১৬৭৮ সনে বুড়িগঙ্গার তীরে লালবাগের কেল্লা গড়েছেন। বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরাতে চাননি বলে ঢাকার নবাবগণ নদীর দিকে মুখ করে আহসান মঞ্জিল গড়েছেন। এখন ঘিঞ্জি বস্তি, বিসদৃশ অট্টালিকা আর এলোমেলো নোংরা বাজার, আড়ৎ, শিল্প-কারখানা, লঞ্চঘাটের কোলাহলে দুর্গন্ধ-ছড়ানো বুড়িগঙ্গার পাশ থেকে সরে যেতে পারলেই যেন সবাই বাঁচে। অথচ বিভাগ-পূর্বকালে এই সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধে নির্মল নদীর বায়ু সেবনের জন্যে ভিড় করতেন শহুরে বাবুগণ।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এশিয়ার নদী দূষণের প্রতিযোগিতায় (পৃথিবীর নদী দূষণের হারের চেয়ে এশিয়ার নদী দূষণমাত্রা তিনগুণ এবং শিল্পোন্নত ইউরোপের দশগুণ বেশি) বাংলাদেশ সবাইকে পেছনে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবব-না নদী অববাহিকার বাংলাদেশের নদীগুলো যদি দূষণের ভারে ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়ে, আমাদের কৃষিনির্ভর জীবন এবং জীবিকার কী হবে?

আমাদের প্লাবনভূমি যেহেতু নদীর জলধারার অত্যন্ত কাছাকাছি সুতরাং দূষণাক্রান্ত নদীর পানি সামান্য বাড়লেই আমাদের ঘরে আসা ঠেকানো অসম্ভব। সুতরাং শিল্পের বিষাক্ত বর্জ্যের সাথে সাথে মলমূত্রের জৈবিক বর্জ্য অবিরাম নদীতে ফেললে তা থেকে গা-বাঁচানো কি সুরম্য অট্টালিকা গড়ে ঠেকানো যাবে? ১৯৯৮-এর দীর্ঘস্থায়ী বন্যার অভিজ্ঞতা কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পরিবেশ-সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তার কথা।

অন্যদেশের বিকল্প থাকতে পারে, কিন্তু ভৌগোলিকভাবে আমরা যেহেতু নদী অববাহিকার প্লাবনভূমির অধিবাসী, সুতরাং অন্য যে কারও চেয়ে নদীর সাথে আমাদের

আত্মিক সম্পর্ক তো অনেক বেশি নিবিড় হবার কথা। কাজেই নদীর মৃত্যু আমাদেরও মৃত্যুঘণ্টা বাজাবে অবধারিতভাবেই।

তথ্যসূত্র

১. *The World Book Encyclopedia*, Vol—16, World Book, Inc. USA, 1989.

২. Sad State of Asia's Environment, Extract from *Energing Asia : Changes and Challenges*, Asian Development Bank, 1997. The Daily Star, December 8, 1998.

৩. *Bangladesh Environment : Facing the 21st Century*, Editor : Philip Gain, SEHD, 1998

৪. *Floods in Bangladesh : Recurrent Disaster and Peoples Survival*, Mosharrof Hussain, ATM Aminul Islam & Sanatkumar Shaha, University Research Center, Dhaka, August, 1987.

৫. *Geology of Bangladesh*, K. U. Reimann, Gebruder Borntraeger, Berlin, Stuttgart, 1993.

[লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক।]

বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়ের পানি প্রবাহ

উম্মে কুলসুম নাভেরা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী জালের মতো বিস্তৃত আছে। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য খাল-বিল, হাওড়-বাওড়সহ অন্যান্য জলাভূমি। এদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় নদ-নদী ও অন্যান্য জলাভূমির ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশের জীবিকা সরাসরি পানির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাভূমিতে পানির প্রবাহ শীর্ষক লেখাটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে লিখছি। প্রথমটি নদ-নদী কেন্দ্রিক ও পরবর্তী ভাগটুকু জলাশয় নিয়ে।

বেঙ্গল বেসিন (Bengal Basin) তিনটি বড় নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এইগ basin) অববাহিকায় অবস্থিত। গঙ্গা নদীর Catchment area-র ১,০৮৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার (যার ৮৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভারতে, ১৪৭,৪৮০ বর্গ কিলোমিটার নেপালে, ৩৩,৫২০ বর্গ কিলোমিটার চীনে এবং ৪৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশে), ব্রহ্মপুত্র নদের ৫৩২,০০০ বর্গ কিলোমিটার Catchment area-র মোট ২৭০,৯০০ বর্গ কিলোমিটার চীনে, ৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভুটানে, ১৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভারতে এবং ২৪,১০০ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত। মেঘনা নদীর ১০২,০০০ বর্গ কিলোমিটার Catchment area-র মধ্যে ৫১,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভারতে, ১০০০ বর্গ কিলোমিটার মায়ানমারে ও ৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত। কাজেই বড় নদীগুলোর Catchment area হিসাব করে দেখা যায় যে GBM basin ১,৭৬১,৩০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে ১২০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার আছে যা আয়তনের হিসাবে মাত্র ৭%। কাজেই বাংলাদেশে সধলড়ৎ নদীগুলোর পানিপ্রবাহ পুরাপুরি ভাবে total catchment area-র উপর নির্ভরশীল।

এ দেশে প্রধান নদ-নদী System তিনটি: (১) গঙ্গা-পদ্মা, (২) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও (৩) সুরমা-মেঘনা। সুউচ্চ হিমালয় পর্বতে সৃষ্টি হয়ে নেপাল ও ভারতের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন নামে পথ-পরিক্রমা করে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এ ছাড়া হিমালয়ের কিছু বিশাল হিমবাহের পানি একত্র হয়ে চীন ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে

প্রবেশ করেছে ব্রহ্মপুত্র যা তিস্তার সাথে মিলিত হয়ে নাম নিয়েছে যমুনা। দুটি বৃহৎ নদীর পানি (গঙ্গা ও যমুনা) আরিচায় মিলিত হয়ে পদ্মা নাম নেয়। এছাড়া ভারতের বরাক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা-কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয় এবং পুনরায় যুক্ত হয় অসংখ্য হাওড়ের পানির সঙ্গে মেঘনা নাম নিয়ে। পদ্মা এর পর মেঘনার সাথে চাঁদপুরে মিলিত হয়ে লোয়ার মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদী বাংলাদেশের খরভব line হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাংলাদেশের নদ-নদী-২০১১) হিসাব অনুযায়ী এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা আনুমানিক ৪০৫টি। পানিবিজ্ঞানীদের কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ৬টি হাইড্রোলজিকাল অঞ্চলে (Hydrological Region) ভাগ করা হয় (ক-চ) এবং নদ-নদী সমূহকে অঞ্চলভিত্তিক পরিচিতি দেয়া হয়। (ক) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (North West Region)ঃ এ অঞ্চলে ছোট-বড় মিলিয়ে ১১৫ টি নদ-নদী রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুনর্ভবা, ইছামতি, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, যমুনা, কাগেশ্বরী ইত্যাদি। বাংলাদেশের অন্যতম যমুনা নদী এ অঞ্চলে পড়ে। (খ) উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চল (North Central Region): এ অঞ্চলে বড় নদীর সংখ্যা কম হলেও রাজধানী ঢাকার আশে-পাশে অবস্থানের কারণে বেশ কয়েকটি নদ-নদীর নাম উল্লেখযোগ্য যার মধ্যে বালু, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, তুরাগ, বুড়িগঙ্গা উল্লেখযোগ্য এ ছাড়াও আছে গঙ্গা নদী। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬১টি নদ-নদী আছে। (গ) উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (North Eastern Region)ঃ হাওড়-অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৮৭টি নদ-নদী দেখা যায়। এই এলাকায় নদীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Flush flood বা হঠাৎ বন্যা হওয়া। উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে আছে সুমেশ্বরী, কালনী, সুরমা, কুশিয়ারা, খোয়াই ও মনু নদী। (ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল (South -Eastern Region)ঃ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট অসংখ্য হাওড় ও সুরমা কুশিয়ারার মিলিত জলরাশি আপার মেঘনা এ অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। অঞ্চলে ছোট বড় ২৪টি নদী আছে যার মধ্যে গোমতী, তিতাস, মুহুরী, ফেনী, ডাকাতিয়া উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের প্রাণ গঙ্গা-যমুনা (পদ্মা) ও আপার মেঘনার মিলিত বিরাট জলরাশি লোয়ার মেঘনা এ অঞ্চল পার হয়ে বঙ্গোপসাগরের ধাবিত হয়। (ঙ) পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল (Eastern Hilly Region) ঃ দক্ষিণ পূর্বে পাহাড়ি অঞ্চলে নয়নাভিরাম ১৬টি নদীর ঠিকানা এদের মাঝে কর্ণফুলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর এ নদীতে অবস্থিত। এছাড়াও আছে হালদা, সাংগু, নাফ, বাঁকখালী ও মাতামুহুরী নদী। (চ) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (South Western Region)ঃ বাংলাদেশের এই অঞ্চলে জালের মতো বিছিয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী এবং এ এলাকাটি পরিচিত Ganges Dependent Area (GDA) নামে।

এ অঞ্চলের নদীর পানির প্রবাহ মূলত গঙ্গার প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। ছোট-বড় প্রায় ১০২টি নদ-নদী রয়েছে এ অঞ্চলে। এদের মাঝে গড়াই, মধুমতি, কপোতাক্ষ, পশুর, শিবসা, রূপসা, চিত্রা, আড়িয়াল-খাঁ, ঘাঘর, বলেশ্বর, বিশখালী, লোহালীয়া, সন্ধ্যা অন্যতম। দেশের ৪০৫টি নদ-নদীর মধ্যে ৫৭টি নদী অভিন্ন যার ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং ৩টি মায়ানমার থেকে। এ নদীগুলোকে transboundary river বা সীমান্ত নদী বলা হয়। দেশের মূল পানিপ্রবাহের অনেকাংশই নির্ভর করে এ সকল সীমান্তনদীর ওপর।

বাংলাদেশের পানির প্রবাহ শুধুমাত্র নদ-নদী নিয়ে হিসাব করলে সঠিক তথ্য আসবে না। এদেশের পানির সম্পদের দুটি ভাগ Surface water (ভূ-পরিস্থ পানি) and Ground water (ভূ-গর্ভস্থ পানি)। Surface water-এর উৎস প্রধানত বৃষ্টিপাত (যা দেশের বাইরের নদীর উজান থেকে এবং দেশের অভ্যন্তরে ঘটে) ও পানির প্রবাহ যা দেশের বাইরে থেকে আসে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩০০ সস (Haque, ২০০৮) যা ২৭৬ Million Acre Feet (MAF) পানির সমান। দেশের বাইরে থেকে প্রবহমান পানির পরিমাণ ৮১৮ MAF/year। কাজেই বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ১০৯৪ MAF পানি সম্পদ পাওয়া যায় যার পরিমাণ ১৩৫০ Billion Cubic Meter (BCM) (Haque, 2008)। এই অফুরন্ত পানিসম্পদের অধিকাংশই চলে যায় বঙ্গোপসাগরে। উক্ত পানি প্রতি বৎসর সাথে নিয়ে আসে ১৪০০ Million টন পলি মাটি। নদ-নদী ও জলাশয়সমূহ হচ্ছে স্থল-পানির জমা করা ভাণ্ডার। জলাশয় দু'ধরনের বিল ও হাওড় যা মূলত নদীর গতি পরিবর্তন ও টেকটোনিক চলাচল অথবা Land subsidence-এর ফলে তৈরি হয়। এ ছাড়া এদেশের পানির আরেক ভাণ্ডার হচ্ছে পুকুর। কৃষি ডায়েরির একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বাংলাদেশের Total Water Area হচ্ছে ৪৩,৯৮,০০ হেক্টর = ৪৩,৭৮০ বর্গ কিলোমিটার যা হচ্ছে দেশের মোট surface area-এর ৩০ শতাংশ।

বর্ষাকালে এ দেশের পানির ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত হচ্ছে হাওড় অঞ্চল। হাওড়ের জলাশয় পানি ঋতুর পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল যা বর্ষাকালে আয়তনে বাড়ে আবার শীতে ছোট হয়ে যায়। বর্ষার শুরুতে জলাশয় ভরা শুরু হয় এরপর অবিরাম বৃষ্টিপাত, flash flood-এ এর পরিসর বাড়তে থাকে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৩০টি বিল অথবা হাওড়ের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে (Haque, 2008) যা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আছে।

বাংলাদেশের নদী-নালা, জলাশয়, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি প্রকৃতির অকৃত্রিম দান। কিন্তু এর পরিমাণগত (Quantity) ও গুণগত (Quality) মানের যথার্থতার অভাবের কারণে এই প্রকৃত সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। সীমান্ত নদীসমূহের ওপর উজানের দেশসমূহের নিয়ন্ত্রণ, দেশের অভ্যন্তরে পানির (ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ) যথেচ্ছ ব্যবহার, সার, কীটনাশক ও অশোধিত কলকারখানা বর্জ্য-এর মিশ্রণ ইত্যাদি কারণে পানির পরিমাণগত (Quantity) ও গুণগত (Quality) মান বজায় রাখার সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী-নালা ও জলাশয়ের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[লেখক: ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।]

প্র ব ন্ধ

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প: বাংলাদেশের অভিশাপ এবং আমাদের লড়াই

ফি রো জ আ হ মে দ

সাম্প্রতিককালে ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের দুশ্চিন্তা প্রচণ্ড। সরকারিভাবে আমাদের পানিসম্পদমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিবাদ করেছেন, খোদ প্রধানমন্ত্রী বিলম্বে হলেও সোচ্চার হয়েছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষত বামপন্থীরা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদমুখর। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ সম্পর্কে বাংলাদেশের জনসাধারণের স্পষ্ট ধারণার ঘাটতি আছে। ফলে মুখ্য এবং মৌলিক সমস্যা হিসেবে এ দেশে এই ইস্যুতে ব্যাপক গণসংগ্রাম গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ

সমিতি (বেলা), খুলনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রাজপথের একজন প্রগতিশীল কর্মী হিসেবে বিষয়টি নিয়ে আমার ব্যক্তিগত বেদনা প্রচণ্ড। একে তো ফারাক্কার অভিশাপে জাতি আজ জর্জরিত। মিষ্টিপানির স্বল্পতাহেতু খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়া যার অন্যতম কারণ। সুন্দরবন বিপন্ন হওয়ার পেছনে একই কারণ বিদ্যমান। প্রয়োজনীয় মিষ্টিপানির অভাবে বনটির সুন্দরীগাছ মরে যাচ্ছে, লবণপানির ব্যপকতার কারণে কেওড়াগাছ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রসিকজনেরা বলেছেন, এভাবে চলতে থাকলে সুন্দরবনের নাম অচিরেই কেওড়াবন হয়ে যাবে। এই লেখাটা ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টিরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পানির অপর নাম জীবন। আমাদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উন্নয়ন ও জীবনপ্রবাহের সাথে নদীর সম্পর্ক নিবিড়। এ দেশের অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থল ভারত, একমাত্র ব্রহ্মপুত্র এসেছে তিব্বত থেকে। এছাড়া বান্দরবন জেলার কিছু ছোট নদী মিয়ানমার থেকে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর উৎসমুখ ভারত, সেহেতু ভারত সরকারের সম্প্রতি ৩৭টি প্রধান নদীর সংযোগ সাধন এবং এদের প্রবাহ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের পরিবেশবিদ এবং বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। যুক্তরাজ্যের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার বিশেষ পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জন ভিদাল মত প্রকাশ করেছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শুধু বাংলাদেশের ১৩০ মিলিয়ন মানুষের ১০০ মিলিয়ন স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশসহ গোটা ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদ। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, উপকূল অঞ্চলে উর্বর জমি হয়ে উঠবে লবণাক্ত। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই প্রকল্পটি হবে ভারতের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ প্রকল্প। আমাদের দেশের প্রতিবাদের পূর্বেই বিহারসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহের নেতৃবৃন্দ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। বিহারের একটি ছাত্র সংগঠন বলেছেন, প্রয়োজনে রক্ত দেব তবু যমুনার পানি দেব না। ভারতের প্রতিবাদী কণ্ঠ 'নর্দমা বাঁচাও' আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকার নায়েক বলেছেন, এই প্রকল্পটি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের প্রকল্প, এতে কারো জন্য মঙ্গল হবে না। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিস্ট নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই দানবীয় প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন। গত বছর বিশ্ব পানি দিবসে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচির পরিচালক ক্লাউস টপার বলেছিলৈন, জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না-হলে বিশ্বজুড়ে ১৫০টি নদী অববাহিকায় শরিকি দ্বন্দ্ব এবং রক্ত-সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্যে ক্লাউস টপারের এই বক্তব্য সত্য হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ মূলত নদীমাতৃক দেশ। ২৩০টি নদী-উপনদী বাংলাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী। পদ্মা (ভারতের গঙ্গা), মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র আমাদের প্রধান নদী এবং এই ৩টি নদীর অববাহিকা গড়ে তুলেছে এ দেশের প্লাবন সমভূমি যা সমগ্র অঞ্চলের ৮০ ভাগ। প্রতি বছর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ঋতুতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের তিন ভাগের এক ভাগ বন্যাকবলিত হয়ে যায় এবং দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। শুকনো মৌসুমে অক্টোবর থেকে মে মাসে গোটা দেশ মারাত্মক পানিঘাটতিতে ভোগে। বড় নদীগুলোর প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ছোট নদী-উপনদীর অধিকাংশই প্রায় শুকিয়ে যায়, সারা দেশে খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ব্যাপক মিষ্টিপানির সংকট দেখা দেয়। এক ঋতুতে পানির আধিক্য, অন্য ঋতুতে পানির সংকট। এক অদ্ভুত বৈপরীত্য বাংলাদেশের পানির প্রশ্নে বিদ্যমান।

ভারতীয় নদীসমূহের আন্তঃসংযোগ সব সময়ই একটি লোভনীয় প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রকৌশলী আর্থার কটন এই প্রকল্পের প্রবক্তা। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এ ব্যাপারে। ঘটনাক্রমে ভারত উপমহাদেশে তখন সেটা রেলওয়ে যুগের সূচনালগ্ন, ফলে সেই ডামাডোলে অসংখ্য খাল কেটে দানবীয় নদীগুলোর সংযোগ সাধনের পরিকল্পনা সে সময়ের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। নব্বই বছর পর ১৯৪৫ সালে ক্যাপ্টেন বিনশ দাস্তরের পাইল প্রকল্পের পরিকল্পনা সে সময়ে দেশভাগের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আবার ভেস্তে যায়। ত্রিশ বছর পর ভারতের মুরারজি দেশাই সরকারের আমলে দাস্তর পরিকল্পনাটি আবার বের হয়ে আসে। ভারত সরকার এ বিষয়ে এতই উৎসাহী ছিল যে, তারা রোম আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটির ভালোমন্দ বিবেচনার জন্য। পৃথিবীর নব্বইজন বিশেষজ্ঞ প্রকল্পটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং অনুমোদন করেন। কিন্তু ততদিনে দেশাই সরকার ক্ষমতা হারায় এবং খাল খনন প্রকল্পটি আবারও হারিয়ে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। ভারতের জাতীয় পানি উন্নয়ন সংস্থা (NWDA)-র মহাপরিচালক রাধা সিংয়ের মতে, বর্তমান প্রকল্পের উৎস হল নেহরু মন্ত্রিসভার সেচমন্ত্রী কে এল রাও-এর আদি পরিকল্পনা। ভারতীয় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে নদীসংযোগের মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পানি সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে National Perspective Plan জাতীয় পানি উন্নয়ন সংস্থা National Water Development Agenvy (NWDA) প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল পারসপেক্টিভ প্লানের অধীনে সংযোগ খাল পরিকল্পনা যাচাই-বাছাই করার জন্য। এই সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯৮২ সালের সোসাইটিস রেজিস্ট্রিশন অ্যাক্ট-এর আওতায়। ঘডউঅ তার বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের পর ৩০টি সংযোগ খাল সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য এবং উপরোক্ত ৩০টি সংযোগ খালের মধ্যে ৬টির সম্ভাব্য যাচাই প্রতিবেদনের চূড়ান্ত করে। এরই মধ্যে উল্লেখিত অঞ্চলের রাজ্যগুলো এই পরিকল্পনার

ব্যাপারে ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রকাশ করে এবং এতে এক বিতর্কের সূচনা হয়। বিবদমান রাজ্যগুলোর মধ্যে সমঝোতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এবং প্রকল্পের সামগ্রিক নির্দেশনার জন্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এক টাস্কফোর্স গঠন করে। ভারতীয় লোকসভার সদস্য সুরেশ প্রভু টাস্কফোর্সের সভাপতি, সি সি প্যাটেল সহ-সভাপতি এবং ড. সি ডি থাট্টে সদস্য-সচিব নিয়োজিত হন। ভারতীয় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০২ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নদীসংযোগ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ করতে হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। ন্যাশনাল পারসপেক্টিভ প্যান অনুযায়ী এই প্লান ভারতের অতিরিক্ত ২৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি সরাসরি সেচের আওতায়, ১০ মিলিয়ন হেক্টর জমি গভীর নলকূপ ও সেচের আওতায় এবং ৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করবে। সেই সাথে নৌ-চলাচল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সরবরাহ, মৎস্য, লবণাক্ততা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে সুবিধা প্রদান করবে।

১৯৫১ সালে ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতেই আমাদের সাথে পানিবিরোধ সূত্রপাত। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত পানির হিস্যা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ১৯৭২ সাল ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে ভারত ফারাক্কা বাঁধ ব্যবহার শুরু করে। পরীক্ষামূলকভাবে ১১ হাজার থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পানি সংযোগখালের মাধ্যমে হুগলি নদীতে সরানোর একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতা অর্জিত হয়। ১৯৭৬ সালে ভারত বিনা আলোচনায় পানি প্রত্যাহার করে। ফলে বাংলাদেশে পদ্মানির্ভর অঞ্চলে ব্যাপক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ৫ নভেম্বর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির লক্ষ্য ছিল পরবর্তী পাঁচ বছর শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীর পানিবণ্টন। ১৯৮২ সালে দুই সরকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। ১৯৮৫ সালে আঞ্চলিক নদীগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে আবারও সমঝোতা হয়। ১৯৮৮ সালে থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পদ্মা ও তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে অব্যাহত আলোচনার পর ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে সর্বশেষ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে : (ক) কমবেশি আধাআধি ভাগ, (খ) উভয় দেশের তিনটি নিশ্চিত দশ দিন মেয়াদকাল যখন প্রত্যেক দেশ ৩০ হাজার কিউসেক পানি পাবে, (গ) পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে দুই দেশের ঐকমত্য, (ঘ) সকল যৌথনদী অংশীদারের ভিত্তিতে ব্যবহারের ব্যাপারে ঐকমত্য, (ঙ) সাম্য, ন্যায় এবং পারস্পারিক সদিচ্ছার নীতির স্বীকৃতি। মূলত পদ্মা নদীতে পানিপ্রবাহ হ্রাসের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে পানির প্রবাহ-হ্রাসের কারণে নোনাপানির আগ্রাসন বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষিসেচ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, নদীর গভীরতা হ্রাস পেয়েছ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষি-বনজ ও মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদুপরি ফারাক্কার কারণে এ অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ বিপন্ন। গত ১১ মার্চ ২০০৪ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় পানি নীতি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। বলা হয়েছে, ২২৩টি সভা

অনুষ্ঠানের পর এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই মহাপরিকল্পনায় ভারতীয় নদীসংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে এক ধরনের নির্লিপ্ততা লক্ষণীয়। অপরদিকে ভারতের সর্বশেষ জাতীয় পানি নীতিতে এক অববাহিকা থেকে অন্য অববাহিকায় পানি নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে নদীসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। গত বছর ১৫ আগস্টে ভারতের রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম ও প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর ভাষণে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। এই প্রকল্পটির আওতায় ৩৭টি নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ করা হবে ও ৩০টি খাল কাটা হবে। এর পাশাপাশি ছোট-বড় ৩৪টি থেকে ৭৪টি বড় জলাধার নির্মাণ করা হবে। সংযোগ খালের মাধ্যমে গঙ্গা থেকে পানি নিয়ে যাওয়া হবে গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান প্রভৃতি এলাকায়। এতে গঙ্গায় যে পানিসংকট সৃষ্টি হবে, তা পূরণ করা হবে ব্রহ্মপুত্রের পানি দিয়ে। এভাবে মোট ১৭৪ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি খরাগ্রস্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। ব্রহ্মপুত্রের পানির উচ্চতা গঙ্গা ও অন্যান্য নদী থেকে অনেক উঁচু তাই এখানকার পানিকে পাঁচটা ধাপে ১০০ মিটার উঁচুতে তুলতে হবে। এজন্য লাগবে শত শত পাওয়ার পাম্প আর এগুলো চালু রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ। এটি একক কোনো প্রকল্প নয়, অনেক প্রকল্পের সমন্বিত রূপ। অনেকে তাই নাম দিয়েছে মেগা প্রজেক্ট বা মহাপ্রকল্প। প্রকল্পের টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান গত বছর ৬ আগস্ট ভারতের *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় বলেছেন, এই প্রকল্প ভারতের অনেক রাজ্যের বন্যাসমস্যা সমাধান, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি ও নৌযান চলাচলের ব্যবস্থাকে উন্নত করবে। প্রতি বছর এক কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে, কৃষি লাভবান হবে, পর্যটন, এমনকি মাছ চাষের উন্নতি ঘটবে। ভারতের পানি বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র বলেছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে, খাদ্য উৎপাদন বাড়বে একরপ্রতি চল্লিশ ডলার থেকে পাঁচশ ডলার, ১০১টি জেলা ও পাঁচটি বড় শহরের পানীয় জলের অভাব দূর হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদিত ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। প্রতি বছর ৪% হারে ভারতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে বাংলাদেশের জন্য এই প্রকল্প ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ও দুর্ভোগ ডেকে আনবে। ভারতীয় সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারত হতে আগত আমাদের নদ-নদীতে পানিপ্রবাহ কমে যাবে, অনিবার্যভাবে এদের শাখা-প্রশাখা মরে যাবে। এর পরিণাম জলাভূমিগুলো শুকিয়ে যাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পরিবেশ তথা এই জনপদের টিকে থাকাই হবে দুষ্কর। বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬ কোটি মানুষ আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকিতে আছে। বঙ্গোপসাগরের নোনাপানি দেশের মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত উঠে আসতে পারে। নোনাপানি যদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেটের হাওর অঞ্চলে ঢুকতে পারে, তাহলে সেখানকার ইকোসিস্টেম বিপর্যয়ে পড়বে। ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি মূর্তিমান অভিশাপ, অপরদিকে

ভারতের জনগণও দুর্গতি থেকে রেহাই পাবে না বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। কলকাতার একটি সাময়িক ‘পথিকৃত’-এ (শারদীয় সংখ্যা অক্টোবর ২০০৩) শঙ্কর ঘোষ লিখেছেন, ‘এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শুষ্ক মৌসুমে জলাভাবে জর্জরিত ভাগীরথী, হুগলি নদীর সমস্যা আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। উপর থেকে জলের প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে নদীগর্ভে পলি আরও বেশি করে জমবে। জল আরও বেশি লবণাক্ত হবে এবং এইভাবে ভাগীরথী, হুগলি নদীপথকে অতিদ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হবে।’

আজকের পৃথিবীতে বহুজাতিক কোম্পানির পানি নিয়ে বাণিজ্য চলছে। ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প সে পানিবাণিজ্যের একটি অংশ। পানিসংকটে আক্রান্ত ভারতের বাজার দখল করার জন মনসান্টোর মতো কৃষিবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও নাম লিখিয়েছে। এছাড়া ভিভেন্ডি, বেকটেল, সুয়েজ, কোকা-কোলা, পেপসি, এনরন সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বাজার দখল করতে। নদীসংযোগ প্রকল্প না, পানির ওপর ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের তৎপরতা। প্রকল্পটি আসলে নদী ইজারা দেবার প্ররিকল্পনা। বিপুল আকৃতির স্থায়ী সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে নদীশাসন করা গেলে পানির গ্রাহকরা কর্তৃত্বাধীনে চলে আসবে এটাই নদীপ্রকল্পের মূল কথা। প্রকল্পগুলো যেহেতু বে-সরকারি বিনিয়োগে বাস্তবায়িত হবে, কাজেই পানি বিক্রি করেই কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফা তুলে আনবে। ইতোমধ্যে চেন্নাইতে (মাদ্রাজ) সরকারের পানি সরবরাহের দায়িত্ব ভিভেন্ডি কোম্পানি দখল করেছে, বাংলাদেশও ভিভেন্ডি ওয়াচের সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। সুয়েজ, ভোরমন্ডের সাথে ৬৩৫ মিলিয়ন লিটারের গঙ্গা পানি প্রকল্প কার্যত গোটা নদীটিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করার নামান্তর। সঙ্গত কারণে এই নদীসংযোগ প্রকল্পের ফলে বহুজাতিকদের আগ্রাসনের শিকার হবে বাংলাদেশের মানুষ। কেননা বাংলাদেশের গোটা অর্থনীতি পানিনির্ভর। বাংলাদেশ জনগণের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পথ, সেই সাথে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি না-করে তার নতজানু চরিত্র বিশ্বব্যাংকের কাছে ধরনা দিচ্ছে, যাতে বিশ্বব্যাংক ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পে অর্থে ব্যয় না-করে। কিন্তু এটি হচ্ছে বাংলাদেশের অলীক আশা।

বাংলাদেশ এতবড় সমস্যার মুখোমুখি আর কখনো হয়নি। আমাদের কৃষিমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাংলাদেশ তার প্রধান খাদ্যশস্য এই প্রকল্পের কারণে হারিয়ে ফেলবে। ১৯৯৬ সালের পানি চুক্তির ৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দু'দেশের যে কোনো আন্তর্জাতিক নদীসংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাইলে অপর দেশের সাথে আলোচনা করতে হবে। উজানের দেশ হিসেবে ভারতের ওপর এই দায় আরও কঠোর। অথচ পরিকল্পনার এতদূর অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও ভারত কখনো এ বিষয়ে আলোচনার আগ্রহ দেখায়নি। বাংলাদেশ কূটনৈতিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ

জানালে ভারত যৌথ নদী কমিশনে বৈঠকের আলোচ্যসূচির অবশিষ্টে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়েছে এবং বৈঠকে বলেছে, বাংলাদেশের এ বিষয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। এ থেকেই এ বিষয়ে বাংলাদেশের অভিমত শুনতে ভারতের অনীহা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এই প্রকল্পে বিশাল অংকের অর্থ এবং বহুজাতিক নির্মাণ কর্পোরেশনের স্বার্থ জড়িত। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা করে ভারতের উগ্রবাদী রাজনৈতিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক নির্মাণ ঠিকাদারদের থামানো সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক আইনের ফাঁক-ফোকরে আমাদের এগোনো দুঃসাধ্য। কিন্তু ভারতের এই অশুভ তৎপরতা বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বন্ধ করতে হবে। আমাদের এই ক্ষতিকর প্রকল্প সম্পর্কে দেশের জনগণকে সচেতন ও বিদেশে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন জনমত সৃষ্টি করতে হবে যে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ না-করে এবং আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ভারত এই প্রকল্প নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। WTO-র কানকুন সম্মেলনে দরিদ্র দেশগুলো ধনিক দেশগুলোর কৃষিবিষয়ক অনেক অশুভ উদ্যোগ বিশ্বজনমতের চাপেই রোধ করতে পেরেছে। আগামী দিনে আমাদের দেশের সংগঠিত মানুষ গণপ্রতিবাদ এবং বিশ্ব জনমতের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশবিরোধী ভারতের এই প্রস্তাবিত প্রকল্পকে ঠেকাতে পারব। বাঙালি জাতি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল। আজকের প্রেক্ষাপটে ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প বাতিল করে স্বদেশ বাঁচানোর লড়াইতেও জিতবে।

উৎস : বেনজীন খান সম্পাদিত গ্রন্থ, 'ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ: বাংলাদেশের বিপর্যয়'।

[লেখক; অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।]

পানি নিয়ে ভাবনা: ভারতের পরিকল্পনা

আসিফ নজরুল

ভারত সম্প্রতি বড় বড় কয়েকটি আন্তর্জাতিক নদ-নদী সংযোগ করে একটি রিভার নেটওয়ার্ক গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ২০১২ সালের মধ্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের। এই সুবিশাল পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি ভারতীয় রুপি। এরা আশু লক্ষ্য হল ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস নদীগুলোর উজানে আড়াআড়িভাবে খাল খনন করে গঙ্গা ও দামোদরের সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোতে স্থানান্তর করা। এই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য মহাবিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। এটি বাস্তবায়িত হলে শুকনো মৌসুমে গঙ্গার প্রায় সম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ পানি থেকে বাংলাদেশ চিরতরে বঞ্চিত হবে। বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, পরিবেশ, মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিপুল এলাকা মারাত্মক সামুদ্রিক লবণাক্ততার শিকার হবে।

ভারতের এই পরিকল্পনার পেছনে মূল কারণ হিসেবে দক্ষিণ ভারতে মরুময় এলাকাকে চাষাবাদ-উপযোগী করার কথা বলা হয়েছে। এ কাজটি ১৯৭০-এর শতকে শুরু হওয়া কম্যুনিটিভিত্তিক পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাপক সম্প্রসারণ করার মাধ্যমেও করা যেত। নিউজউইক (২৪ মার্চ ২০০৩) লিখেছে, রাজস্থানে ইয়াং ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রক্রিয়ায় বৃষ্টির পানি জমিয়ে ধরে রেখে ব্যবহারের পূর্বপুরুষদের টেকনোলজির পুনঃপ্রসার করার চেষ্টা সফল হয়েছে। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে ৪০টি গ্রামকে সবুজায়ন করা গেছে। সবর বাগচী *দেশ* পত্রিকায় (৪ মার্চ ২০০৩) লিখেছেন, 'খরামুক্ত করার বিকল্প জলব্যবস্থার প্রচুর অভিজ্ঞতা ভারতের হয়েছে। রাজনীতিবিদরা সেদিকে নজর দিচ্ছে না। কারণ তাতে গ্রামীণ মানুষের অধিকার বাড়ে। তা স্বনির্ভর এবং তাতে প্রচুর টাকার খেলা হয় না।'

এগুলো ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মতো আন্তর্জাতিক নদীর গতিপথ বদলে দেয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যু নয়। এই পরিকল্পনা দিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একযোগে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের এ ধরনের পরিকল্পনার কোনো নজির আছে বলে আমার জানা নেই। ১৯৯৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার কোর্স কনভেনশনে যেসব প্রথাগত আইন

প্রতিফলিত হয়েছে বহু বিধানেও এ ধরনের পরিবেশ-বিনাশী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যেসব মতৈক্য হয়েছে (যেমন ১৯৯২ সালের দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথ ঘোষণা, ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তির প্রস্তাবনা) তার সঙ্গেও ভারতের সাম্প্রতিক পরিকল্পনাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দুই.

গঙ্গা নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে। সরকার পরিবর্তনের পর এই চুক্তিরও বহু সমালোচনা শোনা যাচ্ছে আজকাল। তবে এই চুক্তির ভালো বিধানও আছে বাংলাদেশের জন্য। এই চুক্তির প্রস্তাবনার ৩নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, ভারত ও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি ভাগাভাগি এবং এসব নদীতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দু'দেশের জনগণেরই সুবিধা বিবেচনা করে দেখবে। চুক্তির ৯নং আর্টিকেলে বলা আছে দু'দেশের সরকার ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা ও কারো ক্ষতি করা নয়, এসব নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যৌথ নদীর পানি ভাগাভাগি করতে সম্মত আছে। নদীসংযোগ করে ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার পানি থেকে বাংলাদেশকে একতরফাভাবে বঞ্চিত করা হলে তা গঙ্গা চুক্তির উপরোক্ত বিধানগুলোর স্পষ্ট লঙ্ঘন হবে। ভারতকে এটিই বলতে হবে সবচেয়ে জোর দিয়ে। বলতে হবে ১৯৯২ সালের প্রাণবৈচিত্র্য চুক্তির ৩ ও ৫ নং আর্টিকেলের কথা। ৩ নং আর্টিকেলে অন্য দেশের প্রাণবৈচিত্র্যের ক্ষতি না-করার বিধান আছে, ৫ নং আর্টিকেলে আছে পারস্পরিক সহযোগিতার বাধ্যবাধকতা। ১৯৯২ সালের চুক্তির দায়দায়িত্ব অস্বীকার করা ভারতের জন্য সহজ হবে না।

বাংলাদেশের জন্য অনুকূল আরও বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে। ১৯৭১ সালের ওয়েটল্যান্ডস্ কনভেনশন অনুসারে যৌথ জলাভূমি ও এর প্রাণবৈচিত্র্য এবং ১৯৭২ সালের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন চুক্তি অনুসারে সুন্দরবনের ক্ষতি না-করার দায় রয়েছে ভারতের। প্রয়োজনে এসব আইনের কথাও ভারতকে বলতে হবে।

আমাদের বক্তব্যের জবাবে ভারত বলতে পারে নদীসংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের সময় ভারত এমন কথা বহু বছর ধরে বলেছে। ভারতের এসব বক্তব্যের উত্তর এখানকার আন্তর্জাতিক আইনে স্পষ্টভাবে রয়েছে। ওপরে বর্ণিত চুক্তিসহ আরো বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রথাগত আইন রয়েছে : কোনো দেশের প্রকল্পের কারণে অন্য দেশের ক্ষতি হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত এককভাবে প্রথমোক্ত দেশটি নিতে পারে না। প্রকল্প গ্রহণকারী দেশটিকে প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র অন্য দেশটিকে সরবরাহ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্য নদী আইন সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র অন্য দেশটিকে সরবরাহ করতে হবে, অন্য দেশটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই এ বিষয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই নদী আইন সংক্রান্ত ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনটির কথা

বলতে হবে। এই কনভেনশনটি এখনো কার্যকর হয়নি, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের এই আইনের যেসব ধারা আন্তর্জাতিক প্রথাগত (কাস্টমারি আইনের) প্রতিফলন সেসব ধারার কথা বলতে হবে। এই আইনের নো হার্ম (অন্য দেশের ক্ষতি নয়) সংক্রান্ত বিধান, প্রকল্প সম্পর্কে অন্য দেশকে যাবতীয় তথ্য প্রদান ও এ নিয়ে দেশটির সঙ্গে আলোচনার বিধানগুলো আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের অংশ। প্রমাণ হিসেবে এসব বিধানের ওপর ইন্টারন্যাশনাল 'ল' কমিশনের কমেন্টারিজ এবং আন্ত র্জাতিক চুক্তিগুলোর অজস্র নজিরের (যেমন, ১৯৯২ সালের ইউএন/ইসিই কনভেনশন, ১৯৯৫ সালের এসএডিসি প্রটোকল, ১৯৯৮ সালের গ্যাবসিকোভো মামলায় ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো) কথা বলা যায়। বলা যায় এমনকি ভারতের নিজস্ব আইন এবং ভারতীয় আদালতের বহু প্রাসঙ্গিক রায়ের কথা।

ভারত এ-ও বলেছে, নদীসংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ নেই। ভারতের এই বক্তব্যে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। কেন নেই তা বোঝার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। ভারতের এই নদীসংযোগ প্রকল্পটিতে মূলত লাভবান হবে হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের অনাবৃষ্টি অঞ্চলগুলো। এই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা জানিয়ে ইতোমধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতেরই চারটি অঙ্গরাজ্য : আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং বিহার। ভারতেরই চারটি রাজ্য যদি নদীসংযোগের মহাপরিকল্পনায় চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তাহলে আরও নিম্ন অববাহিকার দেশ বাংলাদেশের পক্ষে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়? তা ছাড়া ভারতের আজকাল, *দেশ*, *আনন্দবাজার*, নেপালের *এশিয়া*, বিলেতের *গার্ডিয়ান*, আমেরিকার *নিউজউইক* এবং ভারতের কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন ইতোমধ্যে এই প্রকল্পে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশ তাহলে উদ্বিগ্ন হবে না কেন?

তিন.

ভারত যে বলেছে প্রকল্প চূড়ান্ত হলেই কেবল বাংলাদেশকে জানানো হবে, এটি আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক ওয়াটার কোর্স কনভেনশনের ৯ এবং ১০ নং অনুচ্ছেদের প্রতিফলিত এ সম্পর্কে প্রথাগত আইনে নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প (তা যে পর্যায়েই থাকুক-না কেন) এবং নদীতে পানিপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশকে সরবরাহ করার দায়দায়িত্ব ভারতের রয়েছে। একই ধরনের দায়দায়িত্বের বিধান রয়েছে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের স্টাটিউটের।

ভারতের উপরোক্ত অবস্থান আমাদের ফারাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রতারিত হওয়ার স্মৃতিও মনে করিয়ে দেয়। ফারাক্কা ব্যারাজ নিয়ে সুদীর্ঘকালের আলোচনার সূচনাতে ভারত বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের)

আশঙ্কাকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছিল। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে দেয়া প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে ভারত এ-ও বলেছিল, ফারাক্কা প্রকল্প চূড়ান্ত হলে তা পাকিস্তানকে জানানো হবে। ভারত এই প্রকল্পটি পাকিস্তানকে জানায় ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে। অথচ এর মাত্র তিন মাস পরে ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত জানায়, প্রকল্পটির কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ১৯৬১ সালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ভারতের কংগ্রেসে বলেন যে, পাকিস্তান এই প্রকল্পের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে তবে 'উই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য প্রজেক্ট ইন স্পাইট অব অল প্রোটেস্ট'। ভারত এবারও নদীসংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিলে কোনো প্রতিবাদেই এই কাজ বন্ধ করা যাবে না। তারা এ ধরনের অবস্থান নেবে-না, তা ধরে নেয়ার কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই। নদীসংযোগ প্রকল্পের সুবিশাল অবকাঠামো একবার নির্মিত হয়ে গেলে বাংলাদেশে গ্রীষ্ম মৌসুমের অন্তত আশি শতাংশ পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়ার সুযোগ থাকবে ভারতের। বাংলাদেশ হয়ে পড়বে পুরোপুরিভাবে ভারতের করুণানির্ভর একটি দেশ।

ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পে ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি গঙ্গায় এনে তা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে নেয়া হবে। এতে সাময়িকভাবে গঙ্গায় পানি বাড়তেও পারে। তবে সেই পানি বাংলাদেশ পাবে, এমন ভাবার কারণ নেই। ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পের একটি কমপোনেন্ট হচ্ছে ফারাক্কা-সুন্দরবন (ভারতীয়) খাল। এই খাল নির্মিত হলে ফারাক্কায় পানিপ্রবাহ আরও কমে যেতে পারে। ১৯৯৬ সালে গঙ্গা চুক্তি অনুসারে পানি পাওয়া আমাদের জন্য আর দুষ্কর হয়ে পড়বে। গঙ্গা চুক্তির বিধান 'অলৌকিকভাবে' রক্ষা করা হলেও তা হবে আমাদের ব্রহ্মপুত্রের বহুগুণ বেশি পরিমাণ পানির বিনিময়ে।

নদীসংযোগ প্রকল্পের আশঙ্কা মাথায় রেখে আমাদের তাই অভিন্ন নদীগুলোর বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি চুক্তির জন্য ভারতকে চাপ দিতে হবে। ভারত বহুবার এমনকি ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তিতেও অভিন্ন নদীর পানি দুই দেশের জনগণের কল্যাণার্থে ভাগাভাগির অঙ্গীকার করেছে। ভারত এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না-করে, আমাদের সঙ্গে কোনো অর্থবহ আলোচনা না-করে, নদীসংযোগ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখলে, আমাদেরকে অবশ্যই পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও জলাভূমি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে যুক্তি ও পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। তবে তার আগে ১৯৯৬ সালের বিধান অনুসারেই চুক্তিটি রিভিউ বা পুনর্মূল্যায়নের জন্য ভারতকে বলতে হবে। পুনর্মূল্যায়ন বৈঠক করা সম্ভব হলে চুক্তিতে ফারাক্কার পানিপ্রবাহকে রক্ষা করার (অনুচ্ছেদ (২.২) ভারতীয় অঙ্গীকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জোর দাবি তুলতে হবে। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ঠিক করা গেলে ভারতের পক্ষে অন্তত গঙ্গা নদীর পানি থেকে বাংলাদেশকে তার হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা কষ্টকর হবে।

ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ফোরামে আমাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরতে হবে। ১৯৭৭ সালে গঙ্গা নদী সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত অনুকূল চুক্তি আমরা পেয়েছিলাম মূলত বিষয়টি জাতিসংঘে তোলার কারণেই। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে বিষয়টি ভারত কর্তৃক গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহারের অভিযোগ জাতিসংঘে তোলার পর ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী গঙ্গার পানি দ্রুত ভাগাভাগির আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে গঙ্গা চুক্তি এসব প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার বাইরের কিছু নয়। বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক হুমকিমূলক ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পটি সম্পর্কে অবশ্যই সরকারকে তার উদ্বেগের কথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বলতে হবে। সরকারের চেয়ে বেশি এই দায়িত্ব পালন করতে হবে সিভিল সোসাইটিকে।

উৎস: বেনাজিন খান সম্পাদিত গ্রন্থ,: 'ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ: বাংলাদেশের বিপর্যয়'।

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশ ও পানি-প্রবাহ

মো. আ ব দু ল আ উ য়া ল

আমরা জানি, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদ-নদী এদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এসব নদীবাহিত পানি সবসময় উজান থেকে এসে ভাটিতে বঙ্গোপসাগরে নেমে গেছে। প্রশ্ন হল, বর্ষা মৌসুমে নদীতে যে-পানি থাকে শুষ্ক মৌসুমে সে-পানি আমাদের নদীগুলোতে আমরা পাই না, কেন? এর ফলে চাষাবাদ, নৌ-চলাচলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমাদের চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু

এ-সঙ্কটের সমাধান কি আদৌ নেই? আমার মতে, এ-সঙ্কটের সমাধান তো অবশ্যই আছে বরং বর্ষা মৌসুমে নদ-নদী, খাল-বিল উপচে গিয়ে যে-বন্যার সৃষ্টি হয় সে-বন্যা থেকেও আমরা রেহাই পাওয়ার উপায় খুঁজে নিতে পারি। এখন প্রশ্ন হল, সেটা কীভাবে? এই যে দুটো বিষয়ে কথা বলা হল, এক. শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ স্বভাবিক রাখা; দুই. বর্ষা মৌসুমে বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া; উল্লিখিত সমস্যার সমাধান দুটোর দিকে অগ্রসর হতে হলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হল, জলাধার সৃষ্টি এবং নদী খননের কাজটি অতি গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। এখন কথা হল, এই জলাধার কোথায় আমরা করব। এই জলাধার বাংলাদেশের ভেতরে হতে পারে আবার বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ নেপালেও হতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে সুযোগ থাকলে নেপালে গিয়ে নিশ্চয়ই আমরা জলাধারা তৈরি করব না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সমাধান হল; ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এই চারটি দেশের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে একটি যৌথ প্রয়াস বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

পানি শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয় পানি-সমস্যা সব দেশেরই সমস্যা। বর্তমানে যে-প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে সেটা হল, 'আমারই পানি নেই, তোমাকে আবার পানি দেব কোথা থেকে' –এমন একটা অবস্থা। এ-ক্ষেত্রে পানির সর্বাত্মক ব্যবহার প্রত্যেকটি দেশে যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে কেবল এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব; সেক্ষেত্রে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল এই চারটি দেশের যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে উপযুক্ত জায়গাগুলোতে জলাধার সৃষ্টি করা এবং চুক্তি মোতাবেক চারটি দেশের মধ্যে এর উপযোগ ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমার মতে, এই চারটি দেশের যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎকেন্দ্রও গড়ে তুলে তার থেকেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই চারটি দেশ উপযোগিতা পেতে পারে। –এ হল আমাদের দেশের বাইরের থেকে সম্ভাব্য উদ্যোগসমূহ।

এ ছাড়া একাধিক উদ্যোগ আমরা নিজেরা গ্রহণ করেত পারি। যদিও আমাদের দেশ খুব ছোট, জলাধার সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় জমি আমাদের নেই; কাজেই বিকল্প পথে আমরা জলাধারের কাজটি হয়তো করতে পারি। আমাদের রয়েছে অনেক হাওড়-বাওড়; এইসব হাওড়-বাওড়ের অনেকগুলোতেই হয়তো এখন চাষাবাদ করা হয়। কিন্তু এগুলোকে ছোট ছোট জলাধারে রূপ দিয়ে ফসলের পরিবর্তে এখানে মাছ চাষ করা সম্ভব। অন্যদিকে পুকুর, খাল, নদ-নদী খননের মাধ্যমে পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি বলব এভাবে অসংখ্য ছোট-বড় জলাধার সৃষ্টির মধ্যদিয়ে পুরো দেশটাকেই একটি জলাধারে রূপ দেয়া সম্ভব।

জলাশয় ও নদ-নদীর পানি-প্রবাহ বা এসব ক্ষেত্রে পানির সংরক্ষণ স্বাভাবিক রাখার সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে যায় সেটা হল মাটির নিচের পানির স্তরকে রিচার্জ বা পুনরায় সমন্বিত করা। মাটির নিচ থেকে ক্রমাগতভাবে আমরা যে-পানি তুলে আনছি সেটা কিন্তু রিচার্জড বা পুনরায় সমন্বিত হওয়ার কোনো পদক্ষেপ আমরা

গ্রহণ করি না। কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের মতো মাটির নিচেও আমরা আর পানি পাব না। কিন্তু ক্রমাগত পানি তুলে আনার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশের এই ফাঁকা জায়গাও তো পূরণ হওয়া দরকার। তা না-হলে অনেক বড় বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমত, ভূ-গর্ভ থেকে পানি উত্তোলন করা আমাদের বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, খালি হয়ে যাওয়া তলদেশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পানি পাঠিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা যেতে পারে।

আমাদের জানামতে ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশ থেকে পানি উত্তোলনের ফলে যে জায়গা খালি হয়, সেই খালি জায়গা পূরণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পানি পাঠানোর বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। কাজেই আমাদের শুধু ভূ-পৃষ্ঠের জলাধারের কথা ভাবলেই চলবে না বরং একইসঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশ রিচার্জ বা পুনরায় সমন্বয়ের মাধ্যমে পানির স্বাভাবিক উপস্থিতি কিংবা গতি বা প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

জলাশয় ও নদ-নদীর পানি-প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা বা থাকার ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বর্ষা- ঋতুতে আমাদের দেশে যে-বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির পানি আমাদের চোখের সামনে দিয়েই খাল-বিল হয়ে নদীতে নেমে যায়, এবং নদীতে নেমে যাওয়া বৃষ্টির পানি শেষপর্যন্ত সাগরে নেমে যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই বৃষ্টির এই পানি সংরক্ষণ করে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বৃষ্টির এই পানিও সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে পানি-প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার যে-উদ্দেশ্য, তার কিছুটা হলেও পূরণ করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে, ভারতের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা যে-৫৪টি নদী বাংলাদেশে এসেছে, এই ৫৪টি নদীতেই ভারত বাঁধ দেয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপক বাঁধ-যজ্ঞের তারা নাম দিয়েছে 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প'। এই প্রকল্পের অধীনে ভারত তার একতরফা পরিকল্পনা অনুসারে ৫৪টি নদীরই পানি প্রত্যাহার করে নেবে। এখন প্রশ্ন হল, ভারতের এই কর্মকাণ্ড কি শুধু বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের ক্ষতি সাধন করবে নাকি এর ফলে ভারতকেও চরম মূল্য দিতে হবে।

সাধারণভাবেই আমরা জানি যে, নদীর নিজস্ব একটি গতি থাকে, সেই গতিকে ব্যাহত করতে চাইলে প্রকৃতি কিন্তু তার বিরূপ জবাব ঠিক ঠিক দিয়ে দেয়। নদীর গতিপথের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন করে জবরদস্তিমূলকভাবে যদি ভিন্ন কোনো পথে পানি প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে নদী কিন্তু সেটা মেনে নিতে নারাজ; সেক্ষেত্রে নদীর নিজস্ব গতি-পথ নদী নিজেই ঠিক করে নেয়। কালে কালে দেখা গেছে মানুষের নির্ধারিত পথে নদী চলেনি; কত ঘর-বাড়ি, বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট ভেঙেচুরে নদী কোন পথ ধরে এগুবে তা আগেভাগে কেউ বলতে পারেনি, একইভাবে মানুষ যদি প্রকৃতির নিয়ম অগ্রাহ্য করে নদীকে বলেও, 'এই হল তোমার চলার পথ এ পথেই তোমাকে চলতে হবে' তাহলেও নদী মানুষের সেই কথা বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই বাতিল করে দিয়ে নিজের চলার পথ নদী নিজে ঠিক করে নিয়েছে। কাজেই ভারত ৫৪টি নদীতে বাঁধ

সৃষ্টির পরিকল্পনা করে যে-কাজ করেছে এর প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়াবহ এই আশংকা শুধু বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের ক্ষেত্রে নয় বরং ভারতের মধ্য থেকেও বহু নদী-বিশেষজ্ঞ ভারতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা ভেবে এই প্রকল্পের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে অবস্থান নিয়েছেন।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছে; ভারত তারই ধারাবাহিকতায় 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প'র আওতায় ৫৪টি নদীতে বাঁধ সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, ভারত যেহেতু প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে এ-ব্যাপারে কোনো আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ ছাড়াই একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছে সুতরাং বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহল কীভাবে দেখছে সেটি-ই প্রধান বিবেচ্য। কারণ ভারত তো ভালো করেই জানে বাংলাদেশে কীভাবে মরুকরণ চলছে প্রতিবেশী দেশে করুণদশা সৃষ্টি করে একতরফাভাবে শুধু নিজেদের ভালো থাকা আর উন্নয়নের কথা ভাবা এটা তো কোনো দেশের কাম্য হতে পারে না। সুতরাং সমুদ্রের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ যেমন আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছে, একইভাবে এতগুলো নদীতে বাঁধ দেয়ার কারণে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে যে-চরম পানি-সংকটে পড়বে, বিষয়টি নিয়ে আন্ত র্জাতিক মহলের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং আইনি প্রক্রিয়ায় এর সুরাহা করতে হবে। তা না-হলে বাংলাদেশে যে মরুকরণ চলছে, এর ভয়াবহতার ফলে এখানকার মানুষের মধ্যে যে খাদ্যাভাব ও সার্বিকভাবে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের কারণে এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে-ক্ষোভ সৃষ্টি হবে, সেই ক্ষোভের প্রভাব প্রতিবেশী দেশ হিসেবে অনিবার্যভাবে ভারতের ওপর গিয়েও পড়বে। কাজেই ভারত বড় ও শক্তিশালী দেশ বলে আমরা হয়তো ভারতের ওপর সেভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারছি না, তবে যারা ভারত নামক রাষ্ট্রের কর্ণধার তাদের বিবেককে আমরা যদি প্রভাবিত করে জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই এই ভয়াবহ সংকটের একটি আশু সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে।

নিউটনের উদ্ধৃতি, 'সকল ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া থাকে'। নিউটনের এই উদ্ধৃতির সত্যতা আমরা যদি স্বীকার করে নেই, তাহলে ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভারত কি সেই মাত্রায় আদৌ উপকৃত হয়েছে? হয়নি। ভারতও গঙ্গায় পানি পাচ্ছে না। আমরাও পদ্মায় পানি পাচ্ছি না। পদ্মা যেমন চর পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে ভারতের গঙ্গাও একইভাবে চর পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির ওপর অতিমাত্রায় অত্যাচার চালালে প্রকৃতি যে সহ্য করে না সে কথা ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হলেও ভারত সেই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। যদি প্রশ্ন করি, গঙ্গা বা পদ্মার পানি আসলে গেল কোথায়? ভারত ও বাংলাদেশের অনেক বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞই মনে করেন ফারাক্কা-বাঁধের বিরূপ প্রভাবের ফলেই গঙ্গা ও পদ্মার আজকের এই মরণ-দশা হয়েছে, যে মরণ-দশার শিকার আজ দুটি দেশেরই মানুষ। অবশ্য ভারতের উত্তরপ্রদেশে অতিমাত্রায় পানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে সেখানে অতি বেশি পানি প্রত্যাহার

করে নেয়া হচ্ছে– এক্ষেত্রে সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সেটি ভারতের আন্ত:সমঝোতার সমস্যা হলেও, সব মিলিয়ে এর বিরূপ প্রভাব ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে-কথা এই সময়ে দাঁড়িয়ে, অতি সহজেই আমরা অনুমান করতে পারছি। সুতরাং এরকম ভয়ঙ্কর একটি পরিস্থিতিতে আমার ধারণা, ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটান-এর যৌথ উদ্যোগই দেশগুলোর যৌথ সমাধানের একটি পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

[লেখক: পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র)। প্রবন্ধ/ নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রস লি.। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব।]

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের পানি-প্রবাহ ভাবনা

শা হ আ ল ম সা রো য়া র

পানির প্রয়োজন অপরিহার্য– এ-কথা কোনো বিতর্কের বিষয় নয়; বিষয়টি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলো প্রাকৃতিক কারণেই এই পানি সমানভাবে পায়নি। অথচ কোনো মানুষ-ই পানি ছাড়া চলতে পারে না। সে-কারণে যে-সব স্থানে পানি রয়েছে আর যে-সব স্থানে পানি নেই– এই দুই ধরনের স্থানের মানুষদের মধ্যে বিশেষ করে সুপেয় পানি নিয়ে সংঘর্ষ বা যুদ্ধের পরিবেশ বিরাজ করছে বহুকাল ধরে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধটা বাস্তবিক অর্থেই বেধেছে– যেমন লিবিয়াতে একটা বড় সুপেয় জলাধার নির্মাণকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটেছিল। এরকম অতীতে যেমনটি ঘটেছে, আগামীতে তারচেয়েও ভয়াবহ রূপে পানি নিয়ে বড় বড় যুদ্ধের আশংকা দেখা দেবে।

আমার মতে পানি-কে শুধু পানি হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল হবে; পানি আমাদের অর্থনীতি, পানি আমাদের প্রকৃতি এবং পানিই আমাদের অস্তিত্ব। কাজেই পানি-প্রবাহ সচল রাখতে না-পারলে আমাদের অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে পড়বে, আমাদের প্রকৃতি বিপর্যস্ত হবে এবং সর্বোপরি আমাদের অস্তিত্ব বিলীয়মান হতে বসবে।

বাংলাদেশে পানি-প্রবাহের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল, আমাদের প্রচুর পরিমাণে সুপেয় পানি আছে, কিন্তু যেটি নেই সেটি হল ব্যবস্থাপনা। সে-কারণে এই পানি-ব্যবস্থাপনা আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে-প্লাবন হয় সেটি যদি ভারসাম্যমূলক হয় তাহলে কিন্তু প্লাবন আমাদের জন্য আশীর্বাদ। পৃথিবীর যে-সকল দেশে চাষের জমি পানিতে প্লাবিত হয় না, সে-সকল দেশে জমি অতি দ্রুত উর্বরতা হারায়; শুধু তাই নয় সেখানকার মাটির তলদেশের পানির স্তরও পুনরায় পূরণ হয় না। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রতি বছর চাষের জমি পানিতে প্লাবিত হয় বিধায় এখানকার জমির উর্বরতা অনেকটাই রক্ষিত থাকে; কেননা একদিকে জমির আর্দ্রতা বাড়ে অন্যদিকে পানির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পলি এসে জমির উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে এই স্বাভাবিক প্লাবন যখন অস্বাভাবিক রূপ নিয়ে অতিপ্লাবন বা বন্যার সৃষ্টি করে, তখনই এই পানি আমাদের অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়।

আমাদের সার্বিক পানি-ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নের উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. নদীর তলদেশে চর পড়ে যে ভরাট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা রক্ষা করা;

২. শহর-অঞ্চলে দেখা যায়, অনেক জায়গা জুড়ে কংক্রিটের আবরণ দিয়ে রাখা হয়, সেই আবরণ উঠিয়ে কাঁচা মাটির জায়গা বাড়াতে হবে, যাতে বৃষ্টির পানি মাটির তলদেশে গিয়ে পুনরায় তলদেশ পূরণ করতে পারে;

৩. মাটির তলদেশ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে বড়-বড় শহরগুলোতে এভাবে তলদেশের পানি উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে;

৪. আমাদের যে-সামান্য নদী-নালা আছে, সেগুলোর পানিও কলকারখানার বর্জ্যে নষ্ট হয়ে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এই দূষণ যে-কোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে;

৫. বর্ষাকালে আমরা প্রচুর পানি পাই, কিন্তু শীত-গ্রীষ্মকালে পানি পাই না, এতে সেচের কাজ ব্যাহত হয়; সুতরাং বর্ষাকালের পানি সংরক্ষণ করা দরকার যাতে করে শীত-গ্রীষ্মকালে এই পানি দিয়ে সেচের কাজ চালানো যায়।

৬. বাংলাদেশে একসময় অসংখ্য ছোট-ছোট নদী ও খাল-বিল ছিল, যেগুলো এখন ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই ছোট নদী ও খাল-বিল– অর্থাৎ এই ধরনের চ্যানেলগুলোকে পুনর্জীবিত করে পানি-প্রবাহের স্বাভাবিকতার জন্য দেশব্যাপী জাল তৈরি করতে হবে;

বর্ষাকালের বাড়তি পানি শুস্ক-মৌসুমে ব্যবহারের জন্য ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বড় ধরনের জলাধার সৃষ্টি করা আজ খুবই প্রয়োজন। এজন্য দরকার আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে কিন্তু পানির অভাব নেই; অভাব রয়েছে পানি-ব্যবস্থাপনার। এই ব্যবস্থাপনা করবার জন্যই দরকার রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ। যে-সকল সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানযোগ্য সে-সকল সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক উপায়ে-ই করতে হবে, সে-জন্য একদিকে প্রয়োজন আন্তঃদেশীয় রাজনৈতিক মতৈক্য অন্যদিকে ভারত, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন। অন্যথায় বাংলাদেশ যে-নানারকম সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তা ভবিষ্যতে আরও প্রকট হবে; একইভাবে বলা যায়, প্রতিবেশী উজানের দেশসমূহও সেই সংকট থেকে মোটেও রেহাই পাবে না।

এক্ষেত্রে অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য যে, বিশেষ করে ভারতের তুলনায় আমরা অতি ছোট দেশ বিধায় সামরিক শক্তির পরিবর্তে বুদ্ধি দিয়েই ভারতের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে যাবতীয় বড় বড় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সে-জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে এ-বিষয়ে গবেষণা বাড়াতে হবে এবং দেশের স্বার্থের পক্ষে দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি কাজ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ ভাটির দেশ বলে এখানে পানি নিঃস্বরনের জন্য অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, নালা ইত্যাদি অনেক আগে থেকেই এ-অঞ্চলে ছিল। সেই কারণে একটা সময় পর্যন্ত এখানে পানির প্রবাহও সবসময় স্বাভাবিক বা গতিশীল ছিল। সেই প্রবাহ নষ্ট হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ভারতের পানি-প্রত্যাহার একটি দিক; এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে যে-গুলোর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলব, যে-পানি আমরা বর্ষাকালে পাই সেই পানিকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্য নিয়ে এসে এর প্রবাহকে সচল রাখা সম্ভব। আর এ-কাজের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। এক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রের নির্বাহীদের ওপর যেমন ভরসা করব, একইভাবে দেশের সচেতন মহলের উচিত যার-যার জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব এই প্রবাহ সচল রাখার ক্ষেত্রে এবং পানিদূষণের হাত থেকে এই প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়ে পানি

ফে র দৌ সী সু ল তা না

যখন স্কুলে পড়তাম তখন বাংলা দ্বিতীয় পত্রে ২৫ নম্বর ছিল রচনা। এই পঁচিশ নম্বর ছিল আনসিন। অর্থাৎ কী আসবে তা সিলেবাসে থাকে না। এটি জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর এবং সৃজনশীলতা বাড়ানোর একটি কৌশল ছিল। সেজন্য আমরা রচনা বই'এ যত রচনা এবং প্রবন্ধ থাকত তা ধুমসে পড়তাম। এর মধ্যে কিছু রচনা ছিল কমন। যেগুলো পড়া অবশ্যই কর্তব্যজ্ঞান করতাম। যেমন: দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাংলাদেশের ষড়ঋতু, বর্ষাকাল, প্রিয় ব্যক্তিত্ব, স্মরণীয় ঘটনা, বন্যা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বর্ষাকাল বা বন্যা পড়তে গেলেই অবধারিত ভাবে আলোচনায় আসত নদীমাতৃক এই দেশের নদ-নদী, খাল-বিলের বিবরণ এবং এর বর্তমান অবস্থান। সেই শিশুকাল থেকে জানি পলি মাটি জমে জমে আমাদের নদ-নদী, খাল-বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে উদ্ধার করার জন্য নদী খনন অর্থাৎ ড্রেজিং-এর দরকার। এখনো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ছে নদী-নালা- খাল-বিল বন্যার কারণে পলিমাটি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে তাই এগুলো ড্রেজিং করতে হবে।

অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে ছিলাম, এখনো সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। 'করতে হবে' কখনোই 'করা হচ্ছে' পর্যায়ে যায়নি। কিন্তু প্রকৃতি তো থেমে থাকেনি, থেমে থাকে না। প্রকৃতি নিরলসভাবে তার কাজ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ পলিমাটি জমতে জমতে নদ-নদী, খাল-বিল আমাদের সমতলভূমির প্রায় সমান্তরাল হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। ফলে নদীগুলোর ধারণক্ষমতা নেই বললেই চলে।

ফলে একটুখানি বৃষ্টি হলেই পানি সমতলভূমিতে জমে যাচ্ছে। ফসল নষ্ট হচ্ছে, রাস্তাঘাট ডুবে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতার ফলে বিভিন্ন জায়গায় জনবসতিতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে।

এসবই তো পুরনো কথা। সবাই জানে। সচেতন মানুষ জানে, রাজনৈতিক দলগুলো জানে, সরকার জানে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তারা এন্তার আলাচনা করেছেন। সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের নির্দেশিত পথে চলবে কে? নদী-নালা-খাল-বিল নিজেরাই ড্রেজিং-এর জন্য মেশিন ভাড়া করবে? নাকি উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে?

পানি ধারণক্ষমতা নিয়ে তো কেবল সমস্যা নয়। এই মিঠাপানির দেশে এখন পানি খেতে হয় কিনে। সে পানির মান খাবার উপযোগী কিনা সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। মূল কথা হল, নদীমাতৃক এই দেশে নদীও আছে মা-ও আছে তবে দু'টোই অসুস্থ। নদী সুস্থ থাকলেই মা অর্থাৎ ভূমিকে সুস্থ রাখা সম্ভব।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। আক্ষরিক অর্থেও যদি দেখি সত্যিই এদেশ সোনার বাংলা। এর শস্যভাণ্ডার অফুরন্ত।

১৫ কোটি মানুষের এই এত্তটুকুন ভূমি (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার) তারপরেও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ! আমাদের ভূমি উর্বর, ফলন ভালো।

আমাদের মাটির নিচে রয়েছে কয়লা, গ্যাস। আমরা কত ভাগ্যবান। শুধু পরিকল্পনার অভাবে আমরা গরিব থেকে গেলাম। আমরা সৃষ্টি নয়, ধ্বংস করতেই মনে হয় ভালোবাসি। তাই বনভূমি উজাড় করে গাছ কেটে ফেলি। নদীর পানিতে কারখানার বর্জ্য ঢেলে দেই। এতে সুপেয় পানি যে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে তার খেয়ালও করি না। এই বিষাক্ত পানিতে জলজ প্রাণী, মাছ সবকিছুই ধ্বংস হতে চলেছে। কিন্তু আমরা চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে তা মেনে নিচ্ছি। আমরা বরং পরিবেশবাদীদের সহযোগী শক্তি না-হয়ে তাদের পরিহাস করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

'বুড়িগঙ্গা বাচাঁও' আন্দোলনও তো প্রায় বুড়ো হতে চলেছে। এটি এখন একটি স্লোগান বই আর কিছুই নয়। বুড়িগঙ্গার দু'পাড়ের জমি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুম্ভকর্ণ সরকারের ঘুম ভাঙছে আর রে রে রে রে করে তাড়া করে উদ্ধার করছে জমি আর দু'তিন মাস পরই ফের দখল। সরকার আর অবৈধ দখলদারদের মধ্যে এই যে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা এটা তো সেই আদ্যিকালের কথা।

এই যে আত্মঘাতী গোল করার প্রবণতা আমাদের পেয়ে বসেছে এর থেকে আমাদের উদ্ধার করবে কে? যদি জেগে ঘুমাই , আমাকে জাগায় কার সাধ্যি?

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক দেশে বাস করত দুই কুঁড়ে। তারা এতটাই কুঁড়ে যে কুটো'টি নেড়ে কুটিটি করে না। কেউ খেতে দিলে খায় নইলে উপোস করে। সারাদিন ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। একদিন হল কী, দুষ্টু ছেলেরা মিলে ওদের ঘরে লাগিয়ে দিল আগুন। এইবার তো জাগবে। আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। কুঁড়েরাতো চোখ খুলে না। এক কুঁড়ে অন্যজনকে বলে, ভায়া হে, কত রবি জ্বলে! অন্যজন বলে, 'কে-বা আঁখি মেলে!'

আমাদেরও একই অবস্থা! সবাই দেখছি, জানছি, বুঝছি কত বড় ক্ষতি হচ্ছে দেশের; পরিবেশের এবং সর্বোপরি আমাদের। তারপরেও আমরা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, প্রতিবাদও করছি না। আমরা সবাই 'কে-বা আঁখি মেলে!'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। দেশকে বাঁচানোর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ এবং মনোবল আমাদের কারো মধ্যেই কি নেই?

নাকি আমরা ভয় করছি সে সব স্বার্থান্বেষীদের; যাদের কালো হাতের থাবা দুমড়ে দিতে গেলে আমরাও হয়ে যেতে পারি 'নো ম্যানস ল্যান্ডের বাসিন্দা!'

এই ভাবনা অমূলক নয়। কিন্তু ভূমিদস্যুদের রুখে না-দিলে যে নদী তার গতি হারাবে, হারাবে তার রূপ। আর পরিবেশবাদীদের সহযোগিতা না-করলে এবং গণসচেতনতা তৈরি না-করলে কলকারখানা থেকে বের হওয়া দূষিত বর্জ্যে নদীর পানি পুরোটাই বিষাক্ত হয়ে যাবে। না-বাঁচবে মাছ, না-কোনো জলজপ্রাণী বা উদ্ভিদ। মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদটি তখন ইতিহাস হয়ে যাবে।

তাছাড়া নদীর এই বিষাক্ত পানি যদি সেচকাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে ফসলের মাঠ হয়ে যাবে বিরান। কোথায় পৌঁছাচ্ছি আমরা?

এদিকে শীতের সময়ে উপনদী, শাখানদীগুলোতে পানি থাকে না বলে চাষিরা মৌসুমী সবজি চাষ করে। মূল নদীগুলোতেই এসময় পানির প্রবাহ হাঁটুর নিচে থাকে।

আগে তো শীত মৌসুমে দেখতাম কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি চালু হত। তখন স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বাররা গ্রামেগঞ্জে নিজেদের এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করা, পুরনোগুলো মেরামতকরা, খাল কাটা বা পুরনো খাল সংস্কার করা এগুলো করতেন। এখনতো কাবিখা কর্মসূচির বদলে খাবিখা কর্মসূচি চালু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ নিজে এবং তার অনুসারীগণ মিলে প্রকল্পের টাকা ভাগবাটোয়ারা করে হাতিয়ে নেয়। তাই এর নাম খাবিখা (আমি খাই, তুই খাবি তো খা!)।

মাফ করবেন, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আর আছে বলেই আমরা এখনো বেঁচে আছি। আমাদেরতো আশায় বসতি। খাবিখা'কে আগের মতোই যারা ব্যবহার করেন তারা নমস্য। কিন্তু তাদের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।

সবচাইতে ভয়ের কথা এবং ভাবনার কথা নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান কেউ স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতিতে আসতে চাইছে না। মেধার সংকটে এমনিতেই আমরা নাস্তানাবুদ, আর এ রকম যদি স্বাভাবিক স্রোত বন্ধ হয়ে যায় তবে যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব তৈরি হবে তাতে আমরা ক্রমাগত ডুবতেই থাকব।

এখনি সময়। গোড়ার যে গলদ আছে তাকেই আগে শোধরাতে হবে। চাই পরিশুদ্ধ রাজনীতি। চাই মেধাবী এবং সৎ রাজনীতিবিদ। চাই তরুণ প্রতিভা। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যারা খাবিখা নয়, কাবিখা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ভূমিদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করবে নদনদীকে। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য অপসারণে নদী নয়; ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারে বাধ্য করবে শিল্পপতিদের। জাতীয় বাজেটে নদী ড্রেজিং-এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বরাদ্দ রাখার ভূমিকাও তাদের পালন করতে হবে। জানা যায় বাংলাদেশের প্রায় ৫২টি প্রধান নদীর উৎসমুখ ভারতে। সুতরাং ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কে আরো কৌশলী হতে হবে। নতজানু পররাষ্ট্রনীতি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে দেবে না। নদী বিশেষজ্ঞদের

পরামর্শক্রমেই ঠিক করতে হবে আমাদের লক্ষ্য। পানিবণ্টন প্রক্রিয়া, তিস্তামুখ বাঁধের মতো স্পর্শকাতর এবং আবশ্যকীয় বিষয়গুলোতে জনমতের প্রতিফলন এবং আমাদের চাহিদা বাস্তবায়নে আরো বেশি পারদর্শী হতে হবে। এজন্য যে সুষম সমন্বয় দরকার তাতে সরকারকে আরো বেশি নজর দিতে হ বে।

বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়। শুকনো মৌসুমে পরিত্যক্ত সব জলাধার, শুকনো জলাশয়, বুঁজে যাওয়া নদী, ধারণক্ষমতা কমে যাওয়া খাল-বিলকে যদি আবারো খনন করা যায় এবং সেইসাথে আমরা যদি রিজার্ভার তৈরি করে বৃষ্টির পানিগুলো রেখে দিতে পারি তাহলে হয়তো দুর্দশার কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারব। এজন্য দরকার জনসচেতনতা। দরকার সরকারের উদ্যোগ।

পদ্মা ব্রিজ করার মতো টাকা দেশের মানুষই যোগান দিতে পারবে বলে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী সাহসী বক্তব্য রাখেন তার সদিচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে যারা এগিয়ে আসার আশ্বাস দেন, সে দেশে তো নদী ড্রেজিং-এর কাজ পর্যায়ক্রমে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার ও সরকারপ্রধানের উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টাটাই শুধু দরকার।

আমরা চাই বাংলাদেশের জলাশয়, খাল, বিল, নদ, নদীর পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক গতি ফিরে পাক। মিঠাপানির দেশের মানুষকে যেন পানি সংকটে না-পড়তে হয়।

আমি খুব সাধারণ মানুষ। আমার চাহিদা সামান্য। আমি মাছে-ভাতে বাঙালি হয়েই বেঁচে থাকতে চাই। আমি চাই নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা নদীতে সাঁতার কেটে বড় হোক। সুইমিংপুলে যেয়ে যেন তাদের সাঁতার শিখতে না-হয়।

আমি চাই নদীগুলোর নাব্যতা। চাই নদীর স্বাভাবিক গতিরোধ করে বা নদীর পাড় বেদখল করে সারা বাংলাদেশে যে অবৈধ বসতি গড়ে ওঠেছে তা ভেঙে দেয়া হোক। যত বড় প্রভাবশালীই হোক-না কেন তার অসৎ উদ্দেশ্য রুখে দেয়া হোক। বুড়িগঙ্গার নদীর জল আবর্জনার আধার না-হয়ে হোক জলজপ্রাণীর শান্তির নিবাস।

নদী বাঁচলে প্রকৃতি বাঁচবে। প্রকৃতি বাঁচলে তৈরি হবে শক্তিশালী নতুন প্রজন্ম; প্রকৃতির মতো উদার, গতিময়, সার্বজনীন।

পৃথিবী ও বাংলাদেশ

এই নদীমাতৃক বাংলাদেশে জন্মেও আমরা সুপেয় পানির অভাবে রয়েছি। আমরা পিপাসার্ত। মানুষের শরীরের ৬০ শতাংশই হল পানি। ব্রেনের ৭০ শতাংশ এবং রক্তে রয়েছে ৮০ শতাংশ পানি। আমরা কোনো সলিড খাদ্য গ্রহণ না-করেও এক মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারব কিন্তু পানি পান না-করে এক সপ্তাহ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমরা জানি পৃথিবীর তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থলভূমি। এই বিপুল জলরাশি পাহাড়-পর্বতে বরফ হয়ে, মহাশূন্যে জলীয় বাষ্প হয়ে, নদী ও সমুদ্রে তরল পানি হিসেবে বিরাজমান। তবে এই বিপুল জলরাশির মাত্র ৩% হল পান-উপযোগী অর্থাৎ ফ্রেশ ওয়াটার যার বেশির ভাগই বরফ।

মানুষের ব্যবহার-উপযোগী পানি রয়েছে এক শতাংশেরও কম। অন্যভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীতে ০.০০৭% শতাংশেরও কম পানীয়জল রয়েছে।

এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা বিশ্বেই পানীয়জলের সংকট ভয়াবহ। আর ব্যবহার-উপযোগী যে পানি রয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

এই পৃথিবী শুধু পানীয়জল নয় ভয়াবহ পানিসংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পানিসংগ্রহের উৎসগুলো নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতেই মানুষের সংখ্যা তিনগুণ বাড়বে। এবং স্বভাবতই পানি ব্যবহারকারী সংখ্যা বাড়বে, শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আরো অতিরিক্ত তিন বিলিয়ন মানুষ যোগ হবে। সেই সব দেশে পরিস্থিতি আরো গুরুতর হবে যেখানে ইতোমধ্যেই পানি সংকট বিদ্যমান। ব্যবহার-উপযোগী পানির একটি পরিসংখ্যান আলোচনা করা যাক।

এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩ গ্যালনেরও কম পানি ব্যবহার করতে পারছে। প্রতি ৫ জনের ১ জন মাত্র বিশুদ্ধ পানীয়জল পান করতে পারছে। জাতিসংঘের হিসাব মতে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন করে শিশু পানিবাহিত রোগে মারা যাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী এখন ভয়াবহ পানিসংকট। বলা যেতে পারে তেলের পেছনে দৌড়ানোর আগে এখন পানির পেছনে দৌড়ানো আবশ্যক।

মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে বিভিন্ন দেশে পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। ফলে শস্য এবং ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে; যার ফলে খাদ্যঘাটতি এবং সেইসাথে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। চীনে ইতোমধ্যে ফসল উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান এবং মিসরের অবস্থাও তথৈবচ। দুর্ভিক্ষ এবং পানিসংকট দুটোই এখন প্রকট। এতে এই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা একটি সর্বগ্রাসী ক্ষুধার রাজ্যে বাস করছি।

এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে পরিকল্পিত উপায়ে পানি সংরক্ষণ জরুরি। এজন্য প্রকৃতি এই পানিকে সুরক্ষার জন্য নদ-নদী, জলাশয়, খাল-বিলের সংস্কার, জলাধার নির্মাণ এবং পানি ব্যবহারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা একান্ত আবশ্যক। পানিই জীবন। কাজেই জীবকে বাঁচতে হবে জীবনকে আধার করেই।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, কিশোর সাহিত্যিক। আইনজ্ঞ। ব্যাংকার।]

উজান-ভাটির দেশ

ম নি র জা মা ন

বিংশ শতাব্দী জুড়ে কলিকাতা-দিল্লী-লাহোর কেন্দ্রীক যে ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল; ঢাকার মত নব্য নগরীতে যা এখনো বিকাশশীল, সেই সমাজ বৃটিশ রীতি-পদ্ধতি গ্রহনের ভিতর দিয়ে বৃহৎ ভারতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে এমনভাবে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্ধ-কলহের দিকে ঠেলে দিয়েছে যেগুলো আজ সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় রূপে আবির্ভূত হয়ে চলমান জনমানুষকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। এসব বিপর্যয় ঘটছে আধুনিক সংস্কৃতি ও তার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রয়োগ করার ফলে। উপনিবেশিক সময়ের প্রত্যক্ষ শাসন-শোষনের বিষয়ে বলতে চাচ্ছি না এ কারনে যে, তা থেকে মুক্ত হয়ে অর্ধ্ব শতাব্দীকাল নিজস্ব পতাকা উড়াচ্ছি। অবশ্য 'নিজস্ব পতাকা' কথাটির সঙ্গে আমি দ্বিমত করি। এমন কী সার্বভৌমত্বের এখনকার রূপরেখা বিষয়েও মতামত রাখা জরুরী এ কারনে যে, বৃটিশ প্রবর্তিত ভারতীয় রাষ্ট্র এবং রাজ্য কাঠামোগুলি প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর জন্য হয় আংশিক, নয়তো খন্ডিত, অথবা ত্রুটিপূর্ণ, কিংবা দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতিকর। সাম্প্রতিক শতাব্দীতে এই ক্ষতি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে প্রকটভাবে। এবং তা চুড়ান্ত অর্থে সামাজিক সংকট সৃষ্টির পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চল বা পাকিস্তান কিংবা মধ্য ভারতের রাজ্যগুলোর দিকে আলোকপাত না করে উপনিবেশিক সময়কার রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি চালু থাকায় পূর্ব ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও জনজীবনে যে নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে আলাপ করতে চাই; কারণ, হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর– এই ভূভাগের নদীকুলবর্তী অঞ্চলে আমাদের বসবাস। আমাদের এই জনজীবন দুই থেকে পাঁচ হাজার বছরের সচল সভ্যতার উপর দাঁড়ানো। সর্বশেষ প্রায় দেড়শ বছর ধরে যে ধরনের রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ভারতীয় জনজীবনের উপর স্থাপিত হয়ে আছে তা এ অঞ্চলের মানুষের বিকাশশীলতার সঙ্গে নেতিবাচক দ্বন্দ্ব তৈরী করছে। মার্কসের ভাষায়ও যদি বলি, দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সমাজ এগোয়; তাহলেও বলতে হচ্ছে, স্থানীয় জনজীবনের বাস্তবতার সঙ্গে আধুনিক অবকাঠামোগুলো এখন আর খাপ খাচ্ছে না বরং পরিবর্তন করার প্রয়োজন প্রকট হয়ে উঠেছে। মোটা দাগে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সেগুলো হচ্ছে (১) বৃটিশ দ্বিজাতি তত্ত্ব (২) বৃটিশ রেলওয়ে ব্যবস্থা (৩)

ভারতের নব্য মানচিত্র (৪) সার্বভৌমত্বের বর্তমান ধারনা। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেওয়ায় উপনিবেশ-উত্তর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পুরো উপমহাদেশে আজ হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব স্থায়ী সংঘাতের রূপ নিয়েছে। পরধর্মবিদ্বেষ এক ধরনের জঙ্গি রূপ লাভ করেছে যা আগে স্থানীয় জনগনের চেতনায় এমন তীব্র ছিল না। আজ এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বার্থদ্বন্দ্ব রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে নানান রাজনৈতিক বিপর্যয় তৈরী করছে। উপমহাদেশে জুড়ে রাজনৈতিক গণহত্যা ও অভিভাসন দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে এই ধর্মবিদ্বেষের কারনে; যা দ্বিজাতীতত্ত্বের প্রত্যক্ষ কুফল। এবং যার কোনো আসু সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না উপমহাদেশের রাজনৈতিক মহল। (২) ভারতবর্ষের সমস্ত জলপ্রবাহ উত্তর-দক্ষিন মুখি। এ অঞ্চলের সমস্ত নদ-নদীর উৎস হচ্ছে হিমালয় পর্বতমালা। এবং তা প্রবাহিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের অভিমুখে। কিন্তু বানিজ্য বিকাশের জন্য বৃটিশ কোম্পানী যে রেল সড়ক নির্মাণ করে তা পূর্ব-পশ্চিম মুখি। ভারতে বৃটিশ রেলওয়ে মূলত লাহোর-করাচি-বোম্বাই-দিল্লী হয়ে কলিকাতা-গৌহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ রেল সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, নদী-নালার গতি প্রবাহ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে এ অঞ্চলে প্রথম জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। রেলওয়ে যে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তাতেই দক্ষিন মুখি জল প্রবাহ বাঁধা পেয়ে নদ-নদীর নাব্যতার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এবং এই সংস্কৃতি বৃটিশ পরবর্তী উপমহাদেশে সড়কপথ নির্মাণেও বিবেচনাহীন ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যা সমস্ত স্থানীয় জলাবদ্ধতার প্রধান করন। বাংলাদেশের রেল সড়কগুলো লক্ষ্য করলে বলা চলে, বন্যা মওসুমে উজানের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার পর রেল সড়কের কারনে স্থানীয় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা আগে সহসাই খালবিল দিয়ে নদ-নদীতে চলে যেতো। জলাবদ্ধতা জনিত বন্যা এ অঞ্চলে বহু যুগ ধরে হচ্ছে; কিন্তু এই জলাবদ্ধতা জনিত বন্যাকে আধুনিক শিক্ষিতরা বহুযুগ ধরে অনালোচিত রেখেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রধানরূপে প্রচার করতে গিয়ে। (৩) বৃটিশ পরবর্তী দিল্লী সরকার দারাস্কা কিংবা টিপাইমুখ কিংবা উজানের অন্যান্য জলপ্রবাহে বাঁধ নির্মানের অন্যায্য সুযোগ নিতে পারছে ১৯৪৭ এ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনীতিকদের অনাকাঙ্খিত সমঝতার করনে; ধর্মভিত্তিক দুটি অঞ্চল সৃষ্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। এতে করে বৃহৎ বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মির বিভক্ত হয়ে গিয়ে জটিল রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরী হয়েছে। এবং একই নৃতাত্ত্বিক জাতি পরস্পরের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে দক্ষিন ভারতের তামিলরা ভারত ভূখন্ডে এবং শ্রীলঙ্কায় আলাদা রাষ্ট্র গঠনের যে সংগ্রাম চালাচ্ছে দিল্লী সরকার অখন্ড ভারতের দোহাই দিয়ে তাদেরকে দমন পীড়ন চালাচ্ছে। পূর্ব ভারতের চীনা সীমান্ত সংলগ্ন জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করে দিয়ে এ অঞ্চলের ঐক্য ও সংহতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে। একই কান্ড করছে ইসলামাবাদ কেন্দ্রীক শাসকরা। ভারত শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে ওঠায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশকে

ন্যায্যতা থেকে বঞ্চিত রেখে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হচ্ছে। এতে করে আমরা ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠছি। মুসলমানত্বকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠছি। জলের ধারা নিয়ন্ত্রন করায় এ অঞ্চলের নদনদী নব্যতা হারাচ্ছে; বিরূপতার মুখে পরছে ভূপ্রকৃতি। বর্ষা মউসুমে এ অঞ্চলের নদীগুলো জল উপচিয়ে বন্যা সৃষ্টি করছে, যা জলাবন্ধতার কারনে জনজীবনে বিজপর্যয় ডেকে আনছে। স্থানীয়ভাবে যতই রাজনৈতিক দেন দরবার করিনা কেন বৃটিশ সৃষ্ট এই মানচিত্র মেনে নিলে এ অঞ্চলের জলপ্রবাহরে সংকট কোনোদিন নিসন হবে না এবং হিন্দু মুসলিম দ্বন্ধ কোন এক সময় সীমান্ত সংঘাতের রূপ নিতে পারে। বিডিআর বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে তার কিছু আলামত অনুমান করা গেছে। (৪) বৃহৎ ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের বিদায়ের ফলে ভারত-পাকিস্তান নামধারী যতগুলো রাজ্য বা প্রদেশ বা স্বাধীন রাষ্ট্র কাঠামো আমরা পেয়েছি তা আংশিক, অথবা খন্ডিত, কিংবা ত্রুটিপূর্ন অথবা দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে দেওয়া ছিল তৎকালে এ অঞ্চলের মানুষের বিকাশ রোহিত করার মোক্ষম এক পদক্ষেপ; যা দিল্লীঅলার ব্যাপকভাবে সমর্থন করে গেছে। ফলে আজ যে সার্বভৌম বাংলাদেশ পাচ্ছি তা শ্রেফ ভূখন্ডগত কোনো ভাবেই বাঙালীর জাতীয় সার্বভৌমত্ব নয়। অখন্ড বাংলা ছাড়া নদ-নদীর জল হিসাব ও অন্যান্য সার্বভৌম অধিকার অর্জন করা অসম্ভব। কিংবা উজান অঞ্চলের অপরাপর জাতিগুলোর সঙ্গে সৌহার্দও অসম্ভব। সার্বভৌমত্ব বিষয়টা সাংস্কৃতিক ভাবে মিমাংশিত না হওয়া পর্যন্ত তা স্বাধীন জাতির রূপ পায় কিনা সন্দেহ; আর স্বাধীন সার্বভৌম জাতির জন্য বর্ডার পাহারা এতো জরুরী কোনো বিষয় না। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের উভয় অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীগুলো এই সংকটে পড়ে তাদের স্বতন্ত্র হারাচ্ছে এবং প্রকারান্তরে সার্বভৌমত্বের নামে বৃটিশ সংস্কৃতির দাসে পরিনত হচ্ছে। দুই বাংলার সার্বভৌম অধিকার গুলো এতই বিষদৃশ্য হয়ে গেছে যে, এরা কাঠামোটাকেই শুধু ধারন করছে অধিকার নামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলা চলে শূন্য পর্যায়ে। পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিল্লীর নিয়ন্ত্রনে এবং বাংলাদেশে স্বাধীন পতাকা উড়লেও এর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মক্কা-দিল্লী-লন্ডন-নিউইয়র্কের ইচ্ছ অনিচ্ছার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত এবং বিভ্রান্তির জালে নিপাতিত। এজন্য প্রয়োজন বাঙালত্বি ভিত্তিক বৃহৎবঙ্গ; আরো বৃহৎ করে বললে বলতে হয়, হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োন একীভূত সার্বভৌম অধিকার, যাতে দিল্লীর কোনো হস্তক্ষেপ থাকবেনা। দিল্লী বহুত দূর ওয়াস্ত হ্যায়।

বলছিলাম, উজান ভাটির দেশ নিয়ে। কারন । এ অঞ্চল কয়েকশ বছর ধরে বৃটিশ শোষনের দ্বারা নিস্পেষিত এবং রিক্ত। এ অঞ্চলের জনগনের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পূর্ণ পরনির্ভর এবং প্রকৃতির বিপর্যয়কর বাস্তবতা মোকাবেলা করে সুস্থ সবল উপদ্রবহীন জীবন যাপন নিশ্চিত করা বহু যুগ থেকে শ্রেফ কল্পনা হয়ে উঠেছে। এখন বৃটিশরা নাই; কিন্তু বৃটিশ রীতি পদ্ধতি ও রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোর চাপ থেকে

বেরিয়ে আসতে পারছে না। হিন্দু মুসলিম বিভেদ, বর্ডারের বাঁধা, বর্হিবানিজ্যের একচিটিয়া আধিপত্য এবং দ্বিশত বছর ধরে মর্ডানিজমের চর্চা এ অঞ্চলের মানুষকে তার প্রকৃতি স্বরূপ নির্মাণ করার কাজে বাঁধা সৃষ্টি করছে। ফলে বিপর্যয় মোকাবেলাও করে বেঁচে থাকর মত কষ্টকর বাস্তবতার মুখে শতবর্ষ ধরে দাড়িয়ে আছে বাঙালী জাতি এবং তার চারপাশের অন্যান্য সংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী। সুতরাং বৃটিশ সৃষ্ট মানচিত্রকে চিরস্থায়ী না ভেবে নতুন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো দরকার। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নিজেদের সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে নিজেদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে তা চর্চা করার ভিতরেই রয়েছে এ অঞ্চলের সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী সংকট থেকে মুক্তি। ব্রহ্মার ছেলে ব্রহ্মপুত্রকে যেমন বাচানো যায়নি; তেমনি হিমালয় কন্যা গঙ্গা যে আধুনিক রাজনীতির চাপে বেশ্যা হয়ে রূপ-লাবন্য প্রগতি হারাচ্ছে, তা থেকে বাচানো যাবে কিনা সন্দেহ; যদিনা আমরা গঙ্গাকে জননীজ্ঞান করে সমস্ত বিভেদ তুলে নিয়ে তার সমাদর করতে শুরু করি। এ অঞ্চলের মানুষকে সক্ষম রাখতে হলে নতুন রাজনৈতিক বিবেচনা শুরু করা জরুরি। দরকার গঙ্গা অববাহিকায় নতুন করে নজর দেওয়া।

[লেখক: গল্পকার, ঔপন্যাসিক। ফ্রিল্যান্সার।]

প্র কা শ হ য়ে ছে

শরমিন নিশাত-এর ১ম কবিতার বই

যে-রোদে ছায়া লেগে থাকে

এবং

শওকত হোসেন-এর ৫ম কবিতার বই

পুরনো অস্ত্রের শেষ মরিচাটুকু

সংগ্রহ করুন: ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭

ব্যতিক্রমি প্রবন্ধ

ফারাক্কা ব্যারেজ, স্পাই-থ্রিলার ও দক্ষিণ এশিয়ায় আশু সংঘাত

মুসতাইন জহির

বাংলাদেশের এই জমিন তৈরি করেছে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে যাওয়া নদ-নদী, তারা জলের সাথে বয়ে এনেছে পলি, কণা কণা পলি জমে জমে তৈরি হয়েছে আমাদের পায়ের নিচের মাটি বদ্বীপ বাংলাদেশ। এই দেশের বিশাল সবুজে যেই প্রকৃতি ও প্রাণের সমারোহ, সেই সমস্ত আয়োজন নিশ্চিত হয় জলের বিপুল প্রবাহে। পানি ও প্রাণের এক অবিচ্ছেদ্য মানিক-জোড়। পুরো দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশ ও প্রাণব্যবস্থার টিকে থাকার অলঙ্ঘনীয় শর্ত হচ্ছে জলের এমন অবাধ প্রবাহ। অথচ বাংলাদেশের বেলায় জলের এই চলাচল আটকে দিচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র, ইনডিয়া। বাংলাদেশের মানুষসহ সব প্রাণের অস্তিত্ব হুমকিতে ফেলে দিচ্ছে প্রাণব্যবস্থা, প্রাণবৈচিত্র্য বিপর্যস্ত করা হচ্ছে। মরুকরণ ও লবণাক্ততার মতো বিভীষিকায় ফেলছে বাংলাদেশকে। সবচাইতে সরাসরি যেই ক্ষতি চোখের সামনে থেকে আড়াল হওয়ার উপায় নেই তা হচ্ছে; সারা বছরজুড়ে মরা, আধমরা আর প্রায় মরে মরে দশার নদীগুলোর ভর বর্ষার প্রচুর পানি ধরে রাখতে অক্ষম নদীগুলোর আশপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষের স্রোত। ভিটে-মাটি, জীবন-জীবিকা হারানোর কষ্ট ও ক্রোধ বুকের মধ্যে নিয়ে নিরুপায় মানুষেরা, ছড়িয়ে পড়ছে তারা, এখানে-সেখানে। বাংলাদেশের মতো ছোট রাষ্ট্রের সাথে ইনডিয়ার এই বৈরিভাব, অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীগুলোর নিজেদের অংশে বাঁধ, ড্যাম, ব্যারাজসহ নদীসংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে গায়ের জোরে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করতে থাকা এসবের বুঝি আর কোনো শেষ নেই। দুশমনির এই ধারাবাহিকতা যদি ইনডিয়া বজায় রাখে, তবে এই সংকট যে কোনো সময় তুমুল প্রতিরোধের রূপ নিতে পারে। আর সেই তুমুল প্রতিরোধ কোনোভাবেই এতদিন ধরে চলে আসা বাংলাদেশ-ইনডিয়ার দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে থাকবে না। কিন্তু কেন থাকবে না? কেন এটা দুই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে? সমস্যার কী এমন গুণগত পরিবর্তন এবং চরিত্রগত ভিন্নতা তৈরি হয়েছে? কী কী নতুন উপাদান এসে যুক্ত হয়েছে এর মধ্যে? এসব বিষয়ে কথা-বার্তা বলা জরুরি। সেই চেষ্টা আমরা

করব নিশ্চয়ই। তবে তার আগে ছোট্ট একটা খবর দেই। বিশ্লেষণ-আকারে না-হলেও, সাহিত্য-আকারে সেই চেষ্টার নজির এর মধ্যেই আমাদের চোখে পড়েছে। এইসব বিষয়ের ইশারা-অনুমান কিম্বা বলা যায় সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতির আগাম একটা চিত্র ইতোমধ্যেই একজন এঁকেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য-সাবেক এক ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা ডুয়ান ইভান্স (Duane Evans)। দুই হাজার সাত সালে সিআইএ-র দায়িত্ব থেকে অবসরে যাওয়া উচ্চপদস্থ এই আমেরিকান গোয়েন্দা কর্মকর্তা ডুয়ান ইভান্স একটি স্পাই থ্রিলার লিখেছেন *নর্থ ফ্রম ক্যালকাটা* (North From Calcutta)।

গেল বছর বইটি বের হওয়ার পরপরই বিশ্লেষকদের মনোযোগ কাড়ে। দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান টানাপোড়েনগুলোর মধ্যে একটার সাথে আরেকটার খায়খাতির কত বিশাল পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তারই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন ইভান্স তার এই উপন্যাসে *নর্থ ফ্রম ক্যালকাটায়*। উপন্যাসে লেখক ইনডিয়া ও পাকিস্তানকে কর্তার ভূমিকায় রাখলেও পুরো কাহিনী ঘুরেফিরে বাংলাদেশেকেই ঘিরে থেকেছে। বাংলাদেশ, মানে ইনডিয়ার সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনা ও প্রধান সমস্যা পানিসমস্যা ঘিরেই উপন্যাসের কাহিনী। বইয়ের প্লট হিসেবে লেখক 'ফারাক্কা সমস্যা'কে বেছে নিয়েছেন। একটা 'সন্ত্রাসী হামলা'য় ফারাক্কা ব্যারেজ উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনার সুতা ধরে একটু একটু করে এগোতে থাকে উপন্যাসের কাহিনী। বইটাকে শুধু 'স্পাই থ্রিলার' বললে সবটা বলা হয় না। এটা আসলে আর্ন্তজাতিক ও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্যের লড়াই পানি ও প্রাণসম্পদের ওপরে কৌশলগত ও নিরাপত্তাজনিত নিয়ন্ত্রণ কায়েমের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে এমন একটা 'ভাষ্য' যার কাঠামোটা 'উপন্যাসে'র, উপন্যাসের চরিত্র হচ্ছে 'গোয়েন্দা-গল্পে'র। গল্পের চল বেশ টানটান, নানা মাত্রার আর সম্পর্কের যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে এই গোয়েন্দাভাষ্যে।

পাকিস্তানের সামরিক ইন্টেলিজেন্সের একজন চৌকস মানে সবকাজে পাকা অফিসার তারেক দুররানি। তাকে সরকার ডেকে পাঠায় নবগঠিত একটি সংস্থা আইআরই-এ, উদ্দেশ্য; ফারাক্কা ব্যারেজের ডিজাইন ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। ১৯৭১ সনে বানানো ২,২৫০ মিটার লম্বা ড্যাম এই ফারাক্কা, যেটা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় বানানো হয়েছিল, এই ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশ সালিশ চাইছে জাতিসংঘে । একই প্রকল্পের অংশ জঙ্গিপুর ক্যানেল, যেটা দিয়ে গঙ্গা থেকে হুগলি নদীতে পানি সরানোর কাজ শুরু করে ইনডিয়া ১৯৭৫ সনে। একচল্লিশ দিন সময়ের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার কথা বলে আজো এটা বন্ধ করেনি ইনডিয়া। শুকনা মৌসুমে পানি সরিয়ে নেয়ার জন্য যা ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যারেজ ব্যবহার করেই আবার বর্ষাকালে প্রচুর পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বন্যায় ভাসানো হয়। এই ব্যারেজের প্রভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ, খরা, ফসলহানি হচ্ছে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। অথচ ইনডিয়ান ইউনিয়েনের

কেন্দ্রীয় সরকার এসব স্বীকার করতে নারাজ। তাদের যুক্তি, এসবের জন্য তারা দায়ী নয়, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং নদীর গতিপথ সরে যাওয়ার ফলে এটা ঘটেছে। বাংলাদেশ নিরুপায় হয়ে ফোরাম জাতিসংঘকে সালিশ মানছে, সেখানে তারা এর একটা ফায়সালা চাচ্ছে। বাংলাদেশের দাবি শুকনো মৌসুমে ব্যারেজের গেট খুলে দিতে হবে। না হলে এই বিপর্যয় রোধ করা অসম্ভব। কিন্তু ইনডিয়া এই দাবির কানাকড়িও মানতে নারাজ। এই পটভূমিতে পিছন থেকে বাংলাদেশকে জোরালো দাবি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে চাচ্ছে ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস। পুরো কাজটি সমন্বয় করছে পাকিস্তানে নবগঠিত সংস্থা আইআরই। সে জন্যই মেজর তারেক দুররানির ডাক পড়েছে।

অন্যদিকে, ফারাক্কা ব্যারেজের ২৫ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি ব্যাপকমাত্রার উৎসবের আয়োজন করছে ইনডিয়া। সেখানে এই প্রকল্পের মূল স্থপতিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে। তাছাড়া সারা দুনিয়ার দৃষ্টি এখন এই দিকে, কাজেই এর সুযোগ নেবে ইনডিয়া। একে উপলক্ষ করে স্থাপনা ও নির্মাণখাতে নিজেদের সাফল্য এবং শক্তি প্রদর্শনের জোর আয়োজনে ব্যস্ত দেশটি। বিভিন্নদেশের রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী ও বড় বড় বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। ফারাক্কা ব্যারেজের স্থপতি-কন্যা সাহার আদভানি'র কণ্ঠে ঝরে পড়ছে প্রবল উচ্ছ্বাস; ইতোমধ্যে ঘটনাচক্রে সে প্রেমে পড়েছে সেই মেজর তারেক দুররানির, তারেককে তাই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করছে প্রবল উৎসাহে, সাহার বলছে; I think you would be impressed by Farakka Barrage. It is going to be a big event, with some senior government officials in attendance, as well as foreign dignitaries। উচ্ছ্বাসের এই প্রাবল্যের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদ-নদী, কৃষি ও পরিবেশ বিধ্বংসী বাঁধ বহাল রাখার আগ্রাসী ক্ষমতায় সন্তুষ্ট ইনডিয়া একই সাথে কৌশল ঠিক করেছে কিভাবে এই বিতর্ক থেকে ফায়দা তুলবে সে। অতিথিদের অভ্যর্থনায় নিয়োজিত সরকারি প্রটোকল অফিসার অনিলের কথায় সেই নিষ্ঠুরতা ও নিখুঁত কূটনীতিক কৌশলের উদযাপন লক্ষ করা যায়, 'It's actually a clever strategy, whether India wins or loses in the debate. A high-profile ceremony highliting the dam will emphasize the point that India bows to no one on internal issues. Obviously, that is why our deputy U.N. rep will be here.'

অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীতে বাঁধ দিয়ে আরেকটি দেশকে শুকিয়ে মরুভূমি বানানোর পরও কিভাবে এই ইস্যুটা ভারতের নিজস্ব ব্যাপার থাকে? অন্যকারো কাছে 'নত' না-হওয়ার দম্ভ প্রকাশ করতে পারে দেশটি? পারে। কারণ, এর পরই আমরা উপন্যাসের নায়ক তারেকের মাধ্যমে জানতে পারি জাতিসংঘ ভোট দিয়েছে ইনডিয়ার পক্ষে। বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাওয়ার মুখেও আন্তর্জাতিক কোনো উদ্বেগ তৈরি হয়নি। প্রকল্পটি বন্ধ করার কোনো নির্দেশ জারি করা হয়নি ইনডিয়ার প্রতি।

বাংলাদেশের হতাশ প্রতিনিধি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে বের হয়ে আসেন। চরম অসহায় অবস্থা, কূটনীতিকভাবে বাংলাদেশের আর কিছুই করার থাকল না।

বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকেরই এরকম পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হওয়ার কথা। কেউ অবশ্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেও চাইতে পারেন; ইভান্সের কাল্পনিক এ ছবি হুবহু বাস্তবে না-ঘটারই সম্ভাবনা এ বলে যে কেউ নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারেন। কিম্বা সত্যি সত্যিই এই সমস্যা থেকে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক ফোরাম জাতিসংঘের এমনভাবে ইনডিয়ার প্রতি সমর্থনের বিপদ থেকে, হয়তো বাংলাদেশ বেঁচেও যেতে পারত। কিন্তু ইভান্সের এই কল্পভাষ্যের বাইরে আমরা সম্প্রতি অন্য ঘটনা দেখেছি। *নর্থ ফ্রম ক্যালকাটা* উপন্যাসে বলা এই কল্প-বিপদকে বাস্তবে রূপ দিতে অনেক দূর এগিয়েছেন স্বয়ং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সর্বশেষ সফরে তিনি ইনডিয়াকে আনুষ্ঠানিক ওয়াদা দিয়ে এসেছেন যে, জাতিসংঘে ইনডিয়ার স্থায়ী সদস্যপদ লাভে তিনি দেশটিকে সমর্থন দেবেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কার্যত বাংলাদেশের মৃত্যুপরোয়ানায় নিজের হাতে সই করে এসেছেন। ইনডিয়া যদি জাতিসংঘে স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে, তবে পানিসমস্যা–ফারাক্কা সমস্যা–সীমান্ত বিরোধ ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়ে সালিশ বা শুনানি তো দূরের কথা, এগুলো আলোচনার জন্য ওঠানোর সুযোগই বন্ধ হয়ে যাবে। যেখানে নিরাপত্তার স্বার্থে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কূটনীতিক কার্যক্রম প্রসারিত করা দরকার, সেখানে বরং উল্টো আত্মঘাতী কবর রচনার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে। এতদূর পর্যন্ত কি অনুমান করতে পেরেছিলেন ডুয়ান ইভান্স?

বিপদের ঘনঘটার ভেতর আচমকা জানা যায়, আইআরই নিজের কাজের পাশাপাশি অন্য এক ক্ষেত্রে 'এলটি'কে সহায়তা করছে। অ্যাটোমিক ডিমলিশার দিয়ে 'ফারাক্কা ব্যারেজ ২৫ বছর পূর্তি'র জমকালো উৎসবের সময় ব্যারেজ উড়িয়ে দেবার কাজে আইআরই সাহায্য করছে অন্য একটি সংগঠন এলটি'কে। সেখানে এলটি বা আইআরই-এর কমন স্বার্থ হচ্ছে কাশ্মিরে সার্বক্ষণিক যুদ্ধে নিয়োজিত বিশাল ইনডিয়ান সেনাবাহিনীর ভারসাম্যের বদল ঘটানো। তাদের ক্ষমতা কমিয়ে শক্তির হিসাবে নিজেদের এগিয়ে থাকার শর্ত তৈরি করা। আবার অদ্ভুতভাবে, ইভান্স ইঙ্গিতে দেখাচ্ছেন যে, ব্যারেজ উড়িয়ে দেবার অপারেশনে নিয়োজিত বাহিনীর সাতজন সদস্য বাংলায় কথা বলে। ব্যস, এটুকুই তথ্য এ-বিষয়ে, আর বেশি কিছু নয়। ফারাক্কা ব্যারেজ উড়িয়ে দিতে অতি উচ্চমাত্রার এক 'সন্ত্রাসী' হামলায় রওয়ানা হয়েছে যারা, তাদের কাফেলার সাত জন বাংলায় কথা বলে। সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের সব কূটনীতিক চেষ্টা যখন বিফল, বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি যে ব্যারেজ– সে ব্যারেজ বিষয়ে জাতিসংঘও যখন কিছু করছে না তখন সেই ব্যারেজ উড়িয়ে দেবে লস্কর-ই-তাইয়েবার একদল লোক! এরা কারা? তারা কি মরুপ্রায় শুকনো নদীর চরে জীবন-জীবিকার শর্ত হারানো উন্মুল কেউ? তারা কি এমন কেউ যারা ভিটেমাটি হারিয়ে

উদ্বাস্তু? ফারাক্কা ব্যারেজে এই হামলার পাশাপাশি, বারো ঘণ্টার মধ্যেই আবার উত্তর-পূর্ব ইনডিয়ার স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরাও যুদ্ধ শুরু করবে। চারদিক থেকে কোণঠাসা করে যাদেরকে এই সমীকরণে ঠেলে দিয়েছে ইনডিয়া, তারা যুক্ত হয়েছে এই সমস্যার সাথে অনিবার্যভাবে। কী হতে যাচ্ছে তাহলে? কী করবে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের মানুষ? কল্পনা আর নিরাপত্তা ঝুঁকির অনুমাননির্ভর এক গোয়েন্দাভাষ্যে সম্ভব-অসম্ভবের মানচিত্র ফুটে উঠছে। সেখানে বঞ্চনা ও ক্রোধ, অসহায়ত্ব ও প্রতিশোধের বারুদে কি অগ্নিশিখা জ্বলে উঠবে? তাছাড়া যেভাবে বাস্তব ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে তাতে করে কী ঘটবে ইভান্সের উপন্যাসের বাইরে?

দুই.

....

ডুয়ান ইভান্স নিউ মেক্সিকো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া। তারপর, সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রাগ-এ ৮২ এয়ারবোর্ন ডিভিশনে নিয়োজিত হন। স্পেশাল ফোর্স অফিসার প্রশিক্ষণ সহ রেঞ্জার স্কুল করেন। এবং সেনাবাহিনীতে প্যারাশুটিঙে মাস্টার রেটিংও পান।

ছয় বছর সেনাবাহিনীতে থাকার পর, ১৯৮৩ সনে সিআইএ-এ যোগদান করেন। বিদেশে ইভান্স অপারেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন। মাঠপর্যায়ের সর্বোচ্চ পদ স্টেশন চিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ইন্টেলিজেন্স স্টার খেতাব পান। দীর্ঘদিন দিল্লিতে কর্মরত ছিলেন। চারটি মহাদেশে কাজের সূত্রে বিচরণ করেছেন। সিআইএ থেকে অবসরে যান ২০০৭ সনে। এটা তার পয়লা উপন্যাস যা লেখার পরিকল্পনা করছিলেন সেই ১৯৯৫ থেকে। অবশেষে গতবছর শেষ হয়ে তা বই আকারে বের হয়।

....

উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরা এই লড়াইয়ে হঠাৎ যুক্ত হতে গেল কেন? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ইনডিয়া সফরে যেমনতরো 'নিরাপত্তা' চুক্তি করে এসেছেন সফর শেষে ঘোষিত সমঝোতা ইশতেহারে যেমন সাফসাফ ইশারা পাওয়া যায় বাংলাদেশকে একটা সম্প্রসারিত যুদ্ধের পক্ষভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী; তাতে মনে হচ্ছে ইভান্সের ইঙ্গিত বাস্তবায়নের পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, হয়তো সহসাই।

বাংলাদেশ ও ইনডিয়ার দুই প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠক শেষে, দুই পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত ওই যৌথ ইশতেহারে মোট একান্নটি দফা আছে। প্রথম বারোটি দফায় কূটনীতিক রেওয়াজ পালন করা হয়েছে বৈঠকের প্রেক্ষাপট, উপস্থিত প্রতিনিধিদলের সদস্য ইত্যাদি বিষয়ের গতানুগতিক বর্ণনা। তবে সেখানে ইনডিয়ার প্রতিনিধিদলে একজন ব্যক্তির উপস্থিতি ঠিক 'গতানুগতিক' বলে ধরে নেয়া

যাচ্ছে না। ইনডিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী টি.কে.এ. নায়ারের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। কারণ, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতিনির্ধারক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

সফরের আগে থেকেই তিনটা চুক্তি নির্দিষ্ট করা ছিল। এসব চুক্তির সব বিষয়াশয় 'নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতা' বলে সফরের মাসখানেক আগে থেকে তুমুল প্রচার চালানো হয়। আসলে এই নিরাপত্তা কার জন্য এবং বাংলাদেশ কেন এটাকে নিজের রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে জায়গা দেবে, এই বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান নেবে, এই নিয়ে নাগরিকেদের মত-অমত ও সামাজিক সমর্থন যাচাই করা তো দূরের কথা কোনো ধরনের জাতীয় সংলাপ বা আলোচনা তোলা হয়নি। জাতীয় পরিসরে সে ধরনের আলোচনা অবশ্য দুই সরকারের জন্যই অসুবিধে তৈরি করতে পারত, কারণ চুক্তিগুলোর আসল উদ্দেশ্যটাই আড়াল করে হাজির করা হয়েছে মানুষের সামনে। পরাশক্তির চালু করা জিনিস'সন্ত্রাস' বা 'সন্ত্রাসবাদ' ঠিক কী জিনিস সেই বিষয়ে দুনিয়ার মানুষ একমত নয় তবু 'সন্ত্রাস' আর 'সন্ত্রাসবাদ' প্রতিরোধের নামে দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। এই সুযোগে ইনডিয়া তার নিজের দেশের ভেতরের বা আঞ্চলিক সমস্যাকে ওই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র কাতারে ফেলে একই কায়দায় সমাধানের রাস্তা খুঁজছে। সেই বিপজ্জনক রাস্তায় দেশটি বাংলাদেশকে টেনে নিতে চাইছিল বহুদিন ধরে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের টুইন-টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর থেকে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির মওকা পেয়ে জব্বর চাপাচাপিতে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এবার চাপাচাপি করে নিজের শক্তি খরচ করা তো লাগলই না, বরং একদম অনায়াসে একেবারে আয়েশ করে নিজের যুদ্ধাভিযানের সারথি বানিয়ে নিল। এই যুদ্ধ ইনডিয়ান ইউনিয়নের নানা রাজ্যভুক্ত নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইউনিয়নভুক্ত নানা অঞ্চলে দখলদারি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-নির্যাতন, বলপ্রয়োগ ও নির্বিচার হত্যাকা চালিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মুক্তির লড়াই নির্মূল করার এই যুদ্ধে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শামিল করলেন।

দমন-নির্যাতন ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহকে নিরাপত্তার সমস্যা হিসেবে দেখার নীতি ইনডিয়া নিতেই পারে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের কেন একইভাবে শামিল হতে যাবে? নিজের রাষ্ট্রীয় নীতির নিরাপত্তার বিবেচনা ছাড়া, বিনা প্রশ্ন ও বাক্যব্যয়ে বাংলাদেশ কেন ইনডিয়ার যুদ্ধযাত্রায় সঙ্গী হবে? এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই সরকারের কাছে। অবশ্য কখনো সখনো এটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, এসব চুক্তির ফলে ইনডিয়ায় পালিয়ে যাওয়া সুব্রত বাইনদের মতো অপরাধী- চাঁদাবাজ আর ভাড়াটে খুনিদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। একদিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে সাধারণ অপরাধী, অন্যদিকে ইনডিয়ার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইরত গেরিলা বাহিনীগুলোর সদস্যদের এক কাতারে ফেলে বিবেচনা করছেন তারা; এতে করে পুরা পরিস্থিতিকে তারা বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক করে তুলছেন

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা অনিশ্চিত করে তুলছেন। দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-কৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সহায় হবে এ-কথা বলে বাংলাদেশ যেভাবে একটা দীর্ঘমেয়াদি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধাভিযানে পক্ষ নিচ্ছে এটা রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে মস্ত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে। পররাষ্ট্রনীতির জায়গা থেকে নিদেনপক্ষে নিরপেক্ষ না-থেকে এই যুদ্ধে সরাসরি ইনডিয়ার পক্ষ নেয়ার ফল কী হবে সেটা বোঝার সময়ও বাংলাদেশ পাবে কি না, সন্দেহ আছে। ইনডিয়াও যে পার পেয়ে যাবে সেই সুযোগ নেই, খেসারত ইনডিয়াকেও কড়ায়গায় গুণতে হবে যদি ইভান্স ঠিক ঠিক বুঝে থাকেন। সেই প্রসঙ্গে খানিক পরে আসছি।

যদি বাংলাদেশ আসলেই নিজেদের নিরাপত্তা সংহত করতে নতুন কোনো উদ্যোগ দরকার আছে বলে ধার্য করে, তবে সেটা ইনডিয়া-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসবিরোধী প্রকল্পে'র বাইরে থেকেও করা সম্ভব। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নৈতিক ভিত্তি ও কৌশলকে ভিত্তিকে করেই সেটা সম্ভব। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের এটা একদিক থেকে সুবিধেরও ছিল। কিন্তু সে দিকে না-গিয়ে সরকার নিজেই বিপদের দিকে পা বাড়িয়েছে। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের নৈতিক ও ঐতিহাসিক সংবেদনার যে ভিত্তি আছে, সেই ভিত্তি থেকেই ইনডিয়ার পূর্বাঞ্চলের সাতবোন থেকে কাশ্মির পর্যন্ত চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণ কায়েমের লড়াইকে বিবেচনা করতে পারত বাংলাদেশ। এই বিবেচনা থাকা উচিত নিজেদের রাষ্ট্রীয় শক্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই; কোনো ভাবাবেগ বা সংকীর্ণ বিদ্বেষ পোষণের মামলা এটা নয়। একটি স্বীকৃত ও বৈধ রাজনৈতিক লড়াইকেও ইনডিয়ার সাথে সাথে শেখ হাসিনা যেভাবে একাকার করে ফেলেছেন, তাতে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়িই ইভান্সের কল্পিত ছকমাফিক যুদ্ধের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে এই অঞ্চল।

যৌথ ইশতেহারে বলা হয়েছে: ''activities inimical to the other and resolved not to allow their respective territory to be used for training, sanctuary and other operations by domestic or foreign terrorist/militant and insurgent organizations and their operatives''. অন্যদেশের ইনসারজেন্সি দমন করা বাংলাদেশের কর্তব্য? তার ওপর, লক্ষণীয় হচ্ছে, বিদ্রোহী সংগঠন বলেই থামছে না ইশতেহার, বলছে অপরাপর 'কর্মকাণ্ড' এবং তাদের সংশ্লিষ্ট যে-কেউ। এর আওতা এতটাই সীমানা ছাড়া ও লম্বা আছে যে ননকম্ব্যাটেন্ট বা যোদ্ধা ছাড়াও যে কোনো বেসামরিক সহমর্মী, সহানুভূতিসম্পন্ন লোক কিম্বা প্রাণভয়ে পালানো পরিবারের সদস্য অথবা আক্রান্তদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কিম্বা আক্রান্তদের পক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যস্ত লোকেদেরও অনায়াসে এই 'সন্ত্রাসে'র মধ্যে ফেলা যাবে। মানবাধিকার তো দূরে থাক, কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে সর্বাত্মক শকুনে যুদ্ধ (অল আউট ওয়ার) চালানোর সাফসাফ ইশতেহার এটা। এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে বাংলাদেশের সক্ষমতা যাচাই করার কোনো দরকারই মনে করেননি

শেখ হাসিনা। কী পরিমাণ ঝুঁকি থাকতে পারে এতে, সেটা নির্ধারণ করার কোনো আগ্রহও দেখাননি। দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখে তিনি এক ভয়াবহ আসন্ন যুদ্ধের দিকে বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। ইভান্সের, অর্থাৎ পরাশক্তির কৌশলবিদদের তৈরি করা সমীকরণের দুই মাথার অংকটা শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে গিয়ে মিলিয়ে দিয়ে আসলেন। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে একটা ব্যাপক মাত্রার মেরুকরণ আসন্ন; আর যুদ্ধ সম্ভবত শুরু হল শেখ হাসিনার রাজি-খুশিতেই। উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গলাটিপে ধরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা।
আর এত এত কাজে তার একমাত্র উপস্থিত পরামর্শক হলেন শ্রী নায়াক্ত্ত দিল্লির সাউথব্লকই তার ভরসা।

অবশ্য নয়াদিল্লির সাউথব্লকের কর্তাব্যক্তিরা ইনডিয়ান ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারও ইনডিয়াবাসীর জন্য দুর্ভোগ ডেকে আনছেন এর মাধ্যমে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং এই যুদ্ধে ইনডিয়ারও দুর্দশা পাকাপোক্ত হবে। অন্তত ইভান্সের মূল্যায়ন তো সেই ছবিই আঁকছে। সাতকন্যার অবস্থান থেকে বাংলাদেশ খুব-একটা দূরে নয়। বাংলাদেশ যদি ইনডিয়ার হিংস্র থাবা ও নখর বিস্তারের জায়গা তৈরি করে দেয় তবে সাতকন্যার স্বাধীনতাকামীরাও এর বদলা নিতে বাংলাদেশের ওপর তাদের সমস্ত শক্তি খরচ করবে। খুঁজে নেবে আপন আপন মিত্রজোট। সেই দিকে এবার ফেরা যাক। পাকিস্তানের একজন সেনাকর্মকর্তা তার উপরওয়ালাকে, যাকে ডুয়ান ইভান্স চিত্রিত করেছেন ঘটনাচক্রের একজন মুখ্য প্রযোজক হিসেবে, অপারেশনের শেষ মুহূর্তের খুঁটিনাটি জানাচ্ছেন। “We have cordinated two indigenous insurgent groups. Within the next 12 hours, they will begin to step up their operations here and here. Haq pointed to areas in Nagaland and Manipur. I might mention that this is the first time that they have cooperated oprationally, and nither group is Islamic, they are ethnic minorities with long-standing grievance against India.”

দেখা যাচ্ছে, ফারাক্কার অপারেশনটি চালানো যখন, তখন এর সাথে একই সময়ে শামিল হবে ইনডিয়ান ইউনিয়নের থেকে স্বাধীনতাকামী দুটো বাহিনী, নাগাল্যান্ড ও মনিপুরের। যারা কেউ নিশ্চয়ই ‘ইসলামি’ দল নয়। দীর্ঘদিনের দখলদারি ও বঞ্চনা তাদের ক্ষোভের কারণ, বিদ্রোহ তাদের দীর্ঘদিনের, কিন্তু এই প্রথম তারা পাশাপাশি এসে একসূত্রে একটা অপারেশনে কাজ করছে, সমন্বিতভাবে। যেটা আগে কখনো ঘটেনি। এখানে বুঝতে হবে আলাদা করে ‘ইসলামি’ কথাটা বলার একটা কারণ আছে। একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সূচনা হয়েছে ইসলামি একটা দলের অপারেশনের সাথে একযোগে যুক্ত হয়ে কাজ করছে ভারতের দুটি জাতিগোষ্ঠীর সংগঠন। সেই দলটির নাম লস্কর-ই-তাইয়েবা, এলইটি! এতদিন পরে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ কী সেটার কোনো ব্যাখ্যা ইভান্স দেননি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি; যে বই ইভান্স বের করেছেন তার সাবেক কর্মস্থল সিআইএ’র অনুমোদন নিয়ে তাদের পুরো কাহিনী

দেখিয়ে সেই বইয়ে তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারেন না। সেই 'বেশি কিছু'টা কী হতে পারে? আকলমন্দকে লিয়ে ইশারাই কাফি! চীনকে যখন ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা সমানে চলছে, তখন চীনও নিশ্চয় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

তো, এলইটি যেই হামলার দায়িত্বে থাকবে সেটার লক্ষ্যস্থল ফারাক্কা ব্যারেজ কেন? তীক্ষ-পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ইভান্সের কাহিনীতে এই অঞ্চলের সামগ্রিক সংঘাতের চরিত্র তিনি তুলে ধরেছেন নানা প্রতীকের মাধ্যমে। যেসব বিষয় পুরো সংঘাতের মধ্যে এখন কেন্দ্রে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, তার একটা অবশ্যই 'পানির বিরোধ', অন্যতম প্রধান বিরোধ। ইনডিয়ার সাথে অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানিবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘকালীন সমস্যায় আটকে আছে। যৌথ ৫৪টি নদীর উপরই ইনডিয়া কোনো না-কোনো প্রকার বাঁধ বানিয়েছে ব্যারাজ কিম্বা ড্যাম কিম্বা সেচপ্রকল্পের নামে গায়ের জোরে পানি প্রত্যাহার করছে। সবমিলিয়ে পানি প্রত্যাহারের জন্য ইনডিয়ার গ্রহণ করা নানামুখি প্রকল্পগুলো সংঘাতের দিকে এই অঞ্চলকে ঠেলে দিচ্ছে, ক্রমাগত। সর্বশেষ টিপাইমুখ প্রকল্প সম্ভাব্য সংঘাতের তীব্রতাকে আরো আরেক ধাপ উপরে উঠিয়েছে। পানির পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রবাহ শুধু বাংলাদেশের কৃষি, প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্যই একান্ত আবশ্যক নয়, সাথে নদীবিধৌত পলিস্তরে গড়ে ওঠা ভূ-ভাগের অস্তিত্ব বজায় থাকার সম্পর্কও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। শুধু পানি, পানির স্বাভাবিক প্রবাহ দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটির প্রাণের বিকাশ-ধারা টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সকল শর্তের উপস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে, যাচ্ছে। কথা হল; নিজের একার রাষ্ট্রীয় তৎপরতায়, আন্তর্জাতিক ফোরামে দেনদরবার করে, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থন নিয়ে আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, বাংলাদেশে কি সেই 'শুকিয়ে মরা'র সম্ভাবনা ঠেকাতে পারবে?

এমন কী ক্ষমতা বা শক্তির ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করতে পারে বাংলাদেশ, যাতে করে সে আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে নিজের ন্যায্য অধিকারটুকু আদায় করে আনতে পারবে? সেই প্রশ্নে কিছুটা এগিয়ে, সেই প্রশ্ন সামনে রেখে ইভান্স আভাস দিচ্ছেন; ইনডিয়ার একরোখা মনোভাব আর আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের অদূরদর্শিতার যোগফলে কেমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এই অঞ্চলে। বাংলাদেশের নদীগুলো শুকিয়ে মেরে, পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ইনডিয়া কোনোভাবেই নিজের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না।

কিভাবে ইনডিয়ান ইউনিয়নের নিরাপাত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে, সেই ঘটনাপরম্পরা কিভাবে অগ্রসর হতে পারে, সেই ইশারা খানিকটা আমরা পেলাম *নর্থ ফ্রম ক্যালকাটা* উপন্যাস থেকে।

যদিও ইভান্স সমাপ্তি টেনেছেন এইভাবে যে, খোদ আইএসআই অফিসার মেজর তারেক দুররানির জীবনবাজি প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে বানচাল হয়ে যায় অপারেশন ফারাক্কা। কিন্তু সে চেষ্টা একবার ব্যর্থ হলেই কি থেমে যাবে? তাছাড়া, শুধু তো গোয়েন্দাগল্পের মধ্যেই আর বিষয়টি সীমিত নেই। এই যেমন সম্প্রতি *নিউইয়র্ক টাইমসে* ফিলিপ বাওরিং লিখেছেন 'India's opening with Bangladesh', মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একজন ভাষ্যকার ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শক হচ্ছেন বাউরিং। এ-বছরের বারোই জানুয়ারি প্রকাশিত লেখায় বাউরিং বলছেন, ইনডিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যঘাটতি, সমুদ্রসীমানা নির্ধারণ কিংবা ট্রানজিটের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ইস্যু হচ্ছে পানি। ইনডিয়া যেভাবে বাংলাদেশকে পানি থেকে বঞ্চিত করছে, তাতে করে বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হওয়া খুবই 'সঙ্গত', পানি বাংলাদেশের প্রাণরক্ষার জন্য 'রক্ত সঞ্চালন'-এর মতো। অভিন্ন নদ-নদীসমূহের পানি পাওয়া না-পাওয়া আর বাংলাদেশের টিকে থাকা না-থাকা, জনগণের বাঁচা-মরা একই সূত্রে গাঁথা। এটা অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত। তবু বাংলাদেশকে মরুভূমি বানাবার পথ ছেড়ে সরে আসছে না ভারত। তাহলে, যে কাঁটায় জলপ্রবাহের শরীর আর বাংলাদেশের প্রাণ ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে সেটা সরাবে কে?
ইভান্স যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, সেদিকেই কি এগুতে থাকবে অবশেষে!

[লেখক: সংগঠক, প্রাবন্ধিক। পেশা: চাকরি।]

প্র ব ন্ধ

দেশের জলাভূমি ও নদ-নদীর পানিপ্রবাহের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের সমস্যা

নূ র মো হা ম্ম দ

বাংলাদেশের ভূ-পরিস্থ পানিপ্রবাহের সঙ্গে ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ ও জনজীবন এতটাই জড়িত যে, বলা যায় নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ ধ্বংস হলে বাংলাদেশ তার উদ্ভিদ-প্রাণী/জনগোষ্ঠী নিয়ে সার্বিকভাবে চরম অস্তিত্ব সংকটে পড়বে; এককথায় বলা যায়, নদীপ্রবাহ রুদ্ধ তো জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ!

আমরা যদিও জানি বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিসমস্যার সমাধান যদি না-করা যায় তবে অচিরেই সমাধানহীন অকল্পনীয় সংকটের সম্মুখীন হতে পারি– যেখানে বর্ষা ও বন্যার পানি আমাদের প্রয়োজনীয় ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা সবটা পূরণ করতে পারে না– পারবে না, অন্যান্য সব দিক তো আছেই। সেখানে প্রবহমান নদী ও সমৃদ্ধ জলাভূমির অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন– কোনো বিকল্প নেই।

আমি পানি বা নদী-গবেষক নই। অথচ উপনিবেশ ও উপনিবেশিক উত্তরাধিকার যেখানে সুদৃঢ় সেখানে অন্তত এই বিশেষ খাতটির বিশেষজ্ঞরা সরকারি আমলা– এই আমলাদের সিংহভাগই আবার প্রকৌশলী। নব্য-উপনিবেশিক অভিলাষের সঙ্গে তাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত কপিল ভট্টাচার্যও একজন প্রকৌশলী পথিকৃত নদীবিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা', (সংহতি, ১৪১৪) গ্রন্থে বলেন, 'সরকারি পরিকল্পনার ভ্রান্তি ও ভাঁওতা বুঝতে হলে নদী ও উপত্যকা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য।' নদ-নদী সম্পর্কে বলেন, 'বাস্তবিক এদেশের অধিকাংশ ভূ-ভাগই নদ-নদীর দ্বারাই গঠিত। অর্থাৎ প্রবাহবাহিত পলিমাটির স্তরে স্তরে অবক্ষেপণই এই ভূ-ভাগকে সমুদ্র থেকে গেঁথে তুলেছে।' এর সহজ অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আমাদের জীবনসহ এই ভূ-ভাগটির অস্তিত্ব নদীর উৎসমুখ থেকে সাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত তার প্রাকৃতিক প্রবাহ বাধাহীন থাকার সঙ্গে নিশ্চিত জড়িত। তিনি সতর্ক করেছেন, 'বাংলার অথবা যে কোনো দেশের নদ-নদী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অংক, গতিতত্ত্ব প্রভৃতির জ্ঞান ছাড়া উপায়

নেই।' এই জ্ঞানের খুব সামান্যই আমার জানা আছে। কিন্তু তবুও কপিল ভট্টাচার্যের বাণী মাথায় রেখে আমি বলতে মোটেও দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি না– সমস্যা যখন প্রকট হয়ে ওঠে এবং ক্ষতিটা যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ সাদা চোখে অনেক গভীর অন্ধকার অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখতে পারেন। আমি আমার পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্যদের গবেষণা অনুসন্ধান করে স্পষ্ট মতামত দেবার জোরালো তাগিদ অনুভব করি। পানি-প্রশ্নে বরং দেশের আমলা-বিশেষজ্ঞরাই আমাদের ডুবিয়েছে। পানি সম্পর্কে শ্রেণীগত স্বার্থে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রশ্নে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রাষ্ট্র ও সরকারের তরফ থেকে জনগণ পাননি।

আমি নিশ্চিত, পানিপ্রবাহকে কেন্দ্র করে আমাদের এই ভূ-খণ্ডের প্রাণ, প্রকৃতি পরিবেশ-প্রতিবেশ আজ সর্বনাশা বিপদের গুরুতর চাপের মুখে রয়েছে– প্রতিটি মুহূর্তেই অবস্থার অবনতি ঘটে চলেছে। পানির ওপর প্রতিবেশী ভারত ও দেশীয় ধনিকশ্রেণীর বর্বর আগ্রাসন প্রকটভাবে দৃশ্যমান হলেও প্রতিরোধ নেই বললে চলে, স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও প্রতিরোধ দেখা গেলেও দেশি-বিদেশি অর্থায়নে পুষ্ট নানা ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের উপকারের নামে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ফেলে। উপরন্তু দেশের দুইটি রাজনৈতিক জোট গ্রামপর্যায় পর্যন্ত সীমাহীন শোষণ-অত্যাচারকে নৈরাজ্যিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এখন নির্মমতার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। প্রতিটি পাড়া এমনকি পরিবারকে দেশের শাসকজোটগুলো বিভক্ত করে ফেলেছে, বিপরীতে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিস্থিতি নাজুক। সেই সাথে প্রগতিশীল সংগ্রামী রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপক শূন্যতা জাতীয় জীবনে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখন প্রকল্পপন্থীদের রাজত্ব। উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, ফান্ড, কনসালট্যান্ট, এনজিও ও বিদেশি সংস্থা– এসবের দাপট সর্বত্র।

প্রবন্ধটির দুটি ভাগ : ক. ভারতীয় পানি আগ্রাসন; খ. দেশীয় ধনিক শ্রেণীর পানির ওপর আগ্রাসন।

দেশের অভ্যন্তরে পানিকে কেন্দ্র করে হিংস্র শ্রেণীটি যে লুঠতরাজের অভিযান চালাচ্ছে তা মূলত শ্রেণীসমস্যা হলেও এর সাথে যুক্ত আছে বিদেশিরা– ফলে এ-ও এক ধরনের দেশের সব থেকে স্পর্শকাতর যে পানিসম্পদ তার ওপর অভ্যন্তরীণ দৃশ্যপটে যৌথ আগ্রাসন মনে করা যাবে। এবং ভারত একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে তার আচরণের ধরন বিপজ্জনক। বাংলাদেশকে যেমন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা (পানি-প্রশ্নটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সমস্যাও বটে) সমাধানে আপত্তি তেমনি বাংলাদেশ একটি প্রদেশও নয়। অন্যদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় পানি পরিকল্পনা (যেমন আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প) কার্যকরী হতে থাকলে বাংলাদেশের অস্তিত্বসংকট দেখা দেবেই। অথচ বাংলাদেশ যদি ১৯৪৭ বা ১৯৭১-এর সময় অবিভক্ত ভারততত্ত্বের প্রতি সমীহ প্রদর্শন করে ভারতেরই একটি

আনুষ্ঠানিক প্রদেশ হয়ে যেত তাহলে বাংলাদেশের ৫৪টি নদীর প্রবাহ নিয়ে কেন্দ্রকে হয়তো অন্যভাবে ভাবতে হত। এখন ভারত দুটি সুযোগেরই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অনুকূলে ব্যবহার করতে পারছে ও পারবে ধরে নেব।

বাংলাদেশ একটি বিদেশি রাষ্ট্র বিধায় নদীপ্রবাহ সম্পর্কে যেমন বোগাস প্রতিশ্রুতি থাকবে তেমনি বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীকে প্রলোভনের মোলায়েম অবস্থায় রাখতে বা কথিত ভারতবিদ্বেষকে নমনীয় পর্যায়ে আটকে 'চুক্তি'র প্রলম্বিত প্রতিশ্রুতি ও কখনো কখনো অকার্যকর 'চুক্তি', 'চুক্তি'র মহড়া ইত্যাদি ইত্যাদি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। ভারত তার বাংলাদেশ সীমান্তকে জলপ্রবাহ হত্যা ও নরহত্যার মাধ্যমে নিয়মিত রক্তাক্ত অবস্থায় রাখতে চাইবে অনুমান করি। ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য ও বর্তমানে বার্মা/মায়ানমার সবটা মিলে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে 'ভারতীয় নিরাপত্তা' যার সাথে সামরিক (সীমান্ত প্রহরী, পুলিশ, গোয়েন্দা ইত্যাদিসহ) বিষয়াদি জড়িত এবং প্রাসঙ্গিক ইত্যাদি সব সমস্যা শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশ তার পানি হিস্যা পাবে কি পাবে না সেই হিসেব-নিকেশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে।

দুই.

উপরোক্ত বিষয়দুটির পক্ষে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকের মতামত হাজির করবার আগে হালখাতার 'নিরাপদ পানি' (২০১১) সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের একটা ক্ষুদ্র অংশ তুলে দিচ্ছি, যাতে করে এ-সংক্রান্ত বিষয়ে আমার মতের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় :

'রেললাইন স্থাপনের মধ্য দিয়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা-বিধৌত (শাখা-প্রশাখাসহ) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপটির স্বাভাবিক পানিপ্রবাহে বড় ধরনের হস্তক্ষেপ হয় এবং যেমন পরিবেশের ওপর তেমনি জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। যদিও এখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই। পরবর্তীতে সড়কপথের বিকাশ এবং ক্রমাগত নির্মমভাবে ছোট-বড় অসংখ্য সেতু ও কালভার্ট নির্মিত হতে থাকে– এখনো তা হয়েই চলেছে। যাতে করে দেশটির পুরো পানিপ্রবাহ তার নিজস্বতা হারিয়েছে। বর্ষামৌসুম ও বছরের বাদবাকি সময়ে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়াবহ ফলাফল জনগণ সীমাহীন ভোগান্তির মধ্য দিয়েই নিয়ত উপলব্ধি করে চলেছে।

আমরা যদি রেলপথ ও সড়কপথকে দুটি পর্বে ভাগ করি তবে দেখতে পাব রেলপথের হস্ত

ক্ষেপে পানিপ্রবাহ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল তা কিন্তু পানিপ্রবাহ নিজ বদান্যতায় অধিবাসীসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের স্বার্থানুকূলে অনেকটা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল। আমরা দেখলাম এরপরও নদী (খাল-বিলসহ) লোক চলাচল, বাণিজ্য, মৎস্য, পাখিসহ বিভিন্ন ধরনের জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদ– বহুমুখী সেবা দিতেই থাকল। খাদ্য

উৎপাদনে বৃষ্টিপাতই প্রধান ভূমিকা রাখতে পারছিল। এই পর্যায়ে যদি ইতোমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছিল তা মেনে নিয়েই রেললাইনকে আমরা আরো প্রসারিত– কয়েকটি সংযোগ স্থাপন, সৈয়দপুর, পাহাড়তলীসহ আরো কয়েকটি উঁচু মানের ওয়ার্কশপ যা কিনা রেলব্যবস্থা মজবুত ও চালু রাখতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে অবশ্যই পারত তা হলে প্রধানত রেলপথ ও পানিপথই আমাদের লোক চলাচল ও বাণিজ্যক কর্মকাণ্ডের সিংহভাগের দায় বহন করতে সক্ষম থাকত। এটা ঠিক সব সময়ের জন্য দুর্নীতিমুক্ত ঠিক-ঠাক দেখভাল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হ'ত– দেখা গেল বিপরীতে পুরো রেলব্যবস্থাকেই তো বটেই নদীপথকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হল।

অথচ ব্যাপক ভিত্তিতে সড়কপথের বিস্তার ও ট্রাক-বাসের মাধ্যমে গতিবেগের আগ্রাসন আমাদের মননে ও মজ্জায় গেঁথে দেওয়া হল। উন্নয়নের নামে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে তথাকথিত যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ অর্থ হল ইট ও পিচের রাস্তা– আর ছোট-বড় হাজার হাজার সেতু। অভ্যন্তরীণভাবে যেমন বিপুল আবাদি জমি কমে যেতে থাকল তেমনি পুরো পানিপ্রবাহ সংকুচিত হতে হতে শুকিয়ে যাওয়া ও অনাকাঙ্ক্ষিত জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এর সাথে বিভিন্ন ধরনের জলাভূমিগুলো ভরাট ও তার সঙ্গে নদীর সাথে বিদ্যমান সংযোগপথগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, কথিত অর্থকরী ফসলের জন্য জলাশয়গুলোতে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি স্থলভাগের প্রাকৃতিক পানি-প্রতিবেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অপরিকল্পিত শহরের বিস্তার, বালু ভরাট ও ভূমিদস্যুরা বিভিন্ন স্থানে জমি ও পানির যে প্রাকৃতিক অবস্থান তা একেবারেই বদলে দিয়েছে।

অপরিকল্পিত শিল্প স্থাপন ও কৃষিতে পানির ব্যাপক ব্যবহার ও দূষণ পানি-দুষ্প্রাপ্যতাকে ক্রমেই প্রকট করে তুলেছে। দূষণমুক্ত মিষ্টিপানি/সুপেয় পানি সাধারণ ভাবে পানীয়জলে সংকট থেকেই দেখা দিয়েছে।

তিন.

নদী বা নদী-সংশ্লিষ্ট পানিপ্রবাহে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের অভিমত: (এক্ষেত্রে প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং পরিসর বিবেচনায় মাত্র ৩/৪ জনের মতামত নিয়েছি)

'Most of the rivers in Bangladesh originate or pass through India before they reach Bangladesh. During the 2nd half of the 20th century, India built many diversion structures on those rivers and started withdrawing water for irrigation in the arid and semiarid regions. These diversions or restriction of flow in the rivers let lesser flows down into Bangladesh. This resulted in death of many smaller rivers and jeopardized the whole

water management system in Bangladesh. This had serious consequences to the life of people in this country.’ (Inamul, 2008, p.19)

অর্থাৎ ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি নিজেদের দখলে নিয়ে নেওয়ার ফলে বাংলাদেশের পুরো পানি-ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে ও ছোট ছোট অনেক নদীর মৃত্যু ঘটেছে। এবং ফলে বাংলাদেশের জনগণ এখন পানিবঞ্চিত হয়ে সব থেকে বড় বিপদের সম্মুখীন। ভারত এখন বাংলাদেশের প্রাপ্য জল অপহরণকারী হিসেবে ভয়ংকর এক জলদস্যুতে পরিণত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ‘The Khulna Division i.e., Kushtia, Meherpur, Chuadanga, Jhenidah, Magura, Jessore, Satkhira, Khulna and Bagerhat districts are entirely dependent on the Ganga River. The surface water source arrives through the Mathabhanga River, which flows to the old bed of Bhairab River. The entire river network of this division is made of the Mathabhanga-Bhairab complex and their branches. The groundwater source of this division arrives entirely from the Ganga River deep percolation to the Dhupi Tila aquifers.’ (Inamul, 2010, p-14) এবং ফারাক্কার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘The dispute between India and Bangladesh over before 1975 was recorded between 65,000 to 70,000 cusecs at Hardinge Bridge. After commissioning of the barrage, flow inside Bangladesh reduced drastically. The distributaries of Ganga, named Baral, Mathabhanga, Gorai & Chandana dried up early because of the barrage operation. Sudden reductions of flow in the following years led to silting of their off-takes and catastrophic damage in the environment in their dependent areas.’ (ibid, 2010, p-9)

বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চল আজ যে মরুকরণ প্রক্রিয়ার অধীনে চলে গেছে তা উপরের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝে নেওয়া যাবে।

‘বাংলাদেশে ৭১০টি ছোটবড় নদীর মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী, যার ৫৪টি ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। বার্ষিক গড়ে ১০,৭৩, ১৪৩ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি ভারত-নেপাল থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্ত রীণ বৃষ্টিপাতের ফলে ২, ৫০, ৪০১ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি বাংলাদেশের নদী-নালা-খাল-বিল-জলাশয়গুলো পেয়ে থাকে। বরাক-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদীর মধ্য দিয়ে যথাক্রমে ১৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার, ৭০০ বিলিয়ন ঘনমিটার ও ৫০০ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হয়। ভারত সরকার সকল আন্তঃসীমানা নদীর (Transboundry river) উপর বাঁধ নির্মাণের ফলে শীত মৌসুমে নদীগুলোর পানি

অতিমাত্রায় নেমে যায়। এমনকি এর ফলে উত্তরবঙ্গের মরুকরণ শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মরা নদীর সংখ্যা ১90টি এবং ৯৯% নদীর গভীরতা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। (বিশ্বাস, ২০১১, পৃ. ১১৪)

ফারাক্কার প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন :

ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় পদ্মার পানিপ্রবাহ কমতে কমতে আজ নিম্নতর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এককালের প্রমত্তা পদ্মা বর্তমানে শুকনো মৌসুমে মানুষ পায়ে হেঁটে পার হচ্ছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিকট নদী ভরাট হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে গ্রীষ্মকালে শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীকে একটি খাল বলে মনে হয়। (ঐ, পৃ. ১১৯)

ইতোপূর্বে দেখা গেছে, ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণাক্ততার কারণে শীতকালে ইরি-বোরো চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। ইতোমধ্যে লবণাক্ততার কারণে সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন বিপদাপন্ন প্রায়।' (ঐ, পৃ. ১১৫)

'বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদনদীগুলো এখন দ্রুত নাব্যতা হারাচ্ছে। এটি ঘটছে পার্শ্ববর্তী শক্তিধর দেশের একগুঁয়েমি মনোভাব নিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে। এর ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। জীব-বৈচিত্র্যের ওপর ভীষণভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিরাট একটি অংশে মরুময়তার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই দেশটি হয়ে উঠেছে খরাপ্রবণ। ভয়াবহ এই প্রক্রিয়া থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে।' (সিদ্দিকী, ২০১২, পৃ. ৯৫)

'ভারত থেকে আসা ৫৪টি নদীর উজানে একাধিক ড্যাম ও বাঁধ নির্মাণ করে ভারত শুষ্ক সময়ে প্রাপ্ত পানির ৯০ ভাগ প্রত্যাহার করে। শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহের হার কমতে কমতে এখন ১০ ভাগে পৌঁছেছে।

ফারাক্কার প্রভাব :

– অনেকগুলো নদী মরে গেছে
– কয়েক বছরের মধ্যে আরো অনেকগুলো নদী মরে যাবে
– ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে
– ভূ-উপরিস্থ পানির দুস্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে
– মরুকরণের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে
– নৌ-পথ চলাচল সঙ্কুচিত হয়েছে
– ভূ-উপরস্থ পানির সংকট দেখা দিয়েছে

ইত্যাদি ইত্যাদি' (এলাহী, ২০১০, পৃ. ৪৮)

সকলেই ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহার ও ফারাক্কার ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ-গবেষকরা ভারতের পানি আগ্রাসন নিয়ে কোনো ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। সুতরাং সমস্যাটা নিশ্চিতভাবে 'জাতীয়'। শুধু পানিসমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আর মূল্যায়ন যথার্থ হবে না। ভারত বাংলাদেশকে মরুর দেশে পরিণত করতে পারবে শুধুমাত্র পানি-অস্ত্র ব্যবহার করেই। অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে এই পানি-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় এ কথা মনে করা যাবে না। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যেমন; The Farakka Barrage gates come under operation by mid September. Soon after the Ganga Flows in Bangladesh experiences sudden drop, and the Gorai off-take gets de-linked. A Ganga Barrage in Bangladesh located near the off-take of Gorai River can only be remedy to this problem. The diversion flow towards this river would remove silt from bed automatically. (Inamul, 2010, p.15)

এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে নদীপ্রবাহের বাধাগুলো যা মনুষ্যসৃষ্ট তা সঙ্ঘবদ্ধ গণশক্তি ও প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় শক্তি (জনস্বার্থে সৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া কতটা কার্যকরী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে) প্রয়োগ করে দ্রুততার সঙ্গে অপসারণ করতে হবে ও দেশের জলাভূমি যা ইতোমধ্যেই অভ্যন্তরীণ পানিদস্যুদের কব্জায় তা উদ্ধার করে জনগণের মালিকানায় ন্যস্ত করতে হবে। এছাড়াও জনগণের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিষয়টি অনেক বড় যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। কেননা পানিসম্পদের মালিকানা একটি মৌলিক প্রশ্ন।

একটি বিষয় আমাদের পরিষ্কার থাকতে হবে তা হল ভারত সব মৌসুমেই পানি একইভাবে আটকে রাখতে পারবে না। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে যে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে সেটিও ভারতের নিয়ন্ত্রণে নেই।

পানিসম্পদের ওপর পানিদস্যুদের হামলা ও পানিকেন্দ্রিক শক্তিশালী একটি শ্রেণীর অভ্যুদয়।

ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহার ও তার ফলাফল জলবায়ু পরিবর্তন ও পানির ওপর তার প্রভাব, নদীভাঙ্গন, নদীতে চর পড়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নদীর প্রবাহ কমে যাওয়া ও মজে যাওয়া, ফারাক্কা ও তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কাছে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে আমাদের সতর্ক করেছেন। যদিও আগে এ বিষয়ে প্রায় কোনো বই বা গবেষণাপত্র পাওয়াই যেত না– এই মাত্র কয়েক বছর হল মাত্র ২/৩টি ইংরেজি বই ও ৫/৬টি বাংলা বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। গবেষণাপত্র আকারে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়ে থাকলেও সে সব ক্রেতা অনুযায়ী বণ্টন হয়ে থাকতে পারে। বিশ্বব্যাংক-এডিবি-র হেফাজতে

আমাদের দেশের পানির ওপর প্রচুর গবেষণাপত্র আছে বলে মনে করি। তাছাড়া এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছেও এইসব গবেষণাপত্র আছে।

ভারতীয় পানি আগ্রাসন ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে পানি ও পানির অবস্থানগুলোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক লুণ্ঠন চলছে কয়েক দশক ধরে– অবশিষ্ট পানিকাঠামো ধ্বংস ও ক্রমাগত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পানি-অবস্থান বিলুপ্ত ও তার ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটিয়ে।

নদীর প্রবাহ ও জলাভূমি, জলাধার, জলাশয়সমূহের প্রাকৃতিক অবস্থান ধ্বংস-বিপর্যস্ত করে তুলছে দেশের অভ্যন্তরের একশ্রেণীর মানুষের সীমাহীন লোভ ও মুনাফার সীমাহীন তাগিদ– একেবারেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তারা।

এখানে মাত্র কয়েকটি সুপরিচিত লুণ্ঠনপ্রক্রিয়ার চিত্র অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

আবাসন খাতের ভূমি-লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় জলাভূমির ক্ষতি : যাদেরকে দেশের সংবাদপত্রই অভিহিত করেছে ভূমিদস্যু হিসেবে :

এই ভূমির সিংহভাগই হল প্রাকৃতিক জলাভূমি। খাল-বিল-নদী-নালা আমাদের বহুল পরিচিত এই সব পানিউৎসসমূহ ক্রমাগত দখল করে মাটিভরাট প্রক্রিয়া চলছে ২/৩ দশক ধরে ব্যাপক হারে। রাজধানী ঢাকার আশেপাশের সব ধরনের প্রাকৃতিক জলাভূমি ভরাট করতে গিয়ে এইসব জল-অবস্থানগুলোর সাথে বিভিন্ন ছোট বড় নদীর যে প্রবাহ-সম্পর্ক ছিল তা ধ্বংস করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রবাহের যোগাযোগ রক্ষাকারী চ্যানেলগুলোই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। এই সরকারের পূর্ত প্রতিমন্ত্রী একসময় খুব হাঁকডাক শুরু করেছিলেন– ভূমিদস্যুদের শায়েস্তা করবেন এই রকমই কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যেই ভূমিদস্যুদের একজন প্রধান দলপতি উল্টো প্রতিমন্ত্রীকে এমন কষে এক ধমক লাগালেন যে প্রতিমন্ত্রীর কণ্ঠই যেন চিরতরের জন্য রোধ হয়ে গেল। সেই সময়কার সংবাদপত্রে মন্ত্রী মহোদয়ের করুণ পরাজয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার নিজ দলের ক্যাবিনেট ও সংশ্লিষ্ট সাংসদরা তার পাশে দাঁড়াননি।

ঢাকাতেই রয়েছে আবাসন খাতের এই ভূমিদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি– তাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক জোটের খুবই প্রয়োজন, তারা সমাজের শীর্ষ অবস্থানেই আছেন এবং তাদের দুষ্কর্ম তারা চালিয়েই যাচ্ছে।

তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ সারা দেশে শত শত আবাসন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে– এদের প্রধান লক্ষ্য প্রাকৃতিক নিচু জায়গা। এবং অতিসহজেই তা তারা নিয়ন্ত্রণে নিতে পারছেন।

লবণাক্ততা এক ভয়াবহ অভিশাপ

ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলাফল তো আছেই তার সাথে যোগ হয়েছে জাতীয় স্বার্থের জন্য বিরাট ক্ষতিকারক একটি অধ্যায়– লবণপানিতে চিংড়ি চাষ। আমাদের সমুদ্র তটরেখা কমবেশি ৭২০ কি. মি.। এর মধ্যে প্রধানত সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটের দক্ষিণাঞ্চল ও কক্সবাজারের কিছু এলাকাতে চিংড়ি চাষ বেশি হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলে মিষ্টিপানির স্বাভাবিক প্রবাহকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। শুধু প্রবাহসমস্যা নয় মিষ্টিপানিই এখন হটে গেছে লোনাপানির দাপটের কাছে।

অসংখ্য ছোট নদী একেবারেই দখল হয়ে গেছে

ছোট ছোট নদী আর বাঁকে বাঁকে চলে না। একে তো নদীর মৃত্যু হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য নদী-খাল-বিল-জলাশয় প্রবাহসহ দখল করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। চেনা যায় না এক সময় এখানে পানি ছিল– প্রবাহ ছিল। অসংখ্য ছোট ছোট সেতু ও দু'ধারে পাকা স্থাপনা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে প্রবাহের শেষ সম্ভাবনাকে।

'অনেক সময় মানবসৃষ্ট বাঁধ, ড্যাম, রিজার্ভর ইত্যাদি কারণে নদীতে বাধার সৃষ্টি হলে নদী শুকিয়ে যায়।' (বিশ্বাস, ঐ, পৃ. ৯৬)

নদীতে আড়বাঁধ– জেলেরা উৎখাত

মাঝারি-ছোট-বড় সব নদীই এখন তো প্রায় বছরের সব সময়ই রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কবজায় থাকে। আড়বাঁধ বা পাটা দিয়ে নিজেদের মধ্যে হরির লুঠ চলে। মৎস্যচাষ করে ক্ষমতাবানদের মাস্তানরা। জেলেরা রোজ হিসেবে কোথাও কোথাও কামলা খাটে। প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জেলেরাও উৎখাত হয়ে গেছে।

পানির বিভিন্ন খাতসহ নদীপ্রবাহের এক প্রধান শত্রু : অপরিকল্পিত সেতু ও রাস্তা নির্মাণ

সারা দেশে নদী বা পানির অন্যান্য প্রবাহের উপর একেবারেই খেয়ালখুশি মতো অসংখ্য (এর কোনো সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে– সেই সাথে কালভার্ট। নদীর প্রাকৃতিক পরিসরকে ভরাট করে ক্ষুদ্র পরিসরে নির্মিত এমনটি দৃষ্টিসীমার মধ্যে একাধিক সেতু দেখা যাবে। যে যখন ক্ষমতাবান তার নেতৃত্বে যদি রাস্তা বা সেতু নির্মাণ না-হয় তবে তিনি ব্যর্থ। তবে এর প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস হল দুর্নীতি। দুর্নীতির ব্যাপক প্রবাহ নদীপ্রবাহকে হত্যা করেছে। পানির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে বিবেচনায় না-এনে যত্রতত্র পাকা রাস্তা নির্মাণপ্রক্রিয়ায় অজস্র ছোটবড় পানিপ্রবাহ ধ্বংস হয়ে গেছে।

রেলপথ নয়, নদীপথ নয়– যে সব দেশ গাড়ি বেচবে তাদের সহায়তায় ছোট দেশটির ভূমি ও পানিপ্রবাহ ধ্বংস-সাধন হয়ে চলেছে উন্মত্তের মতো।

সবুজ বিপ্লব ও নদীর মৃত্যুবরণ

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধসহ স্লুইস গেট নির্মাণ বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লব এনেছে বটে, কিন্তু চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা অঞ্চলসহ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর নদ-নদী। (সিদ্দিকী, ২০১২, ভূমিকা)

প্রথাগত পানি-ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা

বিষয়টির সাথে কোটি কোটি মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষদের পানীয়জলের যে সমস্যা তার সম্পর্ক রয়েছে– যা সম্ভবত অফিসিয়াল কর্মকর্তাদের কেউ কেউ স্বীকার করতেও সংকোচ বোধ করতে পারেন। গভর্নমেন্টালি হয়তো অন্যতম কারণ। দেখা যায় পানি বা পানিসংকট নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে অফিশিয়াল কর্মকর্তারা সরকার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তালিকা দিয়ে দেবেন। মনে করি পুরো পানি-ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা সম্পর্কে অতি সামান্য কিছু বক্তব্য থাকুক।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে উপনিবেশিক জমানা থেকেই। In order to expand irrigated agriculture and to transport the agricultural products through water ways, the British rulers made systematic engineering intervention. And even after the end of British rule in South Asia, the European knowledge base continued to be operational guide the increasing number of engineering intervention in water system (Jayanta, 2007, p-865).

তিনি আরো বলেন, এখনকার দিনে অন্যতম এক সমস্যা হচ্ছে Interdisciplinary knowledge base-এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে না-পারা।

এখন দেখা যাচ্ছে, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিশ্বব্যাংক-এডিবির প্রাধান্য বেড়েই চলেছে। সেই একই কথা– উন্নয়ন। আর উন্নয়ন করতে হলে পানি-গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য দূরীকরণ। দক্ষিণ-এশিয়ায় এ যাবত যত পানি-গবেষণা হয়েছে তার প্রধান গবেষণাপত্র বা প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য সব থেকে বেশি জমা আছে এডিবির তত্ত্বাবধানে। তবে গবেষকরা কেউ কেউ বলছেন এখন আসল সমস্যা হল, মনে হয় এ ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে তেমন পার্থক্য থাকবার কথা নয়। The challenges in water management is rooted in the common objective of all countries poverty alleviation and sustainable development. আর এ লক্ষণ দক্ষিণ-এশিয়ায়– বাংলাদেশে প্রকট। তবে কথা হল তারা তো প্রথাগত

ধারাবাহিকতাকে বড়জোর সমসাময়িক করতে চান। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তাছাড়া নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের সমস্যাও তো তুচ্ছ করার নয়। এসব বিতর্ক মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে হয় না।

উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই যে বড় ধরনের ক্ষতি আমাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে– সে কথা ইনামুল হকও উল্লেখ করেছেন; Water resources is being abused, misused and polluted by men in the name of development (Inamul, 2008, p-251). উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি প্রকল্প ও কনসালটেন্সি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবশ্য এর বেশি কিছু তিনি বলেননি।

তিনিও পানি-ব্যবস্থাপনার প্রথাগত ধারাটির বিবরণ দিয়েছেন; The Bangladesh Water Development Board is sector mainline organization in this country has a long past; in the state administration. It carries the legacy of the Irrigation Department of the British Rule and irrigation Directorate of Pakistan (Inamul, 2008, p-334).

এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে কেন্দ্র করে অভিযোগের ভাষায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে; Emerging paradigm shift or to change policy প্রসঙ্গে তাঁরা বলছেন; The case of South Asia, as much or most erstwhile colonies, is distinguished by not-so-clear link between the recent advances in water system knowledge and actual practices in water management, by design or otherwise, open professional criticisms, so much needed for the growth or water science any where, were overpowered by institutional hierarchy (Jayanta, 2007, p-865). (নূর মোহাম্মদ, ২০১১)

ক. বাংলাদেশে ছোট-বড় অসংখ্য জলাভূমির মৃত্যু; সংজ্ঞা সমস্যা :

ম. ইনামুল হক তাঁর প্রথম বই Water Resources-এর ৮ নং অধ্যায় Haors & wetlands সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি হাওর-বাওড়-এর সংজ্ঞা দিলেও Wetland-এর সরাসরি কোনো সংজ্ঞা দেননি। তবে তিনি এই প্রশ্নে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার বিশ্ব সম্মেলন সম্পর্কে বলেন, Bangladesh accepting the 1971 Ramsar Waterfowl Conservation in Iran,... (ঐ, পৃ. ২২০) আমার মনে হল তিনি নিজে সরাসরি সংজ্ঞা দেওয়াটা এড়িয়ে গেছেন। আমি তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করি। তিনি আমার ধারণা অস্বীকার না-করে বললেন, রামসার সম্মেলনে জলাভূমির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে রোপা ধানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে এবং অবশ্যই জলাভূমিতে পাখির উপস্থিতি থাকবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে প্রাকৃতিক যে বৈশিষ্ট্য তার সাথে মানব হস্তক্ষেপ/আর্টিফিশিয়াল ব্যবস্থা যোগ হল। অর্থাৎ ধানগাছ যদি না-থাকে তবে লাগাতে হবে। তিনি মনে করেন জলাভূমি হবে সেই স্থান যেখানে বছরের কোনো না কোনো সময় পানি থাকলেই চলবে তবে জলজ পাখির উপস্থিতি

থাকতে হবে। এই পাখি দেশীয়ও হতে পারে পরিযায়ী/অতিথি পাখি হতে পারে। অর্থাৎ যে কোনো জল-অবস্থানেই তো পাখি থাকে না বা আসে না।

খ. জলাভূমি

অগভীর জলাশয় যেখানে বছরের বেশিরভাগ সময়েই জল থাকে তাকেই জলাভূমি বলা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মৎস্য ও বন্যপ্রাণী পরিবেশ দফতরের সংজ্ঞা অনুযায়ী জলাভূমি জল ও স্থলের অন্তর্বর্তী একটি ব্যবস্থা যেখানে জলস্তর (water table) মাটির সমতলে অথবা মাটির খুব কাছাকাছি থাকে অথবা ভূমি অগভীর জলের তলায় থাকে। এই জলাভূমির অন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্তত একটি থাকা প্রয়োজন, তা হল : (ক) এই অঞ্চলে বছরের কিছু সময় মূলত জলজ উদ্ভিদ (hydrophytes) জন্মায়, (খ) নিচের মাটি মূলত জলসম্পৃক্ত মাটি (hydric soil) ও (গ) নিচের স্তর মাটি নয় এবং জলসম্পৃক্ত অথবা বছরের কিছু সময় অগভীর জলের তলায় থাকে। মোটামুটি এই সংজ্ঞায় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের জলাভূমিকে চিহ্নিত করা যায়। (রায় ও চক্রবর্তী, ২০১০, পৃ. ৮১)

গ. জলাভূমি

এটি একটি নিম্ন ও আর্দ্র এলাকা এবং এখানে প্রায়শই মেসোসিরি বা আর্দ্রজ উদ্ভিদ ও হাইড্রোসিরি বা জলাভূমির উদ্ভিদ দেখা যায়। সাধারণত কোনো হ্রদের অববাহিকা বা তলদেশ ক্রমে ভরাট হয়ে বিল বা জলা কিংবা জলাভূমিতে পরিণত হতে পারে। জলাভূমিতে প্রচুর 'হিউমাস' থাকে বলে উর্বর কৃষিভূমি হিসেবে আদর্শ। বিল বা জলার সঙ্গে জলাভূমির মূল পার্থক্য হল বিলে কোনো উদ্ভিদ থাকে না। তিনি জলাশয় বলতে নিয়ন্ত্রিত জল রাখার স্থানকে বুঝিয়েছেন। (বিশ্বাস, ২০১১, পৃ ১৭)

ঘ. জলাভূমি :

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে জলাভূমির প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। ইরানের রামসার শহরে ১৯৭১ সাল অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জলাভূমির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তা ইংরেজিতে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জলাভূমির সংজ্ঞা নিরূপণে বলা হয়েছে যে, জলাভূমি প্রধানত কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্রোতস্বিনী বা স্থিতিশীল, সুপেয় মৃদু লবণাক্ত অথবা বেশি লবণাক্ত জলাধার যেখানে ভাটার সময় জলের গভীরতা ছয় মিটারের মতো হয় না। (ধনঞ্জয়, ২০০৮, পৃ. ২৭-২৮)

ধনঞ্জয় রায়ও মনে করেন, শতকের পর শতক বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্বের শাসকগোষ্ঠী মানুষের উপকারের জন্য বড় বড় দিঘি বা জলাশয় খনন করেছেন।

পরবর্তীতে জমিদাররা ও ধনী ব্যক্তিরাও বড় বড় দিঘি খনন করেছেন। অর্থাৎ তিনি মনে করেন জলাশয় মানে মানুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জলাধার।

অশোক বিশ্বাস মনে করেন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে জলাধার বা জলাশয় নির্মিত হয়। এখানে তিনি 'খনন' সম্পর্কে কিছু বলেননি। (বিশ্বাস, ঐ, পৃ. ১৭)

মোদ্দা কথা হল জলাভূমি বাংলাদেশের এক বিরাট এলাকা জুড়ে বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে বর্ষাঋতুতে এর সংখ্যা এবং এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়। অধিকাংশ জলাভূমি থেকে মাছ, পানি, পাখি ও উদ্ভিদ উধাও হয়ে গেছে। নদীর সাথে বিরাট বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশের জলাভূমির ওপর প্রভাব ফেলে।

বিস্তৃত জলাভূমি বোঝাতে বাংলায় বিল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিলযুক্ত স্থান নাম ও বাংলাদেশে অনেক। এছাড়া বাংলাদেশে অনেক বিলও রয়েছে। যেমন– বিল ডাকাতিয়া, কাকসারি বিল, চলন বিল ইত্যাদি। (বিশ্বাস, ঐ, পৃ. ২৩)

অজস্র ছোট-বড় জলাভূমি হাওর-বাওড় এখন অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। সেই মাছ, পাখি, উদ্ভিদ ও বিশেষ মাটি মাত্র কয়েকটি জলাভূমিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সিলেটের সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে অধিকাংশ প্রধান জলাভূমির অবস্থান। হাওর, বাওড়, বিল ইত্যাদি জলাশয়ের আন্তঃসম্পর্ক ও বিভিন্ন নদী-নালার সঙ্গে কম-বেশি প্রবাহভিত্তিক যে সব সম্পর্ক ছিল তা প্রায় ক্ষেত্রেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

পানিখাতে একটি শক্তিশালী লুঠেরা আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর আধিপত্য ও শ্রেণীসংগ্রাম

নদী, নদীপ্রবাহ, জলাভূমি, বিল ইত্যাদি বা সামগ্রিক অর্থে পানি-খাতকে কেন্দ্র করে আজ যে বাংলাদেশে প্রধানত কয়েক দশক ধরে অবাধ লুণ্ঠনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে সে ব্যাপারে আমি অনেক আগেই নিশ্চিত থাকলেও এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম লিখিত ধারণা ব্যক্ত করি আগেই উল্লেখ করা *হালখাতার* বিশেষ সংখ্যাটিতে।

পানি ও শ্রেণীসমস্যা

'পানি ও পানিসম্পদকে কেন্দ্র করে পানি উন্নয়ন বোর্ড, হাওর ও ওয়েটল্যান্ড উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বি.এ.ডি.সি, এল.জি.ই.ডি, ওয়াসা, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত হয়েছে মূলত উন্নয়নের জন্যে– এই দাবিই ধনিকশ্রেণীর সরকার ও রাষ্ট্র করে থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বড় বড় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা যারা নিজেরা ও বিদেশিদের সাহায্যে ক্রমাগত পয়দা করে 'প্রকল্প'; প্রকল্প মানে দাতা-অর্থদাতাদের গভীর সংশ্লিষ্টতা। এসে যায় উপদেষ্টা বা কনসালট্যান্ট, যোগ হয় 'প্রেসারগ্রুপ' ও ঠিকাদাররা। আর প্রতিটি সরকারের সময় অবধারিতভাবে এসে যাবে 'দলীয়

হিস্যাহস্ত'। সারাদেশে 'পানি-মাফিয়া' দানবীয় এক চক্রে পরিণত হয়েছে। একেবারে জমজমাট গণবিরোধী একটি শ্রেণী। বনাম কে? কেন? জনগণ, তারা ছাড়া আবার কে? পানি তো তারাই বেশি পান করে থাকে, ফসল উৎপাদনের জন্য পানি গরিব মানুষের তো কম প্রয়োজন হয় না। হয়ে গেল দুটি পক্ষ। উলঙ্গ হতে থাকল পানি নিয়ে ব্যবসার বিকট চেহারা। হাজার হাজার কোটি টাকার লুটপাটের বিশাল এক ক্ষেত্র। লুট, একেবারে নৃশংস লুট। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পানি, বিশেষত খাবার পানি নিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দেশের নানা স্থানে, নানাভাবে, উদ্ভূত নানা বিষয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে শরিক হচ্ছেন। নদীশাসন, সমুদ্রশাসন, খাল-বিল শাসন, পানিক্রেতা শাসন, মৎস্যজীবী শাসন এবং শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই পানি-শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত, শোষিত ও বহুস্থানে উদ্বাস্তু। যত দিন যাচ্ছে যত পানি-সংকট বৃদ্ধি পাবে– ততই পানি নিয়ে শোষণ-নির্যাতন চলবে-চলবেই।' (নূর মোহাম্মদ, ২০১১)

বাংলাদেশে এমন একটিও অর্থসংশ্লিষ্ট খাত খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যেখান থেকে একটি গোষ্ঠী রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণে বিপুল লুণ্ঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ছ্যাবলা ধরনের আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদী শ্রেণীর অংশ হিসেবে সংগঠিত হয়নি বা হচ্ছে না। পানি, জ্বালানি (বিদ্যুৎসহ), রেল, যোগাযোগ ও সড়ক, এলজিইডি, বিমান, বস্ত্র, পাট, চিনি, শিক্ষা, বিচার, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীসমূহ, ব্যাংক, বীমা, শেয়ারবাজার, তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি, গণপূর্ত, খাদ্য, বন ও পরিবেশ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, মৎস্য, বন্দর, পররাষ্ট্র ইত্যাদি ইত্যাদি– প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যত ধরনের বিভাগ-উপবিভাগ আছে সর্বত্র দেখা যাবে কম-বেশি একই চিত্র। এছাড়া ব্যাংকঋণ ও তা ফেরত না-দেয়া ইত্যাদি তো আছেই। এখন দেখা যাচ্ছে হলমার্কের মতো ব্যাংকলুট বা যুবক, ডেসটিনি ইত্যাদি নামে প্রকাশ্যে দিন-দুপুরে ডাকাতি করে শত শত-হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়া যাচ্ছে। বেশ কয়েক দশক বড় বড় এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি সাহায্যে দেশের অন্যতম ধনিকগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এনজিওদের একটি বড় অংশ বিদেশি অর্থায়নের প্রকল্পগুলোতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। কেননা বিশ্বব্যাংক ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো এনজিও ও সিভিল সোসাইটিকে তাদের উন্নয়ন সহযোগী/অংশীদার মনে করে থাকে।

দেখা যায় রাষ্ট্রের কর্মকর্তা অর্থাৎ আমলারা বিদেশি রাষ্ট্র (তাদের প্রতিনিধি), অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের সাথে প্রথমেই জড়িত হতে পারেন। এদের চারপাশে একদল সুবিধাভোগীদের বলয় সৃষ্টি হতে থাকে। এরা রাজনৈতিক দল ও সরকারের বড় বড় চাঁইদের কখনো প্রকল্পের অংশে ভাগ দেয়, কখনো সরাসরি ক্রয়। সংসদে ও সচিবালয়সহ যেখানে মধু সেখানে এদের লবিস্ট থাকে। এদের সহায়তায় বিদেশি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতে পারবে। সরাসরি যুক্ত হওয়ার রাস্তাও এখন উন্মুক্ত। বহুজাতিক কোম্পানি, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান যেমন এডিবি বা জাইকা এদের প্রতিনিধিদের সাথে এরা যুক্ত হয়– অনেকে দীর্ঘ বছর ধরে যুক্ত আছে। ইদানিং

মিডিয়ার কিছু লোক ও শক্তিশালী লবিস্টরা সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েছে। উন্নয়ন ও প্রকল্পের সঙ্গে কনসালট্যান্ট-সব মিলে হরির লুঠ। এত ক্ষুদ্র পরিসরে এই আলোচনা সম্ভব নয়, তবে কিছুটা আলোকপাত করা হল। এরাই প্রথমে গোষ্ঠী থেকে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীতে পরিণত হয়। এরা সকলেই একটা বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ– বিদেশি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এ দেশের আসল মালিক।

পানি : শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম

ইনামুল হক FCD & FCDI Projects, অধ্যায়ে সরাসরি দুর্নীতির ভয়াবহ চেহারা তুলে ধরেন। FCD nj To check flood and tidal surge, flood control and drainage এবং এর মধ্যে কিছু প্রকল্প রয়েছে যেখানে provided with irrigation facilities are called FCDI Project. এ প্রসঙ্গে তাঁর এই অধ্যায়ের একটি অনু শিরোনাম হল :

Conflict Mangement

In FCD projects added with or without irrigation, the initial conflict arises between the executing agency and the project affected people, who suffer loss of land or eviction. The process of compensation is highly corrupt and frustrating; while no proper rehabilitation process has arrived yet. So, the conflict is resolved by the traditional method of using force of the state machinery.

The classical conflict between the haves and have-nots appear as soon as the project starts operation. This conflict is between the beneficiaries at the hub, and people at the margins who receive unequal services. This conflict can only be resolved by efficient project operation, but this remains a dream all the time. (Rivers & Water Issues, 2010, p-96)

এখানে তিনি পরিষ্কার করেই বলে দিচ্ছেন যে, কোনো পানিপ্রকল্প বাস্তবায়িত করতে গেলে সেই ধ্রুপদী বিরোধ অর্থাৎ যাদের আছে এবং যাদের নেই তাদের মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে একেই আমরা শ্রেণীসংগ্রাম বলব। তিনি যোগ্য প্রকল্প কার্যকারিতার প্রসঙ্গ তুলেও বলেছেন এটি স্বপ্ন মাত্র। তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফলাফল হচ্ছে 'যোগ্য প্রকল্প কার্যকারিতা' বাস্তবে আদৌ সম্ভব নয়।

২০০৪-এ প্রধান প্রকৌশলী পদে উন্নীত হওয়ার পর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা :

In my experience by then, I found the water sector of the country as a whole run in chaos all the time. There need no proof that among projects implemented so far in any sector in this country, many were anti-people. Those projects uprooted poor people from their homes; but the criminals

got rich becoming contractors, and the politicians & officials became owners of cars, flats & properties. Many of those projects are traceless, some have debris only, but together stand colossal burden over the people in terms of project loans. Cunning politicians, inefficient consultants & greedy officials were responsible for proposing & implementing those projects.

দাঁড়াচ্ছে, ইতোমধ্যে যে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে তার অধিকাংশই গণস্বার্থবিরোধী। প্রকল্প করতে গিয়ে গরিব মানুষরা ভূমিহারা হলেও ক্রিমিনালরা ধনী হয়ে ঠিকাদার হচ্ছে। এবং এই ঠিকাদার, রাজনীতিবিধ ও আমলারা, বাড়ি ও সম্পদের মালিক হয়ে গেছে।
অসংখ্য প্রকল্পের কোনো পাত্তাই নেই। লুঠপাটের জন্য এইসব প্রকল্প তৈরি করা হয়। ধূর্ত রাজনীতিবিদ, লোভী কর্মকর্তা ও অসৎ উপদেষ্টারা মিলেই এইসব প্রকল্প তৈরি করে।

If a project is needed on public interest, the responsible field officer would propose it. A project is definitely anti-people when it enters the Ministry being promoted by an interest group. This group can be politicians or bureaucrats or the investors themselves. Many projects in the country are promoted by ADB or World Bank; those projects are of their interest. And in my opinion, many projects in this country funded by ADB or World Bank were anti-people.
তিনি বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান অথবা চীন কোনো প্রকল্পের প্রস্তাবক হলে তা অবশ্যই জনগণের স্বার্থবিরোধী হবেই বলে মন্তব্য করেন : It is hard to see promoters interest in projects of people's interest. (২০১০, পৃ. ১৬৮-৬৯)

তথ্যসূত্র

১. কপিল ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশ নদ-নদী ও পরিকল্পনা*, ১৪১৪, সংহতি, বাংলাদেশ পৃ. ১৪-১৬

২. গ. Inamnul Haque, *Water Resources, Management in Bangladesh*, 2008,
Anushilan, Chudanga.

৩. গ. Inamul Haque, *River & Water Issues, Perspective Bangladesh*, 2010,
Anushilan, Chudanga & Dhaka.

৪. ড. অশোক বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নদীকোষ*, ২০১১, গতিধারা, ঢাকা

৫. মাহবুব সিদ্দিকী, *ফিরিয়ে দাও সেই প্রবাহ*, ২০১২, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

৬. শেখ ফজলে এলাহী, *আন্তর্জাতিক নদী-আইন ও বাংলাদেশ-ভারত পানি বিরোধ*, ২০১০, ইত্যাদি গ্রন্থ
প্রকাশ, ঢাকা
৭. মোহিত রায়, ভূপতি চক্রবর্তী, *পরিবেশ*, ২০১০, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা
৮. ধনঞ্জয় রায়, পশ্চিমবঙ্গের দিঘি ও জলাশয়, ২০০৮, পত্রলেখা, কলকাতা
৯. Jayanta Bandyopadhayay, Water System Management in South Asia need
for a research framework, *Economic & Political Weekly*, March, 2007
১০. নূর মোহাম্মদ, ২০১১, হালখাতা, জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা, ঢাকা

[লেখক: নূর মোহাম্মদ : বাম ধারার রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক ।]

প্র ব ন্ধ

ফারাক্কা সমস্যা: বাংলাদেশের দাবির আইনগত ভিত্তি

মি জা নু র র হ মা ন

ফারাক্কা সমস্যা নিরসন সংক্রান্ত বাংলাদেশের যে কোনো দাবির মূল আইনগত ভিত্তি নির্ভর করে গঙ্গার আন্তর্জাতিক চরিত্রের ওপর। দুই বা তার অধিক রাষ্ট্রের উপর দিয়ে যে কোনো নদীর আইনগত অবস্থা নির্ধারিত হয় প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার নদী-তীরবর্তী কোনো একক রাষ্ট্রের আইনের আওতাধীন নয়। এরূপ নদী কোনো একক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র কিংবা অভ্যন্তরীণ

জলরাশির অন্তর্ভুক্তও নয়। গঙ্গাও একটি আন্তর্জাতিক নদী। এর অববাহিকা চীন, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে বিস্তৃত। ভৌগোলিক অর্থেই গঙ্গা অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক নদী। এবং যে কোনো আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সকল নিয়মই নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা, কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের স্থানীয় আইন দ্বারা নয়।

একটি আন্তর্জাতিক নদীর ওপর তীরবর্তী সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত। একটু ভিন্নভাবে বলা যায় যে প্রত্যেকটি তীরবর্তী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এমনভাবে আন্তর্জাতিক নদীকে ব্যবহার করা যেন অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সহজাত অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ন না-হয়। যে দেশের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত, নদীর সে অংশের পানি সে দেশের পক্ষে যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত নয়। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিশারদ অধ্যাপক ওপেনহেইম বলেন, "কোনো রাষ্ট্রকে নিজ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করতে দেয়া হবে না যার ফলে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।" আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছে আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বে আন্তর্জাতিক আইন ইন্সটিটিউট।

আন্তর্জাতিক নদী সংক্রান্ত এরূপ বিধান বিখ্যাত কিছু মামলার রায়েও সমর্থিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে Lake Lanoux মামলার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় যে আন্তর্জাতিক নদীর প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের ধারা এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না যার পরিণতি তীরবর্তী অপরাপর রাষ্ট্রের জন্যে মারাত্মক হতে পারে। এরও পূর্বে ১৯৯২ সালে Wyoming Vs. Colorado ১৯২৫ সালে Chicago Diversion Case মামলায় আদালত স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে আন্তর্জাতিক নদীর একচেটিয়া ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী এবং এরূপ নদীর স্থানীয় অংশের ওপর তীরবর্তী কোনো রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমত্ব কার্যকর হতে পারে না।

একইভাবে একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি ব্যবহারের ব্যাপারে ভারতের কার্যকলাপ বাংলাদেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে, দেশের অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে, যা প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক আইনের উলঙ্গ লংঘন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারত বাংলাদেশের নিকট তাই দায়ী, এবং উপরে উল্লেখিত বিখ্যাত মামলাসমূহের রায় বাংলাদেশের দাবির ন্যায়সঙ্গতাকেই প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে।

দুই.

আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বেশ কিছু সম্পাদিত চুক্তির আলোকে ফারাক্কা প্রশ্নে ভারত কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইন লংঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২১ সালে সুদান ও মিসরের মধ্যে সম্পাদিত 'নীল নদ চুক্তিতে' উল্লেখ করা হয় যে, সুদান কর্তৃক নীল নদে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না যা মিসরীয়

স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। তেমনিভাবে ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত ‘সিন্ধু উপত্যকা চুক্তি’তেও ঘোষণা দেয়া হয় যে, তীরবর্তী একটি রাষ্ট্র এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে যা অপর তীরবর্তী একটি রাষ্ট্রে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বিঘ্নিত করতে পারে। চুক্তির এরূপ শর্তে আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিমালারই প্রতিফলন ঘটেছে। ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ, আন্তর্জাতিক নদীর প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক জলপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সন্দেহাতীতভাবে আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি-বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন, এবং তাই ভারত বাংলাদেশের নিকট দায়ী।

তিন.

গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ ও একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের ভারতীয় আচরণ মূলত Harmon Doctrine-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। তদানীন্তন মার্কিন এটর্নি জেনারেল Judson Harmon-এর নামে অভিহিত এই নীতির মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অসীম এবং তাই নিজ ভূখণ্ডে এমনকি আন্তর্জাতিক নদীকেও একটি রাষ্ট্র ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে এবং তার ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের কারণে কোনোভাবে সংকুচিত করা যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৮৯৫ সালে রিও গ্রানডে নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে মেক্সিকোর কৃষকেরা যে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলতদসংক্রান্ত মার্কিন দায় নির্ধারণের জন্য এটর্নি জেনারেল হারমোনের মত চাওয়া হলে তিনি অসীম সার্বভৌমত্বের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এরূপ মতের পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো রাষ্ট্র হারমোন নীতিকে কখনো অনুসরণ করেনি এবং এমনকি রিও গ্রান্ডে প্রশ্নেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে মেক্সিকোকে ছাড় দিতে বাধ্য হয়।
হারমোন নীতি কখনোই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আইনের স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি এবং বর্তমান সময়ের চাহিদায় নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। এই নীতির ওপর রচিত ভারতীয় দাবিও তাই আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য।

চার.

যে কোনো আন্তর্জাতিক নদীর ওপর তীরবর্তী সকল রাষ্ট্রের অধিকার সমঅংশীদারিত্বের নীতির ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক নদী-সম্পদের তীরবর্তী রাষ্টসমূহের মধ্যে সুষম-বণ্টনের নীতি আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলনে এবং ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিয়ুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে (১৯৪৮ সালে নবায়িত) এই নীতির উল্লেখ রয়েছে। ১৯৬৬ সালে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন সমিতির এক সাধারণ সভায় আন্তর্জাতিক নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Helsinki Rules প্রণীত হয়।

এই নীতিমালার ১৫ নং অনুচ্ছেদেও উল্লেখ করা হয় যে প্রত্যেকটি তীরবর্তী রাষ্ট্র তার সীমানায় আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের ব্যবহারে অধিকার ভোগ করবে যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গতার ভিত্তিতে। পানি সম্পদের সুষম বণ্টনের নীতি ১৯৭২ সালে স্টকহোম অনুষ্ঠিত 'মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনফারেন্সে'র ঘোষণাপত্রের ৫১ নং অনুচ্ছেদে স্থান লাভ করে। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারত যেভাবে শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে তা এক কথায় আন্তর্জাতিক আইন বা রীতিনীতির পরিপন্থী।

পাঁচ.

এটা অনস্বীকার্য যে একটি রাষ্ট্র তার সীমানায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক নদীর ওপর যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যদি এরূপ কার্য অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না-করে। কিন্তু কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের আপাত বৈধ কাজও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। ১৯৪৯ সালের বিখ্যাত Corfu Channel মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত তার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করে যে একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ কখনোই এমনভাবে হতে পারে না যার বিরূপ প্রভাব সেই রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অনুভূত হতে পারে। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার রায় ফারাক্কা সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবির আইনগত ভিত্তিকে আরও মজবুত আসনে বসাতে সক্ষম।

নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে গঙ্গার উপর ফারাক্কার বাঁধ নির্মাণ অবশ্যই ভারতের সার্বভৌম অধিকার। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে এই অধিকার কোনোক্রমেই অসীম নয়। বরং বাঁধের যে নেতিবাচক প্রভাব সীমান্তের অপর পাড়ে অনুভূত হচ্ছে, তার ফলে এই সার্বভৌম অধিকার তার বৈধতা হারিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত রীতিনীতির লংঘনের দায়ে ভারতকে অভিযুক্ত করা সম্ভব।

ছয়.

আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পদ্ধতিগত আইন ভঙ্গের ভারও ভারতকে বহন করতে হবে। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনে এটা স্বীকৃত যে আন্তর্জাতিক নদীর উপর কোনো প্রকল্প নির্মাণের পূর্বে, বিশেষ করে সেই প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া যদি বিরূপ হতে পারে বলে আশংকা থাকে, নির্মাণকারী রাষ্ট্র অপর তীরবর্তী রাষ্ট্রকে সে সম্পর্কে 'অগ্রিম-অবহিত' (Prior-Notice) করবে। এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিরসন না-হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে নির্মাণকারী রাষ্ট্র বিরত থাকবে। বলাই বাহুল্য, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

অথচ ভারত এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্বকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে। ভারত নিজ দায়িত্বে কখনো ফারাক্কা নির্মাণ সম্পর্কে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারকে অবহিত

করেনি এবং পরবর্তীতে কোনোরূপ সমঝোতায় উপনীত না-হওয়া সত্ত্বেও একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে চলে।

সাত.

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের পরিবেশে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের অধীনেও ভারত তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক প্রাকটিস বাংলাদেশের দাবির ভিত্তি স্বরূপ কাজ করতে পারে। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যেকার 'কলোরাডো নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবার ফলে মেক্সিকোর কৃষিতে ক্ষতি'র সৃষ্টি হলে মেক্সিকোর প্রবল প্রতিবাদের মুখে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ আইন পাশ করে এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৭৩ সালের Nuclear Test Case মামলার আন্তর্জাতিক আদালতের অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও ভারতের দায় প্রমাণ করা দুষ্কর নয়। প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রান্স কর্তৃক পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা থেকে পরিত্রাণের আশায় এই মামলার উৎপত্তি। আদালত তার রায়ে উল্লেখ করে যে কোনো রাষ্ট্র নিজস্ব এলাকা বা উন্মুক্ত সমুদ্র এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না যা অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে। এবং তাই ফ্রান্সকে এরূপ পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে এরূপ অবৈধ কার্যের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্বও আজ সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। ১৯৪১ সালের Trail Smelter Air Pollution মামলায় কানাডায় অবস্থিত কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ার দ্বারা মার্কিন পরিবেশ দূষিত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কানাডাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে, ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পরিবেশে যে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে তার জন্য ভারত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শুধু দায়ীই নয়, বরং বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণের ভারও ভারতের ওপর বর্তাবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ফারাক্কার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতকে যদি আন্তর্জাতিক আদালতের সাহায্য গ্রহণে অথবা কোনো সালিসি আদালতের আশ্রয় প্রার্থনায় রাজি করানো যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির আলোকে বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা ও ন্যায়সঙ্গতা প্রমাণ করা সম্ভব। একই সঙ্গে ইতোমধ্যে ফারাক্কা কর্তৃক সাধিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও অমূলক নয়।

আট.

ফারাক্কা প্রশ্নে ভারত কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন আরো এক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ভারতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি 'মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির অন্যতম ধারা অনুসারে চুক্তিবদ্ধ উভয় রাষ্ট্র এমন সকল কার্য থেকে বিরত থাকবে যা অপর রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতে পারে, এবং উদ্ভূত যে কোনো দ্বিপাক্ষিক বিরোধ/সমস্যা সমঝোতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসনের ব্যবস্থা করবে। কিছুটা ভিন্নভাবে বলা যায় যে, কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই সেই রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিজনিত দায় দ্বারা সীমিত। আন্তর্জাতিক এই রীতির পূর্ণ সমর্থন আন্তর্জাতিক বিচারিক সিদ্ধান্তেও প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯২৩ সালে বিখ্যাত Wimbledon Case-এ স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত তার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করে যে কিল খালের ওপর জার্মানির সার্বভৌম অধিকার জার্মানি কর্তৃক ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত ভার্সেই চুক্তির ৩৮০ নং ধারা সীমিত, এবং তাই আদালত খাল-সংক্রান্ত জার্মানির একচেটিয়া সার্বভৌম অধিকার নাচক করে খালের ওপর ফ্রান্স ইটালি, জাপান ও যুক্তরাজ্যের বিশেষ কিছু অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক। অধ্যাপক। চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।]

ফারাক্কা থেকে টিপাইমুখ : বাংলাদেশের ভূমিকা

বে ন জী ন খা ন

অবতারণা

অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার এক ধরনের অবসান হয়েছে; ভারতের টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করেছে গত ২২ অক্টোবর ২০১১ মনিপুর সরকার, ন্যাশনাল হাইড্রোপাওয়ার করপোরেশন

(এনএইচপিসি) লি. ও সুতলেজ জলবিদ্যুৎ নিগম (এসজেভিএন) লি.-এর মধ্যে সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এক ভাষণে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ হবেই, বরং বাংলাদেশ বিনিয়োগ করলে উৎপাদিত বিদ্যুতের শেয়ার পাবে। এর আগপর্যন্ত ভাটির দেশের আতংকিত মানুষ হিসেবে আমাদের ধারণা ছিল হয়তো-বা টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ হবে না, হয়তো-বা হবে এমনি নানামুখি সংশয় ছিল। এখন সে দোলাচলের অবসান ঘটেছে। টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ হচ্ছেই।

আমাদের জানা দরকার ভারতের অভ্যন্তরে সে দেশের সরকার তার নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করলে বাংলাদেশের কী আসে-যায় অথবা বাংলাদেশের কী করার আছে। কিন্তু তার আগে খোঁজ নেয়া দরকার, টিপাইমুখ আসলে কী? সেখানে কী হচ্ছে? এবং আমরা কেন উদ্বিগ্ন?

টুইভাই নদীর মুখ হল টিপাইমুখ। টিপাইমুখে বরাক নদীর সঙ্গে মিলিত হয় টুইভাই নদী। টিপাই শব্দটি টিইভাইয়ের অপভ্রংশ। টিপাইমুখ ভারতের মনিপুর রাজ্যের মিজোরাম সীমান্তের কাছে একটি অখ্যাত জনপদ। এটি চুড়াচন্দর জেলার একটি উপজাতীয় ব্লক। প্রায় ২৪ হাজার সংখ্যালঘু জাতিসত্তার লোক এখানে বাস করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই অবহেলিত ও গুরুত্বহীন এই জনপদ। কিন্তু বরাক নদীর পানিপ্রবাহের ক্ষেত্রে টিপাইমুখের গুরুত্ব অপরিসীম। বরাক নদীর উৎপত্তি হল মনিপুরের জাপভো পর্বতকৃঙ্গে। এর উৎসে রয়েছে অনেক পাহাড়ি ছড়া (যাদের মধে গোমতী, হাওড়া, কাগনি, সেনাই বুড়ি, হরিমঙ্গল, কাকরাই, কুরুলিয়া, বালিঝুড়ি, সোনাইছড়ি এবং দরদরিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)। উৎপত্তিস্থল থেকে টিপাইমুখ

পর্যন্ত বরাক নদী প্রবাহিত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে। টিপাইমুখের পর বরাক নেমে আসে সমতল ভূমিতে।

উৎস থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বরাক নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬৪ কিলোমিটার। বাংলাদেশে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ দিয়ে প্রবেশের পর বরাক নদী সুরমা ও কুশিয়ারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পরে আরো দক্ষিণে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী পুরনো ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলে সৃষ্টি হয় মেঘনা নদী। মেঘনা পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। মেঘনা শব্দের উৎপত্তি 'মেঘ' ও 'নাদ' শব্দদ্বয় থেকে। নাদ শব্দের অর্থ গর্জন। অর্থাৎ মেঘের গর্জনে যে নদী ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে, সে নদীই হল মেঘনা। এই মেঘনার আকার তাই উত্তর-পূর্ব ভারতে মেঘ বর্ষণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে বরাক নদী মেঘনার আদি পর্যায়। আর এ থেকে বুঝা যায়, বরাক বরফপুষ্ট নদী নয় বরং বৃষ্টিপুষ্ট নদী। শুষ্ক মৌসুমে এ নদী শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে তিন-চার দিন বৃষ্টি হলেই ধারণ করে ভয়ংকর রূপ।

টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের ইতিহাসঃ

১৯২৯ সালে কাছাড় উপত্যকায় প্রলয়ঙ্করী বন্যা দেখা দিলে টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু হয়। প্রস্তাব করা হয় টিপাইমুখে জলাধার নির্মাণ করে বন্যার সময় পানির প্রবাহ কমানো হবে।

* ১৯৫৪ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় পানি কমিশন টিপাইমুখে একটি বহুমুখী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা শুরু করে।
* ১৯৫৫ সালে বরাক নদীতে বাঁধ নির্মাণের জন্য মনিপুরের ময়নাধর অঞ্চলকে নির্ধারণ করা হয়।
* ১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা বদলে নারায়ণধর, তারপর ভুবনধরে এ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। পরে এ সিদ্ধান্ত বদলে যায়।
* ১৯৭৪ সালে টিপাইমুখে একটি বাঁধের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়।
* ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুত্র বোর্ড এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।
* ১৯৮২ সালে ভারত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগখালের মাধ্যমে গঙ্গার পানি বৃদ্ধির যে প্রস্তাব দেয়, তাতে টিপাইমুখ বাঁধের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল।
* ১৯৯৩ সালে বাঁধ নির্মাণ শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়, তবে ভারতের কিছু অঞ্চলে বিরূপ প্রভাবের কথা চিন্তা করে তখন থেমে যায় উদ্যোগটি।
* ১৯৯৫ সালে আবার তা গৃহীত হয়। কিন্তু
* ১৯৯৮ সালে তা নাকচ হয়ে যায় মনিপুর রাজ্য বিধানসভায়।
* ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে টিপাইমুখে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় North Eastern Electric Power Company (NEEPCO) বা নিপকোকে।

* ১৯৯৯ সালের ৯ জানুয়ারি মনিপুর রাজ্য সরকার টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে।

* ২০০৩ সালে বিশাল অঙ্কের প্রকল্প বাজেট পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়।

* ২০০৬ সালেই পরিবেশ সম্পর্কে অনাপত্তি সার্টিফিকেট-এর (Environmental Clearance Certificate) জন্য ভারতের পরিবেশ দপ্তরের কাছে আবেদন করে।

* ২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

* ২০০৮ সালে বাঁধের ডিজাইন চূড়ান্ত হয়।

* ২০০৮ সালের ২৮ জুলাই মনিপুর রাজ্য সরকার বাঁধের নিরাপত্তা ও নির্মাণসামগ্রী আনার জন্য আইন পাশ করে। পাশাপাশি বাঁধ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মনবাহাদুর রোডের প্রতি সাত কিলোমিটার পরপর সামরিক পাহারা বসায়।

* ২০০৮ সালের ২৪ অক্টোবর প্রকল্পটির পরিবেশ ছাড়পত্র দেয়া হয়। এবং এ কাজের জন্য ভারতীয় সেনাবহিনী পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মাঝে কাজ থেমে ছিল। এখন এই বাঁধ নির্মাণের নতুন উদ্যেগ নিয়েছে ভারত।

একনজরে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পে :

বাঁধের প্রকার	: মাটির ড্যাম, ভেতরের অংশ পাথরের।
উচ্চতা	: ভূমি থেকে ১৬১ মিটার, সমুদ্র সমতল থেকে ১৮০ মিটার।
দৈর্ঘ্য	: ৩৯০ মিটার।
পানিধারণ ক্ষমতা	: ১৬ বিলিয়ন ঘন মিটার।
সর্বোচ্চ রির্জাভ লেভেল	: ১৭৮ মিটার।
নির্মাণব্যয়	: ১০৭৮ কোটি ভারতীয় রুপি।
পুরো প্রকল্পের মোট ব্যয়	: ৫১৬৩.৮৬ কোটি ভারতীয় রুপি।
উদ্দেশ্য	: প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্য ছিল বরাক উপত্যকায় পানি ধারণের মাধ্যমে ২০৩৯ বর্গমিটার এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা। পরে এর মাধ্যমে ১৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।
কাজের সময়সীমা	: ২০১২ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পেছনে ভারতের যুক্তি:

২০০৬ সালে পরিবেশ সম্পর্কে অনাপত্তি সার্টিফিকেটের জন্য পরিবেশ দপ্তরের কাছে দেয়া আবেদন থেকে জানা যায় ‘প্রকল্পটির লক্ষ্য হল ১৬২.৮ মিটার উঁচু পাথর দিয়ে ভর্তি বাঁধ, যা ১২৭৫৬ বর্গমিটার আয়তনের অববাহিকার বৃষ্টির পানি আটকাবে। এর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগাওয়াট। এ বাঁধের ফলে

বন্যা নিয়ন্ত্রণের খাতে ভারতীয় মুদ্রায় ৪৫.৭০ কোটি রুপির সাশ্রয় হবে। পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ফলে ২৩১ কোটি রুপির ফসল উৎপাদন বাড়বে ও বাঁধ এলাকায় মাছ চাষ করে বছরে ১৪ কোটি রুপির মুনাফা হবে। নৌ-চলাচলের সুবিধা হবে এবং বাঁধ এলাকায় পর্যটনের সুবিধা সম্প্রসারিত হবে।

টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক:

এ প্রকল্পের বিপক্ষে উপদ্রুত উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে মনিপুর রাজ্যের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আপত্তি রয়েছে। এই আপত্তির কারণ প্রধানত চারটি।

প্রথমত, প্রস্তাবিত বাঁধটি নিরাপদ নয়। টিপাইমুখ ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অতি স্পর্শকাতর এলাকা। এখানে নিয়ত চলছে মহাদেশীয় ভূতাত্ত্বিক প্লেটের সংঘাত এবং ভূমির অধোগমন অর্থাৎ নিচের দিকে বসে যাওয়া। এ প্রকল্পের উদ্যোক্তরাও এ সমস্যা স্বীকার বরেন। ফলে এই ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বেশি। উদ্যোক্তাদের হিসাবে এখানে রিকটার স্কেলে ৭-এর বড় ভূমিকম্প ১৬টি হয়েছে। এর মধ্যে দুটি অত্যন্ত বড়, রিকটার স্কেলে এদের পরিমাপ ৮.৫-এর বেশি এবং এ দুটি ভূমিকম্প দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ভূমিকম্পের তালিকায় র্অন্তভুক্ত। একটি গবেষণায় দেখা যায়, ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটি ক্যালিফোর্নিয়া, জাপান, মেক্সিকো, তাইওয়ান ও তুরস্ক সহ বিশ্বের ছয়টি প্রধান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার অন্যতম।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্প অঞ্চলে আদিবাসিদের চিরকালীন জীবনযাত্রার জন্য এটি একটি বড় হুমকি। কেননা এই বাঁধের ফলে ৬৭টি গ্রামের প্রায় ৪০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর মধ্যে ১৫ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭টি গ্রামের মধ্যে ১৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের প্রকল্প ইতোমধ্যে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যার একটি হল ত্রিপুরায় গোমতী নদীতে ডুম্বুর বাঁধ। অপরটি হল মনিপুরে অবস্থিত ইথাই বাঁধ বা লোকটাক প্রকল্প। ডম্বুর বাঁধের কারণে ৪৬.৩৪ বর্গ কি.মিটার ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। ৮ থেকে ১০ হাজার পরিবারের প্রায় ৬০-৭০ হাজার লোক উদ্বাস্তু হয়েছে। এইসব ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা এখন স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

চতুর্থত, প্রস্তাবিত বাঁধ পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এই বাঁধ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। মনিপুরে নাগা মহিলা ইউনিয়নের সম্পাদিকা আরমান পামে এক খোলা চিঠিতে লিখেছেন, 'মনিপুর রাজ্য জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক সম্ভাবনাময় অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে দুর্লভ জীববৈচিত্র্যের সম্পদ রয়েছে। এই প্রকল্পে তলিয়ে যাবে বিচিত্র, অচেনা ও দুর্লভ উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল ও সমৃদ্ধ জিনের সম্পদভাণ্ডার।'

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক

কারণে টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে চায়। স্থানীয় জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভারত সরকার ইতোমধ্যে অনেকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছে। এরমধ্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মুনাফার একটি বড় হিসসা মনিপুর পাবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রতিটি পরিবারকে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বছরে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত বিদ্যুতের আয়ের এক শতাংশ ও রাজ্য সরকার সমপরিমাণ ক্ষতিগ্রস্তদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করবে।

ভারত সরকারের এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও টিপাইমুখ বাঁধ সম্পর্কে সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে মতানৈক্য নিরসন সম্ভব হয়নি। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি হওয়ার কারণে তাদের আন্দোলন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। তবুও তারা হরতাল, মিছিল, সভা ও আবেদন-নিবেদন করে তাদের বক্তব্য পেশ করে চলেছে।

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধের প্রতিক্রিয়া :

বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ হলে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে নানাদিক থেকে প্রথমত, রাজনৈতিক দিক থেকে। এই বাঁধ দুদেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ রাজনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করবে যা শান্তিকামী মানুষের জন্য মোটেও কাম্য নয়।

দ্বিতীয়ত, এই বাঁধ বাংলাদেশের পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। বিরূপ প্রভাব ফেলবে নদীতে, পানিতে, মাছে, বৃষ্টিতে, সবুজ বনায়নে, সমাজ-সংস্কৃতিতে। এই বাঁধের ফলে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা নদীতে বর্তমানে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় বর্ষার মৌসুমে তা শতকরা ২৫ ভাগ কম পানি প্রবাহিত হতে থাকবে আর শীতকালে সুরমা, কুশিয়ারা নদীতে পানিপ্রবাহের পরিমাণ কমে যেতে পারে বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ। এর ফলে বাংলাদেশের একটা উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে শীতকালে বা রবি মৌসুমে চাষের জন্য হবে বিরাট ক্ষতি। বিশেষজ্ঞদের আশংকা এই বাঁধ নির্মিত হলে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। অপরদিকে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনায় পানিপ্রবাহ কমে গেলে সিলেট ও ঢাকা অঞ্চলের ব্যাপক এলাকায় সমুদ্রের লোনাপানি ঢুকে যাবে। এই অবস্থায় ভারত আমাদেরকে বুঝাচ্ছে– এ প্রকল্পের ফলে বর্ষাকালে সিলেট অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ কমবে আর শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বাড়বে। আমাদের দুর্ভাগ্য এ রকম সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শকরা সমর্থন করেছিলেন। অথচ সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই একথা প্রমাণ করা সম্ভব যে এ ধরনের প্রকল্পে বাংলাদেশ কোনোভাবেই উপকৃত হবে না।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ করে বাংলাদেশে বন্যার তীব্রতা হ্রাস-সম্পর্কিত প্রস্তাব পরীক্ষা করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Peter Rogers-এর নেতৃত্বে USAID-এর একটি কারিগরি দল। Eastern Waters Study শিরোনামে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘দুটি কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতে

জলাধার নির্মাণ করে বাংলাদেশে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা যাবে না।

প্রথমত, বাংলাদেশে বন্যা হ্রাস করার জন্য এ ধরনের জলাধারে বিপুল পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশে এক মিটার বন্যা হ্রাসের জন্য ৬৬ বিলিয়ন কিউসেক পানি জমাতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প অবাস্তব।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দূরে জলাধারে পানি রাখলে তার প্রভাব বাংলাদেশের বন্যার ওপর পড়বে না। বাঁধের নিচে প্রবাহিত নদীর পানি গড়িয়ে এসে বর্ষাকালে বাংলাদেশের বন্যায় পানি সরবরাহ বাড়িয়ে দেবে।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভারতের আরো পরিকল্পনা:

ভারতের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণের আরো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে– ডিহিং বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদীর উপর), সুবানসিড়ি বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদীর উপর), লোহিত বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদীর উপর), যদুকাটা বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (মেঘনা শাখা-নদীর উপর), সোমেশ্বরী বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (বরাক নদীর-শাখার উপর), নোয়া ডিহিনং বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদীর উপর), কুলশী বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প (ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদীর উপর) ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রকল্পের কারণেই কম-বেশি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের ওপর। আমরা টিপাইমুখ নিয়ে চিন্তা করতে করতে বাকি প্রকল্পগুলো নীরবে এগিয়ে যাবে। বিশেষ করে যদুকাটা ও সোমেশ্বরী বাঁধ প্রকল্প দুটি নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকায় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

ভারতের আরও বাঁধ পরিকল্পনা:

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিমালয় অঞ্চলে ভারত ৭৪টি বাঁধ নির্মাণ করেছে। এছাড়া ভারত ৩৭টি বাঁধ আরো নির্মাণ করছে। ঐ গবেষণায় বলা হয়, আরো ১ লাখ ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আগামী ২০ বছরে ভারত ৩১৮টি বাঁধ নির্মাণ করবে। এপর্যন্ত ৪ হাজার ৩০০টি বৃহৎ ড্যাম বা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন এবং অনেকগুলো নির্মাণাধীন থাকায় ভারত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বাঁধ নির্মাণকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প :

ভারত ইতোমধ্যে এক বিশাল প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। যে প্রোগ্রামের নাম River Interlinking Project (ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প)। যা ভারতের সব নদী নিয়ে একটি জল সরবরাহ ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রচেষ্টা।

ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। ৩০টি সংযোগখাল দিয়ে ব্রহ্মপুত্রসহ অন্তত ৩৭টি নদীসংযোগের মাধ্যমে (যার সংযুক্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ কিলোমিটার) ভারত ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি আন্তঃসংযোগ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর অর্ধেক পানি প্রত্যাহার করে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রকল্প পরিবেশ বিপর্যয়সহ আমাদের অর্থনীতি ও সমাজজীবনকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দেবে।

এই নদীসংযোগ প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশের ফসলের উৎপাদন কমে যাবে। আর্সেনিক দূষণ বাড়বে। মরুকরণ বাড়বে। বনাঞ্চল ধ্বংস হবে। পানিসংকট বাড়বে। স্বাস্থ্যসমস্যা বাড়বে। সামুদ্রিক লবণাক্ততা বাড়বে। বিদ্যুৎখাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নদীব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হবে। প্রাণ-বৈচিত্র্য হারিয়ে যাবে। এছাড়া আরো নানা রকমের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এই ধরনের আগ্রাসী প্রকল্পের বিরুদ্ধে এখনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।

চাইলেই ভারত বাঁধ নির্মাণ করতে পারে না !

প্রথম কারণ, এর ফলে আন্তর্জাতিক নদী আইনের লঙ্ঘন হবে। বরাক যেহেতু আন্তর্জাতিক নদী সেহেতু ভারত একতরফা এই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করতে পারে না। ১৯৬৬ সালের হেলসিংকি নীতিমালার ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অববাহিকাভুক্ত প্রতিটি দেশ অভিন্ন নদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনা করবে। অন্য দেশের কোনো ক্ষতি না-হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ, ভারত-বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তিতে শুধু গঙ্গা নদীর পানি ভাগাভাগির কথা হয়নি। অভিন্ন অন্যান্য নদীর কথাও বলা হয়েছে। চুক্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে দুটি দেশ অভিন্ন নদীর পানি ভাগাভাগির জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে একমত হয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধ এই চুক্তিবিরোধী।

তৃতীয় কারণ, ১৯৭১ সালের ওয়েটল্যান্ড কনভেনশন, ১৯৭২ সালের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন, ১৯৯২ সালের বায়োডাইভারসিটি কনভেনশন অনুযায়ী একতরফাভাবে টিপাইমুখের মতো প্রকল্প গ্রহণের অধিকার ভারতের নেই।

চতুর্থ কারণ, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে,

'টিপাইমুখে ভারত এমন কিছু করবে না, যার ক্ষতিকর প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে।' যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য বাজে কথা না-হয়ে থাকে, তাহলে ভারত আজ একতরফা টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করতে পারে না।

মরণফাঁদ ফারাক্কা বাঁধঃ

মরণফাঁদ ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা, বিরোধিতা, বাঁধ নির্মাণ, চালু এবং এ নিয়ে দুদেশের মধ্যকার সম্পর্কে তিক্ততার সম্যক আমাদের স্মরণে আছে। ১৯৯৫ সালের ২৪ মার্চ বিশ্বের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বাংলাদেশের ঈশ্বরদীতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাপমাত্রার সূচক লক্ষ করলে দেখা যায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই তাপমাত্রা দিন-কে-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি একতরফা প্রত্যাহার।

১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল মাত্র দু'সপ্তাহের জন্য ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করার সময় বাংলাদেশকে অনুরোধ করে তার ফিডার ক্যানেলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য মাত্র ১১ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহারের অনুমতি দিতে। সেই শুরু। তারপর ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেল বাংলাদেশের লাবণ্য, সুখ। ৭৫ ফুট উঁচু ১০৯টি গেট সম্বলিত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের মানুষের জন্য প্রতিভাত হল মরণফাঁদ হিসেবে। সেই থেকে ভারত আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি করে একের পর এক একতরফা পানি প্রত্যাহার করে চলেছে। ফলে শুকিয়ে গেছে আমাদের পদ্মার ধারা। এর প্রভাবে গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে ৮০টির বেশি নদী শুকিয়ে গেছে। ফারাক্কা ব্যারাজ আমাদের সময়ে মানুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। এই বিপর্যয় বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক আঘাত হেনেছে। ৪০ মিলিয়ন মানুষ হয়েছে বিপর্যস্ত। প্রকৃতির ওপর পড়েছে বিরূপ প্রভাব। বিপন্ন হয়ে পড়েছে পরিবেশ। বিধ্বস্ত হয়েছে কৃষি, অর্থনীতি। মারা যাচ্ছে গাছ। বেড়েছে লবণাক্ততা। শুরু হয়েছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। আর এভাবেই তাপমাত্রা বেড়ে বেড়ে এই অবস্থায় পৌঁছেছে। সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে কৃষির। গঙ্গার পানি কমে যাওয়ায় ষাটের দশকে চালু হওয়া দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প (জিকে প্রজেক্ট) বন্ধ হয়ে গেছে ১৯93 সালে। এ প্রকল্পের অধীনে ৩ লাখ একর জমি সেচসুবিধা পেত। এতে ক্ষতি হয় ১০০ কোটি টাকার ফসল। রবি ও খরিপ ফসল হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। গাঙ্গেয় প্রবাহের ২০০ প্রজাতির মাছ ও ১৮ প্রজাতির চিংড়ি চাষ হয়েছে ব্যহত। হাজার হাজার ধীবর পরিবার দিন গুনছে মৃত্যুর। প্রায় ২০০ মাইল নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে বন্ধ হয়ে গেছে। শত শত মাঝিমাল্লা ছেড়ে দিয়েছে পেশা। ভূগর্ভস্থ পানি নিঃশেষ হবার পথে। পানির গুণ কমছে। জমি হারিয়ে ফেলেছে উর্বরতা। মোট কথা কৃষি, মৎস্য, বনায়ন, শিল্প, নৌপথ সব ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালের এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের এপর্যন্ত মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার । বাংলাদেশের একাংশের

জনগণ পৌঁছে গেছে দারিদ্র্য ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। যা মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারেরও চরম পরিপন্থী।

বাংলাদেশের সাথে ভারত কেন দাদাগিরি করে?

আমাদের জানা আছে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত ৫৭টি নদীর মধ্যে কেবল একটি বাদে সবক'টি নদীর উৎস ভারতে। এসব অভিন্ন নদীর মধ্যে ৫৪টির উজানে বাঁধ ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত একতরফা পানি সরিয়ে নিচ্ছে। এতেও ভারত সন্তুষ্ট নয় কেননা, বর্ষা মৌসুমে তাদের অনেক বাঁধই খুলে দিতে হয়, না-হলে নিজেরাই পানিতে ডুবে মরে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমেও যেন এই পানি ছাড়তে না-হয় সে জন্য এখন তারা গ্রহণ করেছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৫৪টি নদীর পানি ২০১৬ সালের মধ্যে ভারত সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেবে। প্রশ্ন হল কেন? ভারত আমাদের সাথে এহেন আচরণ করে কেন? আমরা তো খোদ আমেরিকাকেও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র মেক্সিকোর সাথে এমন আচরণ করতে দেখি না। কিন্তু ভারত করে কেন ? ভারত তো আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র! এর উত্তরে এই মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মরহুম মেজর এম.এ জলিলের নিবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। যেমন তিনি লিখছেন, "'ভারতপ্রীতি' দেশ ও জাতির মানসপটে 'ভারতভীতি' হয়ে জেগে উঠেছে। অহেতুক তো আর হয়নি। পেছনে রয়েছে নিশ্চিত কারণ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা ভারতপ্রীতির সূত্রে গেঁথে গেছেন, তাদের ভারতের বিরাটত্ব এতই মুগ্ধ করে ফেলেছে যে, 'ভারত মাতা কী জয়' বলতে পারলে যেন ধন্য হন তারা।" আমার ধারণা আমাদের এহেন আদিখ্যেতাই আমাদের ওপর ভারতকে দাদাগিরি করতে প্ররোচিত করে। আমরা জোর করে বলি ভারত আমাদের বন্ধু অথচ ভারত বাংলাদেশের চার পাশে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে, সীমান্তে গুলি করে মানুষ হত্যা করে প্রতিদিন বলে ভারত তোমাদের বন্ধু না। তারপরও আমরা বলব ভারত আমাদের বন্ধু! আর এতে করে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের মানুষের মনে জাগে প্রচ শঙ্কা। জাতির এই নতজানুপনা চেহারা দেখে মেজর জলিল আক্ষেপ করে আরো বলেছিলেন, 'যারা ভারতকেলিতে মত্ত, তারা দ্রৌপদীর জীবনসুখ ভোগে ধন্য হোক, স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নরকের কীট হয়েও স্বাধীন বাংলাদেশেই স্বকীয়তা সহকারে বাঁচতে চাই। স্বাধীনতাই আমাদের কাছে প্রিয়।'

উপসংহার

আমাদের মনে রাখা দরকার দুনিয়ায় তেলের যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, আসছে যুদ্ধ পানির জন্য, বীজ, জীব-অনুজীব, প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য। ইতোমধ্যেই সে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এই যুদ্ধের প্রথম বলি লিবিয়ার প্রয়াত নেতা গাদ্দাফি। ইরাক ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলেছে দজলা ও ফোরাত নদীর পানি নিয়ে।

আমার ধারণা বাংলাদেশের সাথে ভারতের আখেরি যুদ্ধ হবে পানি নিয়ে। পানিরই অপর নাম জীবন তাই পানির জন্য যুদ্ধ মানে জীবনের জন্য যুদ্ধ। ভারত সে যুদ্ধে নেমে গেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা দূর দেখতে পারি না। অথচ কী ভয়ংকার কালো মেঘ ধেয়ে অসছে আমাদের অনাগত শিশু বাচ্চাদের দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতার দিকে। কিন্তু আমরা এখনো নীরব। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হিসেবে সরকারের করণীয় নিয়ে এখনো জনগণকে অবহিত করেননি। মন্ত্রীবাহাদুরদের দুয়েকজনের মিডিয়ার সাথে বাতচিত দেখলে মনে হয় মেজর জলিলের উক্তির যথার্থতা রয়েছে। সরকার আর রাষ্ট্র সমর্থক নয়। টিপাইমুখ বাঁধ রাষ্ট্র এবং জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলবে অনাগতকাল ধরে। দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা জলবায়ুকে প্রভাবিত করবে। অর্থনীতির ওপর আঘাত হানবে।

ফারাক্কার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধের দায়িত্ব সরকারের। জনগণ বন্ধুত্ব চায়, দাসত্ব নয়। সুতরাং টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনগণকে ইস্পাতকঠোর ঐক্য নিয়ে প্রতিবাদমুখর হওয়ার এখনই সময়। আমাদের যোগাযোগ বাড়াতে হবে, সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে ভারতের ভুক্তভোগী আন্দোলনকামী মানুষের সাথে। পৃথিবীর দেশে দেশে আমাদের সমূহ বিপদে পাশে দাঁড়াবার মতো লবি বাড়াতে হবে। যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে পরিবেশবাদীদের সাথে। সরকারকেও রুখে দাঁড়াতে হবে এর বিরুদ্ধে। তবেই মুক্তি।

১০ ডিসেম্বর ২০১১

সূত্রঃ *প্রথম আলোঃ* আকবর আলী খান, *কালের কণ্ঠঃ* মামুন রশীদ, *নয়াদিগন্তঃ* এবনে গোলাম সামাদ, ড.সয়বাম ইবোটোবি, হাসান শরীফ, কাজী সাইদ, সিরাজুর রহমান, ডা.ওয়াজেদ এ খান, *ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প -বাংলাদেশের বিপর্যয়ঃ* বেনজীন খান, *ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশঃ* এ. বি.এম. আব্বাস এ.টি, *মেজর জলিল রচনাবলী*।

[লেখকঃ বেনজীন খান, প্রাবন্ধিক, গবেষক। মুখপাত্র, মুক্তিআন্দোলন, বাংলাদেশ ।]

প্র ব ন্ধ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নদীপ্রবাহ, জলাবদ্ধতা এবং পরিবেশ বিপর্যয়

আ মি রু ল আ ল ম খা ন

নদীর দেশ বাংলাদেশ

একদা নদীমাতৃক বাংলাদেশ এখন প্রায় নদীহীন, জলশূন্য। মাত্র ৪০ বছর আগে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতালগ্নে যে দেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ছিল প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার, মাত্র ১৪ বছর পর, ১৯৮৪ সালের হিসাবে তা কমে দাঁড়ায় ৮৪০০ কিলোমিটারে, এবং এখন তা মাত্র চার হাজার কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে। এই যে চার হাজার কিলোমিটার নৌপথ তারও বেশিরভাগই নাব্য থাকে সাগর-জোয়ার-জলে। উজানের প্রায় সব প্রধান প্রধান নদী বর্ষাকাল ছাড়া নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের নদনদীর প্রধান ধারা তিনটি–গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা। এর মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র-যমুনার প্রধান ধারা মেঘনার মাধ্যমে সাগরসঙ্গম। তিস্তা, ধরলার পানিও এ পথেই মিশে। একেবারে স্বতন্ত্র উল্লেখযোগ্য জলধারা হল কর্ণফুলি। ছোট ছোট অসংখ্য শাখা কিংবা উপনদী সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ নামক এই বদ্বীপীয় দেশটিকে। জালের মতো তার বিস্তৃতি, গোটা দেশ জুড়ে। সব মিলিয়ে প্রায় ৮১৩ নদী (ম. ইনামুল হক, পৃ. ২৫) দিয়ে গড়া বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে স্বীকৃত। তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র, হিমালয়ের গঙ্গোত্রী গঙ্গার আঁতুড়ঘর। নাগা পাহাড়ে মেঘনার জন্ম।

বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড, যার মোট আয়তন ১.৪৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, তার উপর দিয়ে বছরে ভূখণ্ডের মোট আয়তনের ১৫ গুণ বেশি পানি প্রবাহিত হয়। এমন সুজলা দেশ পৃথিবীতে প্রায় নজিরবিহীন, অথচ দেশ জুড়ে এখন পানির হাহাকার, প্রায় সারা বছর।

পানির ওপর প্রাণীর সার্বভৌম অধিকার

পানি শুধু প্রাকৃতিক সম্পদই নয়, পানি জীবনের উৎস। তাই পানির অপর নাম জীবন। পানির ওপর প্রাণীর জন্মগত অধিকার, সে অধিকার সার্বভৌম। ক্ষমতাবানরা সে অধিকার খর্ব করে চলেছে। সাধারণ মানুষের সার্বভৌম অধিকারকে কেড়ে নিয়ে শুরু করছে পানির অন্যায় বাণিজ্য। এখন তারা আয়োজন করছে পানির যুদ্ধ। বলা হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে পানির জন্য।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদনদী

আমরা এখানে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদনদী, জনজীবন, সংকট ও জলাবদ্ধতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বলতে আমরা প্রধানত খুলনা বিভাগকে বুঝাচ্ছি।

পদ্মা হল গঙ্গার বাংলাদেশ অংশের নাম। রাজশাহীতে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ববাহী, মূল প্রবাহ গোয়ালন্দে যমুনার সাথে মিশে চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মা, তারপর সে মেঘনা নামে সাগরে পতিত হয়েছে। কিন্তু তার চলার পথে সে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ববাহী অসংখ্য নদীর জন্ম দিয়েছে যা দিয়ে জালের মতো বাঁধা গোটা খুলনা বিভাগ। জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, চূর্ণী, ইছামতী, কালিন্দী, যমুনা, কোদলা, সোনাই, গাঙনি, কাজলা, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, গড়াই, মধুমতী, বলেশ্বর, রাইমঙ্গল, হরিণঘাটা, কালীগঙ্গা, মুচিখালি, চন্দনা, ব্যাঙ, ফটকি, ডাকুয়া, বেতনা, খোলপেটুয়া, আড়পাঙশিয়া, মরিচ্চাপ, মালঞ্চ, শালিখা, কলাগাছিয়া, হারিয়া, মামুদো, বাঁশতলী, মুক্তেশ্বরী, টেকা, হরিহর, শ্রীনদী, ভদ্রা, বুড়িভদ্রা, সাতনল, সালতা, শোলমারি, তেলিগাতি, হামকুড়ো, ময়ূর, ঘ্যাংরাইল, মজুদখালী, আতাই, আঠারোবেঁকি, রূপসা, মংলা, পশুর, শিবসা, মার্জাল, ঢাকি, মেনস, সাহেবখালি, কদমতলী, কাকশিয়ালী, দাউদখালী, কুমারখালী, সাগরখালী, কয়রা, দড়াটানা, ছ'বাঁকি, খোরমা আরও কতশত ছোটবড় নদী।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীপ্রবাহ

পদ্মা-মধুমতী জলপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান জলপ্রণালী, বলা যায় এই অঞ্চলের প্রাণভোমরা। পদ্মার অন্যতম প্রধান শাখা মাথাভাঙা। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মুন্সিগঞ্জে মাথাভাঙার জন্ম। সেখান থেকে দর্শনা চেকপোস্ট পর্যন্ত মাথাভাঙার দৈর্ঘ্য ১৬০ কিলোমিটার। চুয়াডাঙ্গা, দামুড়হুদা হয়ে দর্শনার সুলতানপুর ও জয়নগর গ্রামের মাঝ দিয়ে ইছামতী নামে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করেছে। কৃষ্ণগঞ্জে এসে তার এক শাখা চূর্ণী নামে ভাগিরথীতে মিশেছে। মাথাভাঙার প্রধান প্রধান শাখা কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা এবং কপোতাক্ষ। ভৈরব মাথাভাঙার একটি উপনদী। মেহেরপুরের মধ্য দিয়ে দামুড়হুদার সুবলপুরে ভৈরব আবার মাথাভাঙায় মিলিত হয়েছে। সুবলপুর থেকে ১৪

কিমি মাথাভাঙা নামে প্রবাহিত হয়ে দর্শনায় একটা বড় বাঁক নিয়ে আবার ভৈরব নামে তার আত্মপ্রকাশ।

আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের কাছ থেকে মাথাভাঙা থেকে উৎপন্ন নদ কুমার। তারপর মাথাভাঙার আরেকটি শাখা নবগঙ্গা। মাগুরার উত্তরে মুচিখালির মাধ্যমে নবগঙ্গা কুমারের সাথে মিশে নবজীবন লাভ করে। কুমার পূর্বদিকে গড়াই অতিক্রম করে চন্দনার সাথে মিশে। চন্দনা পদ্মার এক শাখা।

একজালের দীর্ঘ নদ ভৈরব। শত শত বছরে বিবর্তিত ভৈরব একদা পদ্মা থেকে উদ্গত এক নদ ছিল, উজানে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় যেখানে শ্রুতকীর্তি মিশেছে পদ্মায়, ঠিক তার ভাটি থেকে। আরও পরে পদ্মার সাথে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়। তখন মেহেরপুর জেলার সুবলপুরে মাথাভাঙ্গা থেকে ভৈরবের নতুন পরিচিতি হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভৈরব জল পেত নদীয়ার জলাঙ্গী থেকে। মাত্র পঞ্চাশ বছরেই আপার ভৈরব শুকিয়ে বুড়ি ভৈরবে পরিণত হয়, লোয়ার ভৈরব টিকে থাকে কোনো রকমে। নোয়াপাড়ার ভাটিতে জোয়ার-ভাটা জানান দেয় এককালে ভৈরবই ছিল নিম্নবঙ্গের প্রাণভোমরা। ভৈরবের অন্য শাখা বোয়ালমারি থেকে নোয়াপাড়ার পূর্বপাশ দিয়ে চলিশিয়া হয়ে মিশত মুক্তেশ্বরীতে। পরে ভবদহের পূর্বদিকে মোড় নিয়ে সে জামিরার পশ্চিমপাশ দিয়ে মিলত বিল ডাকাতিয়ায়, তারপর থুকড়ো, আমভিটা হয়ে হামকুড়ো নদীতে। ভৈরবের আরেক শাখা রাজঘাট, ভুলোপাতা বিল হয়ে ধোপাখোলার মিলিত স্রোত ফুলতলা, পয়গ্রাম-কসবা এবং শিকিরহাট থেকে বুড়োডাঙ্গি, দামোদর হয়ে নামত বিল ডাকাতিয়ার শোলমারিতে। পশ্চিমবাহী অন্য শাখাটি আমভিটা, হামকুড়ো হয়ে মিশত ভদ্রায়। এভাবে পূর্ব-পশ্চিমবাহী শ্রীনদীর শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে জালের মতো একটি প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ভারতে রেলপথ

প্রাকৃতিক এই জলপ্রবাহে পড়ল মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি মালিকানার পাশাপাশি নদীশাসনের কাজেও হাত দেয়। তারা সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় আমাদের মিষ্টিপানির মূল উৎস গঙ্গা থেকে পূর্ববাংলার অন্য নদীগুলোকে পৃথক করার কাজ শুরু করে। ভূমি উদ্ধারের নামে সুন্দরবন উজাড় করাও শুরু করে তারা। পরের বছর ১৭৯৪ সালে তারা হস্তক্ষেপ করে ভৈরবের প্রবাহপথে, চৌগাছার তাহিরপুরে যেখান থেকে রেনেলের মানচিত্র অনুযায়ী কপোতাক্ষের জন্ম।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৫৪) পরাধীন ভারতে রেলপথের সূচনা। ১৮৬২ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কলকাতা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত রেলপথ উদ্বোধন করে। এই লাইনকেই ১৮৬২ সালে দর্শনা হয়ে জগতী (কুষ্টিয়া) পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া হয়ে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলপথ বসাতে ইছামতী, ভৈরব, চিত্রা,

নবগঙ্গা ও কুমার নদীর গতিপথে সেই প্রথম মানবসৃষ্ট বাধা (রেলব্রিজ) তৈরি হল এদেশে। দর্শনায় জংশন নির্মাণ করতে ভৈরবকে বিচ্ছিন্ন করা হল মাথাভাঙা নদী থেকে। ১৮৬২ সালে আসাম বেঙ্গল রেললাইন স্থাপনের সময় দর্শনায় ভৈরব নদের উপর অপ্রশস্ত রেলব্রিজ নির্মাণ করা হয়। তখন ভৈরব ছিল তীব্র গতিসম্পন্ন। রেলব্রিজ নির্মাণের সুবিধার্থে মেহেরপুরের উজানে আপার ভৈরব বেঁধে দেয়া হয়। এভাবে নদীর উপর সংকীর্ণ ব্রিজ নির্মাণের ফলে এসব নদীতে পানিপ্রবাহ কমে যায়। ১৮৭১ সালে কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত ৭৫ কিমি রেললাইন স্থাপন করা হয় কুষ্টিয়ার নিকট গড়াই নদের উপর সেতু নির্মাণ করে। ১৯১৪ সাল নাগাদ শেষ হল পদ্মার উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ। তার জন্য নদীশাসন করে তাকে সংকুচিত করা হয়। সকল ক্ষেত্রে নদীর ৮০ ভাগই বেঁধে ফেলা হয়। অথচ ব্রিটিশরা নিজ দেশে নদ-নদী রক্ষা করেছে পরম যত্নে। এ প্রসঙ্গে মার্কসের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা... ।" পুঁজিবাদী অতি উৎপাদন এবং তার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পপণ্যের বাজারজাতকরণে বুর্জোয়া ইংরেজ হেন অপরাধ নেই যা এদেশে করেনি। নদীর প্রবাহ ধ্বংস তারই একটি অংশ মাত্র।

রেলপথ চালু হবার পর ব্রিটিশ সরকার নৌপথের সকল পৌর্তিক কাজ বন্ধ করে দেয়। রেলপথের পাশাপাশি জোর দেয় সড়ক যোগাযোগের ওপর। হাসেম আলী ফকির লিখেছেন, "রাজপথ রেলপথ নির্মাণের সময় নদী ও নিষ্কাশন খালগুলোকে আরও সংকুচিত করা হয় ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ করে।"

'ভৈরব বাঁচাও' আন্দোলন

ভৈরবে মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হয় প্রথমে ১৭৯৪ সালে চৌগাছার তাহিরপুরে। যশোরের কালেক্টর কপোতাক্ষে বাঁধ দিয়ে জলপ্রবাহ ভৈরবে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার বছর পঁচিশেক পর নদীয়ার কালেক্টর শেক্সপিয়র দর্শনার নিকট প্রায় বৃত্তাকার মাথাভাঙার বাঁক সোজা করে দেন। ফলে ভৈরব পার্বত্য প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়, মূল জলস্রোত প্রবাহিত হয় মাথাভাঙা দিয়ে।

রূপচাঁদ সাহা নামক এক লবণবণিক খুলনার নিকট ভৈরবের সাথে কাঁচিপাতা নামক ক্ষুদ্র নদীর সংযোগখাল কাটেন। পরে সেটি প্রবল স্রোতে রূপসা নদীতে পরিণত হয়। জোয়ারের পানি রূপসা হতে পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকে কিছু ভৈরবে, কিছু আঠারোবাঁকিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। আলাইপুর পার হয়ে ভৈরবে পানিপ্রবাহ কমে যায়। এখন তা আলাইপুর খাল নামে পরিচিত। যাত্রাপুরের কাছে ভৈরবের উত্তরমুখি একটি বাঁক ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে তারা সেই বাঁক সোজা করে দেয়। পুনরায় বাগেরহাটের দক্ষিণ দিকে দড়াটানা সংযোগখাল কাটে তারা। ফলে জোয়ারের পানি দুই ভাগে ভাগ হয়ে কিছু আলাইপুরের দিকে, কিছু বাগেরহাটের

কচুয়ার দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ফলে কচুয়া থেকে আলাইপুর পর্যন্ত ভৈরব মজে যায়। এভাবে এককালের বুড়ি ভৈরব ও ভৈরব শেওলা, কচুরিপানাসহ নানা জলজ উদ্ভিদে ভরে যায়। ফলে যশোরে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। যশোরের কৃতি সন্তান খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, রাজনীতিক, সমাজসেবক, বিখ্যাত 'লাহোর ট্রিবিউনে'র সম্পাদক, আইনসভার সদস্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার (১৮৫৯-১৯৩২) কচুরিপানাভর্তি মজা ভৈরব সংস্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেন। যে যদুনাথ মজুমদার যশোর-খুলনা অঞ্চলে নীলচাষ বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন যশোর জেলা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান, জ্ঞানেমানে যিনি সর্বজনের পূজনীয় ছিলেন সেই যদুনাথ মজুমদার ভৈরব সংস্কারে ইংরেজ সরকারকে রাজি করাতে ব্যর্থ হন। এ প্রসঙ্গে বনমালী গোস্বামী লিখেছেন, "...ভৈরব সংস্কারের জন্য রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সারা জীবন ব্রিটিশ সরকারের আইনসভায় নিষ্ফল লড়াই করেছেন।"

পাকিস্তান আমলেও ভৈরব নদ সংস্কারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আবার ভৈরব নদ সংস্কারের দাবি জোরদার হয়। প্রফেসর শরীফ হোসেন সর্বদলীয় প্রয়াস গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টায় সরকারি সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে অধ্যক্ষ আফসার আলী 'ভৈরব বাঁচাও' সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাদীরা ক্রমশ নদী দখল করে চলেছে। নদীগর্ভে নির্মিত হয়ে চলেছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা পর্যন্ত। ভৈরব বাঁচানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই।

মোটরগাড়ি ও সড়ক যোগাযোগ

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত হয় মোটরগাড়ি। ব্রিটিশ আমলেই এদেশে শুরু হল মোটর চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা নির্মাণ। তখনও নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌপথই ছিল প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। এরশাদীয় শাসনামলে নির্বিচার সড়ক উন্নয়নের নামে বিদেশি অর্থে দেশে মোটর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধন্বন্তরী হিসেবে লালন করা শুরু হয় প্রধানত জাপান আর ভারতের মোটর উৎপাদনকারীদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। রেল ও নৌপথ মেরে দেশ জুড়ে গড়ে তোলা হল মোটরনির্ভর এক অতিদানবীয় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। পরিবেশবৈরী, পরিবেশ দূষণকারী, ব্যয়বহুল, জীবনসংহারী এই মোটর যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশকে এক বসবাস-অযোগ্য দেশে পরিণত করেছে।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে দেশে পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০০ (কিমি) যা বর্তমানে ২৫০০০ কিমিতে উন্নীত হয়েছে। আর কাঁচাপাকা সড়ক মিলিয়ে ২,৭৪,০০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মিত হয়েছে। নূর কামরুন নাহারের ভাষায়, "অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সড়ক জাতীয় স্বার্থকে পাশ কাটিয়ে গোষ্ঠি ও মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে নির্মিত হয়েছে। অসংখ্য নদী-খাল-জলাশয় ভরাট করে এ সকল সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।"

মুক্তেশ্বরীর মৃত্যু

কপোতাক্ষ-ভৈরবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যশোর সদর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুরের অতিরিক্ত পানি প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহিত হত এইসব নদীপথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যশোর বিমানবন্দর নির্মাণ করা হল মুক্তেশ্বরীর বাঁকে, বুকভরা বাওড় থেকে খাল কেটে ঝিকরগাছায় কপোতাক্ষে প্রবাহিত করা হল মুক্তেশ্বরীর উজানের জলপ্রবাহ। ফলে মুক্তেশ্বরীর উৎস গেল মরে। উজানে নদী মরলে ভাটিতে মরবেই, মুক্তেশ্বরীর মৃত্যু ইতিহাসের সেই সূচনা।

জলাঙ্গীর বাঁধ ও রেগুলেটর

স্বাধীন ভারত গঙ্গারামপুরে জলাঙ্গী নদীর উপর রেগুলেটর ও কিছু ভাটিতে মাথাভাঙার উৎসমুখে ক্রস বাঁধ নির্মাণ করে সব পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশে মাথাভাঙ্গা, ভৈরব ও এর শাখানদী-উপনদীরগুলোর মৃত্যু অনিবার্য করে তোলে। ফলে মাথাভাঙাই মরতে বসল, পদ্মার দক্ষিণে যত শাখাপ্রশাখা সবেতে মৃত্যুর খড়্গ নামল।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ফারাক্কা

পূর্ব পাকিস্তানে যখন উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ চলছে ঠিক একই সময়ে ভারত সকল আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার উপর নির্মাণ করা শুরু করে ফারাক্কা বাঁধ। তাতে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেয় বিশ্বব্যাংক। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা এই ফারাক্কা বাঁধ। পদ্মায় হানা দিল যমদূত! ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনাই ছিল রাজনৈতিক ঈর্ষাদুষ্ট ও ভুল। বিশিষ্ট জলপ্রকৌশলী কপিল ভট্টাচার্য এই বাঁধ নির্মাণের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। তার পরামর্শ শুনলে আজকের ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হত না। সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারত। এ প্রসঙ্গে কপিল ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "সরকারি পরিকল্পনার ভ্রান্তি ও ভাওতা বুঝতে হলে নদী ও উপত্যকা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য। আজ সরকারি পরিকল্পনা দেশের মানুষকে এক বিপর্যয়ের সামনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, প্রধানত বিদেশি পরামর্শদাতাদের কুটিল চক্রান্তে।" কিন্তু ভারত সরকার তার সাবধানবাণী উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে নানাভাবে হেনস্তা পর্যন্ত করে। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ জল প্রকৌশলী উইলিয়াম উইলকক্স মাথাভাঙার উৎসস্থলের অব্যবহিত পরেই 'নদীয়া ব্যারেজ' নির্মাণের সুপারিশ করেছিলেন যাতে ভাগীরথী, জলাঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি নদীর খাতের এবং প্রবাহের উন্নতি সাধিত হয়।

১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলক চালুর নামে সেই যে ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হল তার পর থেকে বাংলাদেশে শুরু হল পানির আকাল। ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের সময়

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে শুকনা মৌসুমে পানির গড় প্রবাহ ছিলপ্রায় ১,০০,০০০ কিউসেক। ১৯৭৭ সালে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ন্যূনতম ৩৪,৫০০ কিউসেক পানি সরবরাহের গ্যারান্টি ছিল। ১৯৮২ সালের পর চুক্তি না-থাকায় পানির প্রবাহ কমে যায়। ১৯৯৬ সাল নাগাদ এই সরবরাহ ১০,০০০ কিউসেকের নিচে নেমে আসে। ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত চুক্তিতে সর্বনিম্ন ২৭,৬৩৩ কিউসেক পানি বাংলাদেশকে দেয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশ কখনও সে সুফল পায়নি (ম. ইনামুল হক, পৃ. ১২০)। ফলে বাংলাদেশের বৃহত্তম জলসেচ প্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে গেছে, পানির অভাবে মরে গেছে এই অঞ্চলের সকল নদনদী, বিলখাল।

ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। দ্রুত বিল-খাল-নদীনালা শুকিয়ে যায়, পানির স্তর নেমে যায়, পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, বছরব্যাপী গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। বিলীন হতে থাকে নানা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী। ফসলচক্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে। জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির শিকার হয়। ফলে মানুষের জীবন-জীবিকায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে শুরু করে। বহু পরিবার হয় বাস্তুচ্যুত হয়, নয়ত পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়। ব্যাপকভাবে হিন্দু অধ্যুষিত যশোর-খুলনার এই অঞ্চল থেকে অনেক পরিবার দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়।

মরুকরণ ও বাস্তুসংস্থানে বিপর্যয়

এভাবে মানুষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হতে থাকল। নদীসমৃদ্ধ বাংলাদেশ পানি বিনে পরিণত হল কারবালায়। পানির ওপর প্রাণীর জন্মগত অধিকার। পাক-ভারতের নষ্ট রাজনীতি সেই জন্মগত অধিকার কেড়ে নিতে শুরু করল দেশভাগের পরপরই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাতে যোগায় সকলপ্রকার মদদ। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও অবস্থার সামান্য হেরফের ঘটাতে পারেনি। ভারত-বাংলাদেশ রাজনীতির বড় বাধা পানি যা দু'দেশকেই ক্রমশ পরিবেশগত ভারসাম্যহীন করে তুলছে।

হিমালয়ের জলের এখানকার প্রধান উৎস গঙ্গা। ফারাক্কায় ভারত ব্যারেজ নির্মাণ করে তার স্বাভাবিক প্রবাহ শুধু বিনষ্টই করেনি, গোটা বাংলাদেশের জলপ্রবাহে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, ধ্বংস করেছে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান (ইকোসিস্টেম)। কাজেই যেসব নদীর নাম বলেছি, তারা এখন পাহাড়ি জলধারা থেকে বঞ্চিত। এখন তারা জল পায় স্থানিক বৃষ্টির পানি আর সাগর-জোয়ারের নোনাপানি থেকে। ফলাফল হয়েছে মারাত্মক। প্রথমত, নদীগুলোয় পলি জমে জমে যাচ্ছে শুকিয়ে, আর ভাটি থেকে উঠে আসছে সাগরের নোনাপানি, তাতে জনজীবন তো বটেই, গোটা প্রাণী-উদ্ভিদ চক্রই ভেঙে পড়ছে।

লবণাক্ততার বিষময় বিস্তার

গ্রীষ্মে হিমালয়ের বরফগলা মিষ্টি জল মাথাভাঙা–ইছামতী-ভৈরব-কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা-চিত্রা এবং গড়াই-মধুমতী-বলেশ্বর-এর প্রধান উৎস ছিল। তার সাথে যুক্ত হত বর্ষাকালের বৃষ্টি আর ভাটিতে সাগর-জোয়ারের পানি। বরফগলা আর বৃষ্টির মিষ্টিপানি কুষ্টিয়া-যশোর আর সাগরের নোনাপানির মিলিত স্রোতধারায় পুষ্ট ছিল বৃহত্তর খুলনা জেলা। এখন পদ্মা শুকিয়ে যাওয়ায় নোনাপানির আগ্রাসন মাগুরা-ঝিনাইদহ ছাড়িয়ে কুষ্টিয়া পর্যন্ত আক্রান্ত করে ফেলেছে।

বেড়িবাঁধের ইতিহাস

ভারতের মুর্শিদাবাদ (শুধু ভাগীরথীর পূর্ব দিকের অংশ), নদীয়া ও ২৪ পরগণা, বাংলাদেশের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্ক্রিয় বদ্বীপ। এই বদ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত : মৃত বদ্বীপ, পরিণত বদ্বীপ ও জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ বদ্বীপ। কপোতাক্ষ-মধুমতী অববাহিকাও একটি বদ্বীপ। এই বদ্বীপের কিছু অংশ পরিণত বদ্বীপের অন্তর্গত। বাকি অংশ অর্থাৎ যশোরের দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা নিয়ে জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ বদ্বীপ গঠিত। স্বাভাবিক জোয়ারভাটা এর বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠা জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ এই বদ্বীপের বয়স খুব বেশি নয়, গঠনপ্রক্রিয়া অব্যাহত।

নদী বেয়ে উঠে-আসা লবণাক্ত পানি ঠেকাতে প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বেড়িবাঁধ নির্মিত হয়ে আসছে। এই উপমহাদেশে সর্বপ্রাচীন বেড়িবাঁধ নির্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুলতানি শাসনামলে (১২১৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)। সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজি রাজধানী লখনৌকে বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেন। উপমহাদেশের দীর্ঘতম সড়ক গ্রান্ড ট্র্যাংক রোড একই সঙ্গে বন্যা প্রতিরোধে বেড়িবাঁধ হিসেবেও ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলবর্তী বেড়িবাঁধসমূহ নির্মাণ শুরু হয় সপ্তদশ শতকের শুরুতেই। জমিদার আমলে তারাই এগুলো দেখভালের দায়িত্ব পালন করতেন।

ভারতসহ প্রাচ্যের কৃষিব্যবস্থার মূলে ছিল তার উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা। "খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। ... বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন... জলের স্ফীতির সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলোতে জলের যোগান দেয়া...", লিখেছেন কার্ল মার্কস, "সমস্ত সরকারগুলোর ওপরেই এসে বর্তায় একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব পূর্তকর্ম সংগঠনের কাজ।" ব্রিটিশ বেনিয়ারা সরকারের সেই মূল কাজটিই বন্ধ করে দেয়। মার্কস এ প্রসঙ্গে বলছেন, "ইংল্যান্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য... ব্রিটিশ-শাসিত হিন্দুস্তান

তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।" তাঁর বিখ্যাত 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নিবন্ধে মার্কস এ মন্তব্য করেছিলেন ১৮৫৩ সালে।

পূর্ব পাকিস্তানে 'উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প'

পাকিস্তান হাসিলের পর বিদেশি পরামর্শকরা আমাদের যেমন ঋণের জালে বাঁধে, তেমনি যতসব অবাস্তব ও আত্মহত্যার পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয় । পঞ্চাশের দশকে শুরু হয় তার স্থায়ী সমাধানের উপায় অনুসন্ধান। মার্কিন পরামর্শ ও ঋণে নির্মিত হয় স্থায়ী অনেকগুলো পোল্ডার আর স্লুইস গেট। উদ্দেশ্য, জোয়ারের নোনাপানি বিলে ঢুকতে না-দেয়া। 'ভূরূপতাত্ত্বিক, জলতাত্ত্বিক ও ভূ-গাঠনিক শর্তসমূহ উপেক্ষা করে... ভূমি উদ্ধার' করার এই অপ-পরিকল্পনাই সৃষ্টি করে আজকের এই মহাসর্বনাশের, অবর্ণনীয় দুদর্শার। নোনাপানি ঠেকাতে নতুন বিদেশি ব্যবস্থাপত্রের বাস্তবায়ন শুরু ১৯৫৯ সালে, নাম 'উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প' (কোস্টাল এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রজেক্ট, সংক্ষেপে সিইপি)। এই প্রকল্পের অধীনে গোটা এলাকা ভাগ করা হয় বিভিন্ন পোল্ডারে (বিল-বাওড়ের চারিদিকে কিছু কিছু নদী ও খাল বন্ধ করে অন্যান্য নদীর পাশ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে সমগ্র এলাকাকে বিভক্ত করাই হল পোল্ডার। এই বাঁধে প্রয়োজনীয় ফ্লাপ গেট তৈরি করে ড্রেনেজ স্লুইসের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর ফলে জোয়ারের নোনাপানি ড্রেনেজ স্লুইসে আটকা পড়ে পোল্ডারে প্রবেশ করতে পারে না। অন্যদিকে ভাটার সময় পোল্ডারে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়ার কথা।) নির্মাণ করা হয় ২,০০০ মাইল বাঁধ, ৭৮০টি স্লুইস গেট ও ৯২টি পোল্ডার। কিন্তু অপ-পরিকল্পিত এসব পোল্ডার এখন মৃত্যুফাঁদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মোট নির্মিত ৯২টি পোল্ডারের মধ্যে ৩৯টি পোল্ডার বৃহত্তর খুলনা জেলায় যার ২৪টি পোল্ডারই যশোর-খুলনা অঞ্চলে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই পোল্ডারগুলোই সৃষ্টি করে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা। পোল্ডার আর স্লুইসগেটে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ এখন রুদ্ধ। ফলে ভৈরব-কপোতাক্ষের অসংখ্য শাখা ও উপনদী এখন মৃত। কত নদী মরেছে? শুধু কপোতাক্ষের কিছু শাখা ও উপনদীর নাম বলছি। মুক্তেশ্বরী, হরিহর, শ্রীনদী, টেকা, ভদ্রা, বুড়িভদ্রা, সালতা, সাতনল, হামকুড়ো, শোলমারি, তেলিগাতি, ময়ূর ইত্যাদি। এদের অস্তিত্ব এখন নেই বললেই চলে।

বিল ডাকাতিয়া ট্রাজেডি

নদী মরেছে আর ভয়ঙ্কর জলাবদ্ধতার শিকার হয়েছে এই অঞ্চলের বড় বড় ২৭টি বিল, এক কথায় যাদের পরিচয় বিল ডাকাতিয়া। খুলনা শহরের নিকটে ২৫ নং পোল্ডারের মধ্যে বিল ডাকাতিয়ার অবস্থান। ১৯৮২ সালে জলাবদ্ধতা শুরু হলে ১২,০০০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে এক বিশাল জনপদ সারা বছরই থাকে পানির নিচে। চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ৮টি উপজেলায় রয়েছে ছোটবড় ৪২টি বাওড় ও অসংখ্য বিল। ১৯৫৯ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিল জলমুক্ত করে চাষের আওতায় আনার

পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সত্তরের দশকে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হলে খুশি হয় এলাকাবাসী। কিন্তু ল্যান্ড রিক্লামেশনের নামে ‘ভূরূপতাত্ত্বিক, জলতাত্ত্বিক ও ভূ-গাঠনিক শর্তসমূহ উপেক্ষা করে... এই ভূমি উদ্ধার পরিকল্পনা’ বাস্তবায়ন করা হয়। একই সাথে উন্নয়নের নামে নির্মাণ করা হয় অপ-পরিকল্পিত বাঁধ ও সড়ক পথ, ছোট ছোট কালভার্ট। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হয় এক নতুন সমস্যা জলাবদ্ধতা। আশির দশকে যশোর খুলনার অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর এবং খুলনার ফুলতলা, ডুমুরিয়ায় শুরু হয় এই ভয়াবহ জলাবদ্ধতা। মোট ২৭টি বিলে msermi পানি জমে থেকে মানুষের ভিটেমাটি, ঘরবাড়ি, গাছ-গাছালি, গবাদি পশুপাখির বিনাশ শুরু হয়। এই জলাবদ্ধতাকে সাধারণভাবে বিল ডাকাতিয়ার অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

জলাবদ্ধতা কীভাবে

কীভাবে শুরু হল এই জলাবদ্ধতা? ভবদহে নির্মিত স্লুইস গেট যা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ রিপোর্টের ভিত্তিতে, তা থেকেই সমস্যার উদ্ভব। এ বিষয়ে দেখা যাক বিশেষজ্ঞ-ভাষ্য। এই অঞ্চল [বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা] “গাঙ্গেয় জোয়ারভাটা বিধৌত ব-দ্বীপীয় সমভূমির অন্তর্গত।... ভূমি উদ্ধারের পূর্বে বর্ষাকালীন বন্যা ও লবণাক্ত পানিতে ডুবে থাকার কারণে এই অঞ্চলে প্রতি দুই বা তিন বছরে নিয়মিতভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হত। সমস্যা থেকে উদ্ধারের উপায় হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে জমিদাররা আবাদি জমিকে প্রাকৃতিক দৈবদুর্বিপাক থেকে রক্ষার জন্য এই এলাকার চারপাশে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিচু বাঁধ ও কাঠের জলদ্বার নির্মাণ করতেন। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর ভূমি ব্যবস্থাপনা সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং অস্থায়ী পোল্ডারগুলোর অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে।” ভাষ্যটি নেয়া হয়েছে *বাংলাপিডিয়া* থেকে।

বাংলাপিডিয়ায় এই অঞ্চলের জলাবদ্ধতার সবচেয়ে বড় সমস্যাক্রান্ত ভবদহ, বিল ডাকাতিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে “১৯৫৯ সালে সরকার স্থায়ী পোল্ডারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিল ডাকাতিয়া জলাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় জনগণ বিলটিকে জলমুক্ত করতে বিভিন্ন প্রয়াস চালান। অধিকাংশ প্রয়াসই...নদী ও এর নির্গমন প্রণালীসমূহের পুনঃখনন সংক্রান্ত। কিন্তু পুনঃখননের পর শীঘ্রই আবার প্রণালীসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

পোল্ডার ব্যবস্থায় এই অঞ্চলে অনেকগুলো স্লুইস গেট নির্মাণের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু, গেট বন্ধ করার ফলে সমুদ্র থেকে উঠে আসা বিপুল পরিমাণ পলি গেটমুখে নদীগর্ভেই জমে অচিরেই মৃত্যু ঘটায় নদীর। ভয়াবহ এই মরণ প্রথম শুরু হল ভবদহ স্লুইস গেটমুখে। তাই ভবদহ নামেও পরিচিত এই জলাবদ্ধ জনপদ।

আরও নদীর মৃত্যু

ঝিকরগাছার লাউজনি থেকে পূর্ববাহী একদা প্রমত্তা নদী হরিহর মনিরামপুর, কেশবপুর হয়ে মিলত ভদ্রায়। হরিহরের এক শাখা শ্রীনদী। সে মনিরামপুর থেকে বাজিতপুর, কাছাড়িবাড়ি ও কুমোরঘাটা হয়ে ফুলতলা উপজেলার জামিরার পশ্চিম পাশ দিয়ে বিল ডাকাতিয়ায় পড়ত।

১৯৮২ সালে প্রথম নজরে আসলেও মধ্য আশির দশকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার বিভিন্ন নদীর মরণদশা। ভবদহ স্লুইস গেট বন্ধ হয়ে মরল শ্রী নদী মধ্য-আশিতে। তার সাথে মরতে শুরু করল টেকা, হরি, ভদ্রাও। ১৯৯৫ সালে হামকুড়ো নদীর মরণ শুরু হয়। এককালের প্রবল স্রোতস্বী হামকুড়োর মরতে সময় লাগে মাত্র বছরপাঁচেক। এসব নদীর সবটাই এখন ভূমিগ্রাসী ঘের-মালিকদের দখলে, যাদের তা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তারা তা উপভোগ করে, দুষ্ট লোকের ভাষায় ‘নানা উপাচারে তুষ্ট’ হয়ে!

‘বাগেরহাটে অভিনব নদী বিপর্যয় এলাকাবাসী হতভম্ব, অনুতপ্ত’, শিরোনামে *কালের কণ্ঠে* প্রকাশিত তৌফিক মারুফের প্রতিবেদনটি হৃদয়বিদারক, “বাগেরহাটের রামপালের প্রাণ বলে পরিচিত দাউদখালী নদীটি! এ নদীর ওপর আছে ২৪০ মিটার দীর্ঘ শ্রীফলতলা সেতু। ১৯৯৯ সালে সেতুটি নির্মাণের সময়ও নদীটি ছিল ভাঙনপ্রবণ; প্রমত্তা-টগবগে। এখন প্রশস্ততা নর্দমার মতো। মাত্র ১২ বছরে এমন পরিবর্তন দেশের অন্য কোনো নদ-নদীর হয়নি বলে মত বিশেষজ্ঞদের। একই রকম ভয়াবহ পরিণতির মুখে পড়েছে পশুর চ্যানেল থেকে বলেশ্বর নদের সংযোগকারী মংলা নদীও। অস্বাভাবিক মাত্রায় পলি জমে দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে মংলা নদীর মংলা-বেতবুনিয়া-ঘাসিয়াখালী অঞ্চলের প্রায় ২১ কিলোমিটার।”

সাদা সোনার সর্বনাশা আগ্রাসন ও চিংড়ি চাষ

যে নোনাজল ঠেকাতে প্রাচীনকাল থেকে এদেশে ছোট ছোট জলদ্বারসহ বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হত আশির দশকেই সেখানে নোনাপানি তুলে শুরু হয় সাদা সোনা রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের নামে চিংড়ি চাষ। জল চলাচলের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করে ঘের নির্মাণ, নোনাপানি তুলে চিংড়ি চাষের নামে সাতক্ষীরা, খুলনা জেলা এবং আংশিকভাবে যশোর জেলার জলাবদ্ধ সমস্যাকে আরও জটিল করে ফেলা হয়। শুরু হয় সাদা সোনার সর্বনাশা আগ্রাসন।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গত সাড়ে তিন দশক ধরে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষের জন্য যে ঘেরপ্রথা চালু হয়েছে তা এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। খাস জমির অবৈধ দখলদারদের স্বার্থ তার সাথে যুক্ত। এই এলাকার বাস্তুসংস্থানে (ইকো সিস্টেম) বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। মজতে থাকে এই জনপদের নদনদী।

ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন

কিন্তু নৈসর্গিক সেসব কারণ ছাড়াও এসব নদ-নদীর মৃত্যুর কারণ মানুষের সীমাহীন লোভ ও নদীর ওপর নানা ধরনের অত্যাচার। উন্নয়নের নামে মানুষ এসব নদীকে কৃঞ্জলিত করেছে, দূষণে দূষণে তা বিষে পরিণত করেছে। অধিক ফসল ফলানোর নামে ১৯৮০ দশকে বোরো ধান চাষের জন্য নির্বিচার ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন শুরু হয়। ফলে ভূস্তরের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হতে শুরু করে। নির্বিচার ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে ভূস্তরে পানির স্তর নেমে যায় অনেক নিচে, বর্ষায় তার সবটুকু পুনঃসঞ্চয়ন হয় না, কেননা রুক্ষ পরিবেশে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে এবং কমে যাচ্ছে বৃষ্টিপাত। তার সাথে যোগ হয়েছে নির্বিচার রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহার। ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে।

নদী দখল

নদী যত শুকিয়েছে দখলকারীরা তত দ্রুত তা দখল করে নিয়েছে। মানুষ নদীর দুই তীর শুধু দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি, দখল করছে তার সর্বাঙ্গ। নদীর বুকে মানুষের ফসলের খেত, নয়ত নদী বেঁধে মাছের চাষ, এমনকি নির্মাণ করছে প্রশস্ত সড়ক, সুরম্য অট্টালিকাও। মানবসৃষ্ট যত প্রকার বর্জ্য সব ঢেলে ঢেলে মানুষ নদীর পানি বিষিয়ে ফেলেছে, সেখানে জলজ যত প্রাণী ও উদ্ভিদ তার বিনাশ ঘটিয়ে চলেছে। মানুষের এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এঙ্গেলস, "পুঁজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন ও বিনিয়োগে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসাবে নিতে পারে তারা।"

মরণফাঁদ ভৈরব-কপোতাক্ষ অববাহিকা

যশোর, খুলনার মধ্য দিয়ে ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদ প্রবাহিত। পূর্বে ভৈরব এবং পশ্চিমে কপোতাক্ষ। ভৈরবের শাখা কপোতাক্ষ জন্মলাভের পর অনেকটাই ভৈরবের সমান্তরালে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ববাহী। উভয়ে সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে; ভৈরব পশুর, কপোতাক্ষ মালঞ্চ নামে। ভৈরব-কপোতাক্ষ অববাহিকা একটি বদ্বীপ। হরিহর ও ভদ্রা কপোতাক্ষের দুই শাখা। ত্রিমোহিনী থেকে ভদ্রার উৎপত্তি। সে কেশবপুর, গৌরীঘোনা, ভরত ভায়না, ডুমুরিয়া হয়ে শিবসা ও পশুরে মিলত। মধ্যবর্তী স্থানে তার ছিল বহু শাখা-প্রশাখাও। খর্নিয়া থেকে ভদ্রার এক শাখা তেলিগাতি নামে ঘ্যাংরাইল, আরও দক্ষিণে হারিয়া নদী হয়ে শিবসায় পড়ত। এখন কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই তাদের। সিইপি, অপপরিকল্পিত স্লুইস গেট ও ক্রস বাঁধ নির্মাণ, চিংড়ি চাষ, নদী দখল, নতুন জনবসতি স্থাপন, অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণের মতো আত্মঘাতী সব কর্মকাণ্ডে ভৈরব-কপোতাক্ষ অববাহিকা আজ পরিণত হয়েছে এক মরণফাঁদে।

জলাবদ্ধতার পরিণতি

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, "...১৯৮৯-৯২ মেয়াদকালে বিল ডাকাতিয়ার অভ্যন্তরভাগে অবক্ষেপণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় জনগণ একে একটি জোয়ারভাটা অববাহিকায় রূপান্তরের চেষ্টা চালায়।"

আতিউর রহমান তাঁর গবেষণাগ্রন্থে লিখেছেন, "There was serious flaw in the project design. The people's wisdom was ignored by outside 'mega' consultants and the insensitive bureaucrats and technocrats. The end-result was a disaster. Interference with nature was proved suicidal."

সকলেই স্বীকার করেন, "স্থায়ী পোল্ডারিংয়ের আগে অবক্ষেপণ ও এই এলাকার অবনমনের মধ্যে একটি সমতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংলগ্ন নদী তলদেশ অবক্ষেপণ এবং এই সঙ্গে জোয়ারভাটা সমভূমির অবনমন বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। ফলে নদী তলদেশসমূহ জোয়ারভাটা সমভূমির চেয়ে উঁচু হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতি দিনে দিনে আবাদি জমির উত্তরোত্তর নিমজ্জন ও স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে।" দেখা যাচ্ছে, স্থায়ী পোল্ডারিংই এই জলাবদ্ধতার মূল কারণ। পূর্বে অনুসৃত "অস্থায়ী ভিত্তিতে নিচু বাঁধ ও কাঠের জলদ্বার নির্মাণ" এই ধরণের স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করত না। কিন্তু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে স্থায়ী পোল্ডারিং কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিল ডাকাতিয়াসহ এই এলাকার জলাবদ্ধতা "একদিকে যেমন মারাত্মকভাবে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি এলাকার জনগণের অমানবিক দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। মানুষ, কৃষি, অবকাঠামো, জলসম্পদ ইত্যাদি সবকিছুকেই এটা প্রভাবিত করেছে। জলাবদ্ধতার কারণে এখন গ্রামগঞ্জ, রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, নয়ত পানিতে ডুবে গেছে। "এখানে জলাবদ্ধতার আগে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি এবং বর্ণাঢ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহ বিরাজ করত। সে সময় এই অঞ্চলের ৫৫% পরিবারই ছিলকৃষিজীবী, কিন্তু আজ তারা জেলেতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ ইতোমধ্যেই অন্যত্র চলে গেছে।"

এসব কিছু মিলে এখানে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। জীববৈচিত্র্য দারুণভাবে সংকটাপন্ন। বাস্তুসংস্থান বা ইকো সিস্টেম ভেঙে পড়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরজলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ পৃথিবীর সবচেয়ে নাজুক অঞ্চলে পরিণত এই অঞ্চল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিষময় ফল ভোগ করছে এই অঞ্চলের মানুষ।

প্রাকৃতিক জোয়ারাধারে সমাধান

১৯৯৭ সালে ২৯ অক্টোবর কেশবপুর উপজেলার বিল খুকশির বাঁধ কেটে দিয়ে অবাধ জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি করে আন্দোলনকারী মানুষেরা। ফলে হরিহর, শ্রীনদী ৩০ ফুট গভীর ও ১৫০ ফুট প্রশস্ত হয় এবং নদীর নাব্যতা অনেকাংশে ফিরে আসে। আবদ্ধ পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হওয়ায় ৪ হাজার হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসে। বিলও গড়ে পাঁচ ফুট উঁচু হয় এবং মৎস্যভাণ্ডারে পরিণত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বাঁধের কাটা অংশ পুনরায় বেঁধে দিয়ে সংকটকে ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে যায় পানি উন্নয়ন বোর্ড।

ভবদহ জলাবদ্ধ এলাকার মানুষ প্রকৃতির সাথে বসবাস করতে চায়। জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে জলাবদ্ধ মানুষ দাবি করে আসছে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জোয়ারে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান। ভবদহ স্লুইস গেট উঠিয়ে দিয়ে কৃষিজমিতে জোয়ার-ভাটার অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করার দাবি তাদের গত তিন দশক ধরে ভবদহে জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চলছে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম। ভুক্তভোগী এলাকাবাসী ছাড়াও আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছেন বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। অবাধ জোয়ার-ভাটা তত্ত্বে বিশ্বাসও করেন তারা। ১৯৯৭ সালের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তারা বলছেন, নদীর মোহনা মুক্ত করতে হবে আগে, নদীই প্রাকৃতিকভাবে নদীর বিস্তৃতি ঘটাবে। ভূমির অবনমন ও পলির অবক্ষেপণের সাহায্যে প্রাকৃতিক উপায়েই জলাবদ্ধতার সমাধান করতে হবে। জনজ্ঞানকে উপেক্ষা করার ভীষণ পরিণতি সম্পর্কে আতাউর রহমান মন্তব্য করেছেন, "Conventional data collection by 'outsiders' should be complemented by information-generation processes which can take note of peoples perception of the problems" তিনি আরও বলেছেন, "More emphasis should be given to the environmental consequences of any development intervention."

বাস্তবত, স্থানীয় মানুষের শত শত বছরে অভিজ্ঞতালব্ধ জনজ্ঞান উপেক্ষা করে, তাদের মতামত উপেক্ষা করে, পরিবেশগত সম্ভাব্য ফলাফলের চিন্তা না-করে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প প্রাকৃতিক ও প্রাণিজগতে এবং প্রতিবেশের ওপর অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে এনেছে। প্রাকৃতিক জোয়ারাধার পদ্ধতিতে নিম্নভূমি অর্থাৎ বিলকে পলি দিয়ে ভরাট করে জলাবদ্ধতা বন্ধে জনগণের সঞ্চিত জ্ঞান আপাত ফলপ্রসূ হয়েছে। জলাবদ্ধ প্রায় ১৫ লাখ মানুষ এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড অবশেষে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিল খুকশিয়াকে ভরাট করে আবাদযোগ্য করা সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দোলনকারী সংগঠন দীর্ঘকাল যাবৎ এই পদ্ধতির পক্ষে জনমত গঠন করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কায়েমি স্বার্থের সংঘাত, শ্রেণীসংঘাত

২০১২ সালের ২ জুন বিল কপালিয়ায় জোয়ারাধার বা টিআরএম পদ্ধতির কাজ শুরু করতে গিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এবং জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আকস্মিক আক্রমণের শিকার হন। সেখানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং সরকারি গাড়িসহ ঘরবাড়ি অগ্নিদগ্ধ করে সন্ত্রাসী বাহিনী। বিষয়টি অভাবিতপূর্ব। কেননা, এই অঞ্চলে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তির এই একটিই উপায় টিআরএম পদ্ধতি। বিভিন্ন গবেষণায় এর সুফল প্রমাণিত। কিন্তু এমন জনকল্যাণমূলক সরকারি কাজে এমন সন্ত্রাসী হামলার কারণ কী? ভবদহ পানি নিষ্কাশান সংগ্রাম কমিটি প্রচারিত পুস্তিকায় এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তিকায় ঘেরমালিক ও খাস জমির অবৈধ দখলদারদের চক্রান্তকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার সাথে যুক্ত অন্যান্য কারণসমূহ হল: খাস ও অর্পিত সম্পত্তির স্বার্থ, ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্তিতে বিড়ম্বনা, জনগণ ও আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোকে আস্থায় না-নেয়া, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি আস্থাহীনতা ইত্যাদি।

ক্রন্দসী কপোতাক্ষ

২০০০ সালের অক্টোবর মাসে প্রবল বর্ষণের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হানা দেয়। বন্যার সাথে অপরিচিত এই অঞ্চলের মানুষ বন্যা-পরবর্তী সর্বনাশ অনুমান করতে পারেনি। বন্যা এসেছিল পূর্বে কপোতাক্ষ পর্যন্ত। পরের বছর কপোতাক্ষে জল জমতে শুরু করলে মানুষ প্রথম অনুভব করে বন্যায় বয়ে আনা বিপুল পলি কপোতাক্ষের বুক ভরাট করে ফেলেছে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে কয়রা থেকে চৌগাছা পর্যন্ত কপোতাক্ষ স্রোতহীন, প্রবাহহীন এক মৃত নদে পরিণত হয়। প্লাবিত হতে শুরু করে কপোতাক্ষের দুই তীরের জনপদ।

এই বদ্বীপের সিংহভাগই এখন জলাবদ্ধ, লক্ষ লক্ষ মানুষ অশেষ দুর্ভোগের শিকার, সংকটাপন্ন প্রাণবৈচিত্র্য, বিপর্যস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ। প্রতি বছর শুধুমাত্র অভয়নগর, মণিরামপুর, কেশবপুর, তালা, পাইকগাছা, কয়রা উপজেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটায়।

রুদ্র প্রকৃতির ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ

শুরু হল রুদ্র প্রকৃতির ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। এমনিতেই বিশ্বের বৃহত্তম নোনাপানির সুন্দরবন প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ জৈবপলি নদীগর্ভে অবক্ষেপ করে। জোয়ারে যে বিপুল পরিমাণ জৈবপলি নদী বেয়ে উপরে উঠে আসে, ভাটার সময় উজানের পানির স্রোত কমে যাওয়ায় সেই বিপুল জৈবপলি নদীগর্ভে অবক্ষিপ্ত হয়ে দ্রুত গ্রাস করল স্বয়ং নদীকেই। আবার উজানের পানি যে বিপুল পলি নিয়ে নামতে চায় তা-ও আটকা পড়ে

অবক্ষিপ্ত হয় নদীগর্ভেই। ফলে নদীগর্ভের মৃত্যুযন্ত্রণা দ্রুত তীব্রতর হল। জলাবদ্ধ ভবদহের পাশেই জন্ম নিল আরেক ভবদহ!

এখন জোয়ারের পানিতে ভাসে কয়রা, আশাশুনি, তালা, পাইকগাছা। আর উজানে বৃষ্টির পানিতে ভাসে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কলারোয়া, মনিরামপুর, কেশবপুর। কয়রা, আশাশুনি, পাইকগাছা, তালা ভাসে নদীগর্ভে জোয়ারের পানি ধারণ করতে না-পেরে। এ এক নতুন জরাসন্ধ!

সমস্যার উপায় খুঁজতে পানিবিদরা নাকাল হন। ভাবেন, নদীগর্ভ থেকে পলি অপসারণ করলে বুঝি নামবে কপোতাক্ষের অতিরিক্ত জল। তাই নিয়ে মহাযজ্ঞ ব্যাপার সব। বছর বছর কোটি কোটি টাকার নদী-কাটা, নদী-কাটা খেলা চলে। যে কন্ট্রাকটরি জোটে তাতে বিত্তশালীদের লোভের জিভ তৃপ্তি পায়, সাধারণ মানুষ জীবন-জীবিকা হারায়, প্রাণ হারায় কতশত প্রাণী। বিপর্যস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম জনপদের সামগ্রিক পরিবেশ। গত কয়েক বছরে কেশবপুরের ত্রিমোহিনী থেকে পাইকগাছার হরিদাসকাঠি পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার নদী একেবারে ভরাট হয়ে গেছে, নদের সামান্যতম নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। ফলে বিনষ্ট হয়ে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পুরো জল প্রবাহ।

বর্তমানে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। মনিরামপুর থেকে কয়রা পর্যন্ত পুরো কপোতাক্ষ এখন মৃত। ২০০৫-২০০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র চার বছরে কপোতাক্ষের ৫৫ কিলোমিটার মরে গেছে এবং আরও ২২ কিলোমিটার মুমূর্ষু। বৃষ্টি হলেই সে পানি জমে জনপদে। তার সাথে সাগরের জোয়ারের ঢল। ২০০৭ সালের নভেম্বরে সিডর এবং ২০০৯ সালে আইলা আঘাত হানার পর আজ পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় বিরান ভূমি।

'কপোতাক্ষ বাঁচাও' আন্দোলন

২০০৩ সালে শুরু হল 'কপোতাক্ষ বাঁচাও' আন্দোলন। যশোরের ঝাঁপায় অনুষ্ঠিত এক সভায় অনিল বিশ্বাস আহ্বায়ক নির্বাচিত হন এবং এখন পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সে আন্দোলনে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল একেবারেই যোগ দিল না, শ্রেণীস্বার্থে। প্রধানত বামপন্থী ছোটখাট দল আর ভুক্তভোগী গরিব মানুষেরা তার সারথি আর এই আন্দোলনকে সহযোগিতা করে চলেছে মিডিয়া। এখন তাদের স্লোগান 'কপোতাক্ষ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'।

কপোতাক্ষ নদ এখন দুঃখের অপর নাম, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কপোতাক্ষপাড়ের মানুষের ঘরে ঘরে এখন আহাজারি। যারা চোখে দেখেনি, তারা বিশ্বাস করবে না কী অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে দিন কাটছে যশোর-সাতক্ষীরা-খুলনায় কপোতাক্ষ তীরের মানুষের। পানি কমিটির হিসাবমতে, ২০০৮ সালে যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও ঝিনাইদহ জেলার আট উপজেলায় ৬০টি ইউনিয়নে ৪৭০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর

ফলে ৩৮,০২০ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয় এবং ৯,৪৭,৩৪৯ জন মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়। বন্যা মানে তো উজান থেকে অথৈ পানির ঢল প্রবল বেগে নেমে আসা, দু'কূল প্লাবিত করে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। কিন্তু কপোতাক্ষ তীরের মানুষের দুর্ভোগের কারণ অতিবর্ষণ নয়, কারণ জলাবদ্ধতা। স্বাভাবিক বর্ষার জল কপোতাক্ষ নদ বেয়ে সাগরে নেমে যেতে পারছে না, তাই দু'কূলের মানুষের জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বাগান এখন পানির নিচে। একদা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে সুফলা এলাকা বলে সুখ্যাত ছিল কপোতাক্ষ অববাহিকা। কিন্তু ২০০১ সাল থেকে প্রতিবারই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্লাবিত হয়েছে কপোতাক্ষ অববাহিকা। প্রতি বছর ৫০-৮০ হাজার হেক্টর ফসলি জমি পানিতে ভাসে, সে জমিতে আউশ, পাটসহ কোনো আবাদ করা যায় না। আরও হাজারবিশেক হেক্টর জমি থাকে সারা বছরই পানির নিচে। ঘরবাড়ি ছেড়ে মানুষ রাস্তায়, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় আশ্রয় নেয়। ফলে লেখাপড়া বন্ধ হাজার হাজার শিক্ষার্থীর, অন্ধকার তাদের ভবিষ্যৎ। ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সহসা এই আবদ্ধ পানি নেমে যায় না, কেননা জোয়ারের বিপরীতে উজানের স্রোত নেই। তাই, যশোরের চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, সাতক্ষীরার কলারোয়া, তালা, আশাশুনি এবং খুলনার পাইকগাছা, কয়রায় কপোতাক্ষের দু'পাড়ের মানুষ জলাবদ্ধ হয়ে পানির সাথে বসবাস করছে। এই অবস্থার জন্য মানুষ দুষছে মানুষকেই। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে অপ-পরিকল্পনা ও অর্থলোপাটের অভিযোগ সাধারণ মানুষের। কপোতাক্ষপাড়ের কবি হোসেন উদ্দীন হোসেন দুঃখ করে লিখেছেন,

নদের বুকে রাস্তা বেঁধে তারাই
নদের জীবন শেষ করেছে পিষে
স্বার্থলোভীর অঙ্ক আছে মাথায়
লোহালকড়ি মেরে তোমায় শাসায়
মৃত্যু তোমার এখন সাপের বিষে
এরপরে কি থাকবে নদের রেখা
নদের চিহ্ন কোথায় যাবে মিশে।

ভূমিগঠন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের নদীগুলো ব্যতীত অন্য নদীগুলো সীমান্তের ওপার থেকে বছরে প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন টন বালি ও পলি বহন করে আনে। এই পলির অনেকটাই বাংলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে জমা হয়ে খাল বিল ভরাট করে, অনেকটা নদীর তলদেশে জমা হয়ে নদীগর্ভ ভরাট করে, অনেকটা সাগর পর্যন্ত পৌঁছে ক্রমশ দ্বীপ গড়ে তোলে। নদী-তীরবর্তী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে এই বিপুল পরিমাণ পলি নদীগর্ভেই জমা হয়ে নদীকেই মেরে ফেলছে এবং সাগরে নতুন দ্বীপ গড়ে তুলতে

ব্যর্থ হচ্ছে। সম্প্রতি দৈনিক *প্রথম আলোয়* দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিগঠন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব এবং সুন্দরবনে ব্যাপক ভাঙনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "সুন্দরবন ভাঙছে বেশি, গড়ছে অনেক কম। বনের পূর্ব দিকের চেয়ে পশ্চিমে ভাঙন বেশি। গত প্রায় চার দশকে ভাঙনের কারণে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ছয় বর্গকিলোমিটার করে ২৩৩ বর্গকিলোমিটার বন ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু পলি পড়ে জেগে ওঠা বনের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম, ১০৪ বর্গকিলোমিটার।

গবেষকদের ধারণা, উজানের নদীগুলোর ক্ষীণ প্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা ভাঙাগড়ার ব্যবধান বাড়াচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনেরও প্রভাব আছে।"

কেন ভাঙাগড়া

প্রথম আলোর রিপোর্টে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান, স্পারসোর জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "গঙ্গাবাহিত পলি থেকে সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে গড়ে ওঠে এ বন। পলিগঠনের এই ধারা গতিশীল। প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে ভাঙাগড়া চলে। গবেষণায় ভূ-সম্পদ জরিপের উপগ্রহ বা ল্যান্ডস্যাটে তোলা সুন্দরবনের ১৯৭২ থেকে ২০১০ সালের চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মাহমুদুর রহমানের মতে, ভাঙন বাড়ার সম্ভাব্য কারণের একটি হল, উজানে গঙ্গার মূল প্রবাহ কমে আসা। আগে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদী ও সমুদ্র স্রোতের মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল। কিন্তু এখন সমুদ্রের দাপুটে স্রোতের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে পারছে না এসব নদীর ক্ষীণ প্রবাহ। আর তাতে ভাঙন বাড়ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ভাঙনের এটাও একটা কারণ হতে পারে।"

প্রাকৃতিক নিয়মেই নদীর ভাঙা-গড়া চলে। নতুন ভূভাগের সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদ্বীপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মনিরুল হক দেখিয়েছেন, আমাদের জলাভূমির অধিকাংশ এলাকায় বছরে ১ থেকে ২ সে.মি. ভূমির নিম্নগমন হচ্ছে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পূর্বে নদীবাহিত পলি জলাভূমিতে অবক্ষেপিত হত, ফলে বাৎসরিক ভূমিক্ষয়ের চেয়ে পূর্ণতার মাত্রা বেশি ছিল। এখন পুরো বাঁধ এলাকায় ভূমির একতরফা নিম্নগমন হচ্ছে। ফলে ভূমিগঠন সম্পূর্ণ-না হয়ে নদীবাহিত পলি নদীর মধ্যে অবক্ষেপিত হয়ে নদীর নাব্যতা নষ্ট করেছে। নদীর বক্ষ স্ফীত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা হিসাব কষে দেখেছেন, উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র তলদেশের উচ্চতা বছরে ৩ থেকে ৪ মি.মি. বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, নতুন নতুন এলাকায় নোনাপানি প্রবেশের ঝুঁকি বাড়ছে। আফছার আলী লিখেছেন, "নদীর মধ্যে পলি জমে নদীর বুক এখন বসবাস এলাকার জমি থেকেও উঁচু হয়ে গেছে।" কপোতাক্ষের মৃত্যু সম্পর্কে জল-

প্রকৌশলী ইনামুল হক অভিযোগ করেছেন, “নদী বাঁচানোর জন্য বারংবার একই পরামর্শক নিয়োগ করে চলেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। আর তাদের ভুল পরামর্শে কপোতাক্ষ মরে গেল।”

কয়রা, পাইকগাছা, তালা তো বটেই, এমনকি ডুমুরিয়া, কেশবপুর, কলারোয়া, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছায় কপোতাক্ষ অববাহিকায় জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। বিপুলসংখ্যক মানুষ জল-উদ্বাস্তু হয়ে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে নতুন এক গ্রামেরই পত্তন হয়েছে ‘কয়রা’ নামে। কয়রা থেকে জল-উদ্বাস্তুরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। এমনি হাজারো মানুষের দেখা মেলে যশোর, খুলনা, নোয়াপাড়া, সাতক্ষীরা প্রভৃতি শহরে যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে, জীবিকা বদল করে কোনো রকমে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। ২০০৯ সালে আইলা আঘাত হানার পর উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। গাছপালা, পশুপাখি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। নোনা পানি সমস্ত এলাকাকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলে। আজও পর্যন্ত এ সব এলাকায় খাবার পানির তীব্র সংকট। মিষ্টিপানির সকল পুকুর, জলাধার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নোনা পানির আগ্রাসনে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এক ভয়াবহ জীববৈচিত্র্য সংকট দেখা দিয়েছে যা ভবিষ্যতে আরও ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

হুমকিতে সুন্দরবন

সুন্দরবনের আয়তন ১০ হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশ অংশ ছয় হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার। আর ভারতের অংশ চার হাজার ১৮৩ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট বনের ৪০ শতাংশই সুন্দরবন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক প্রাচীর সুন্দরবন এই অঞ্চলকে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে থাকে। সেই সুন্দরবনই এখন ভয়াবহ হুমকির মুখে। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে মাহমুদুর রহমানের বরাতে বলা হয়েছে, “ভাঙন ও ভূমিগঠনের ব্যবধান গত চার দশকে ক্রমশ বেড়েছে। এ প্রবণতা চলতে থাকলে সুন্দরবনের আয়তন ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে। এর ফলে পশুপাখির বিচরণক্ষেত্র হ্রাস পাবে, কমবে জীববৈচিত্র্য। গবেষণাটি বলছে, সুন্দরবনে ভাঙন ও গঠন দুই ভিন্ন পথে চলছে। ভাঙন চলছে ধারাবাহিকভাবে, কিন্তু গঠন অনিয়মিত ও বিচ্ছিন্ন।”

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ভাঙাগড়ার এই প্রবণতা স্থায়ী হলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ ম্যানগ্রোভ বা শ্বাসমূলীয় বনটি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসবে, অন্তত এর বাংলাদেশের অংশ। প্রভাব পড়বে বনজ সম্পদের ওপর। এ প্রসঙ্গে আইনুন নিশাত বলেন, “সাম্প্রতিক সময়ে অব্যাহতভাবে পলি পড়ে সুন্দরবনের অনেক খালের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।” খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক দিলীপ দত্ত বলছেন, ‘আমাদের ভূখণ্ড অগ্রসরমান বদ্বীপ। কিন্তু উজানের পানির প্রবাহ কমে

যাওয়ায় পলিপ্রবাহ কমেছে, বদ্বীপ গড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সুন্দরবনের ভাঙন প্রক্রিয়া এটা জানান দিচ্ছে।'

কেন এসব আত্মবিনাশী কর্মকাণ্ড?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের ওপর মানুষের তথাকথিত উন্নয়ন মডেলের অন্যায় হস্তক্ষেপ শুরু করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা। এদেশে আজকের দুর্যোগ ও দুর্ভোগের সূচনাও তখন থেকেই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সময়টা ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কালপর্ব। উপনিবেশ লুণ্ঠন করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটাচ্ছে তখন, শিল্পে বিনিয়োগ করছে এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্থিতি এতটাই নাজুক পর্যায়ে চলে গেছে যে, এই অঞ্চলের নদীগুলোর পুনরুজ্জীবন হয়তো কখনই আর সম্ভব হবে না। এ সবই পুঁজির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের কারণেই ঘটে। লর্ড ক্যানিং দুশ' বছরেরও বেশি পূর্বে পুঁজির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা এখন আরও বেশি বেশি সত্যি এবং নিষ্ঠুর, "(পুঁজির) সুনিশ্চিত শতকরা কুড়িতে (লাভে) সৃষ্টি হবে আগ্রহ; শতকরা পঞ্চাশে রীতিমতো ঔদ্ধত্য; শতকরা একশ'য় তা সমস্ত মানবিক নিয়ম পদদলিত করতে প্রস্তুত থাকবে; তিনশ'য় এমন অপরাধ নেই যাতে সে কুণ্ঠিত, এমন ঝুঁকি নেই যা সে নেবে না, এমনকি মালিকের ফাঁসি যাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও।" (উদ্ধৃত, কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, ১ম খণ্ড, ৩১ অধ্যায়।)।

২০১২ সালের ২ জুন বিল কপালিয়ায় ঘের-মালিকরা পুঁজির এই চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সমাধানের পথ

সকলেই এসব সমস্যার আশু সমাধান প্রত্যাশা করেন। কিন্তু কী উপায়ে? জোয়ারাধার পদ্ধতিকে এর সমাধান বলে ভাবা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে বিল খুকশিতে এ পদ্ধতি খুবই ফলদায়ক হয়েছিল। ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি মনে করেন, "বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে যে দুর্দিনের মুখোমুখি আমরা হয়েছি তার মোকাবেলা করতে হলে জোয়ারের পলিতে ভূমি উঁচু করার বিকল্প নেই।... মুক্ত প্লাবন এবং নদীর পুনর্জাগরণই এই সমস্যা সমাধানের শেষ উপায়।" পানি কমিটির মতও তাই। তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে পানি উন্নয়ন বোর্ড তা মেনেও নিয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে সরকার। কিন্তু স্বল্প মেয়াদে এই পুরো অঞ্চলের বিল উঁচু করে চাষযোগ্য করা সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না বসতভিটা, গাছগাছালি, গবাদিপশু-পাখি রক্ষা করা। এর জন্য প্রয়োজন হবে দশকের পর দশক। তাছাড়া এই সব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পানিবিশেষজ্ঞ আইনুন

নিশাত 'অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে এবং যৌথ ব্যবস্থাপনায় অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনা' এসব সমস্যা সমাধানের উপায় বলে মনে করেন। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক নদী আইন বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আসিফ নজরুল 'অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা'র মাধ্যমে এ অঞ্চলের পানি সমস্যা সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন।
অনেকে বলছেন, কপোতাক্ষসহ অন্যান্য নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনার কথা। প্রথমত তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত উৎসে যদি পানি না-থাকে তবে ড্রেজিং করে নদী নাব্য রাখা যাবে কীভাবে? ফারাক্কা সমস্যার সমাধান না-হলে এই অঞ্চলে জলপ্রবাহ স্বাভাবিক করা যাবে না।

প্রকৌশলী ইনামুল হকের ভাষায়, "ড্রেজিং প্রকল্পের যারা প্রবক্তা তাদের অধিকাংশই অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তা বলেন, কারণ ড্রেজিং করে মৃত নদীকে বাঁচানো যায় না।" তিনি আরও বলেন, " ...এসব প্রকল্প গণবিরোধী এতে জনগণের উপকার তো হয়ই না, বরং জনগণের ঘাড়ে চাপে বিপুল পরিমাণ দেশি ও বিদেশি ঋণের বোঝা।" কপোতাক্ষের নাব্যতা পুনরুদ্ধারে তার পরামর্শ, ড্রেজিং পদ্ধতির পরিবর্তে বাঁকড়া, মশ্মিমনগর, ত্রিমোহিনী, সাগরদাঁড়ী, ধানদিয়া, সারুলিয়া, খলিসাখালী ও মাগুরা-জালালপুরের আটটি বাঁক লুপকাটের মাধ্যমে সোজা করে কপোতাক্ষের জলপ্রবাহ স্বাভাবিক করা যেত। আর তাতে হয়তো বাঁচানো যেত এই নদী। জনাব ইনামুল হকের লুপ-কাট তত্ত্বের সাথেও একমত হওয়া কঠিন। কেননা মূল সমস্যা উজানের পানির অভাব। উজানের পানির প্রবাহই যদি না-থাকে তাহলে শুধু লুপ-কাটের মাধ্যমে 'উলসী-যদুনাথপুর-বেতনা সংযোগ খাল খননের মতো পরিকল্পনা'য় কোনো সমাধান হবে বলে মনে হয় না।

প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান

সুতরাং এসব মারাত্মক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। ফিরিয়ে আনতে হবে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ। নষ্ট রাজনীতির নিকট পানির সার্বভৌমত্ব আজ ভূলুণ্ঠিত। চীন-নেপাল-ভারত-ভুটান-বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে জল বণ্টনে রাজনৈতিক মতৈক্য ছাড়া সমাধানের তেমন কোনো আশা নেই। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তি অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। সে সব বিষয়ে লেখা হয়েছে কাঁড়ি কাঁড়ি গ্রন্থ। কিন্তু তার পরিবেশগত বিপর্যয় যে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সভ্যতাকেই উন্মূল করতে চলেছে সে বিষয়ে কী আমরা আদৌ সচেতন? সময় এসেছে দেশবিভাগের পরিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে গবেষণা করার। তবে সেটিও যথেষ্ট নয়। আরও গভীরে যেয়ে এর কারণ ও সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে।

আবার সাগরের জোয়ারের পানিতে সয়লাব হওয়া থেকে বাঁচার উপায়ও বের করতে হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্ব এর জন্য দায়ী

ক্লোরোফ্লোরো কার্বনস (সিএফসি) নির্গমন বন্ধ দূরে থাক, কমাতেও রাজি নয়। গোটা পৃথিবীর অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের উক্তি পুনরায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "পুঁজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন ও বিনিয়োগে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসাবে নিতে পারে তারা। ব্যক্তি শিল্পোৎপাদক অথবা বণিক যতক্ষণ তার শিল্পোৎপন্ন বা কৃত পণ্যটি স্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারছে ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট, পরে সেই পণ্য অথবা ক্রেতার কী ঘটল তা নিয়ে তার ভাবনা নেই।" এর প্রাকৃতিক ফলাফল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। "অতি লাভজনক কফিগাছের শুধু একটি আবাদের জন্য কিউবায় স্পেনীয় বাগিচা মালিকেরা যখন পর্বতের বুকে অরণ্য ভস্মীভূত করে ছাই থেকে সার জোগাড় করেছিল, তখন গ্রীষ্মমতি প্রধানত শুধু প্রথম ফলাফল, শুধু নগদ ফলাফল নিয়েই ভাবিত।" ব্রিটিশের আগে ভারতে প্রকৃতিকে লালন করা হত পরম মমতায়, দেবতা জ্ঞানে তা পূজিত হত।

আজ যে আমাদের প্রকৃতি বিপর্যস্ত, জলবায়ুর পরিবর্তন যে ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এঙ্গেলসের লেখায়, "একমাত্র মানুষই প্রকৃতির ওপর নিজের ছাপ মেরে দিতে পেরেছে শুধু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আলাদা আলাদা প্রজাতিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে নয়, তার নিজের বাসস্থানের জলবায়ু এবং বাইরের চেহারাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, এমনকি গাছপালা জীবজন্তু গুলোকেও এমনভাবে বদলিয়ে দিয়ে যে, একমাত্র পৃথিবীর সামগ্রিক নির্বাপণ ছাড়া মানুষের কার্যকলাপের এইসব ফলাফলের অবলোপ কিছুতেই হবে না।" উন্নত বিশ্ব যারা বেশি বেশি সিএফসি গ্যাস উৎপাদন করে তারা আমাদের মতো দরিদ্র দেশকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার (adaptation) পরামর্শ দিচ্ছে আর আমাদের কাছেই কার্বন গ্যাস বিক্রি করে বেশি কার্বনজাত গ্যাস নির্গমন করে চলেছে। পরিস্থিতি ক্রমেই আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করছে। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি নেই।

তথ্যসূত্র

১. *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, সতীশ চন্দ্র মিত্র, লেখক সমবায়, ঢাকা, ২০১১
২. *বাংলাদেশের নদ নদী ও পরিকল্পনা*, কপিল ভট্টাচার্য, সংহতি, ঢাকা, ১৪১৪
৩. *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা
৪. *বাংলাদেশের জল ও জ্বালানি*, ম. ইনামুল হক, সংহতি, ঢাকা, ১৪১৮
৫. *কপোতাক্ষ-মধুমতীর তীর থেকে*, আমিরুল আলম খান, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮
৬. *বিপর্যস্ত ভৈরব-কপোতাক্ষ অববাহিকা*, আমিরুল আলম খান, গতিধারা, ২০১০
৭. *গাঙদ্বীপের সাতকাহন*, মো. আফসার আলী, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০১২

৮. *কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানে জনগণের পরিকল্পনা,* হাসেম আলী ফকির, পানি কমিটি, ২০০৯

৯. *রচনা সংকলন,* মার্কস-এঙ্গেলস, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১

১০. *পুঁজি,* কার্ল মার্কস, ১ম খণ্ড, ৩১ অধ্যায়

১১. *অবর বেলায় পাড়ি,* বনমালী গোস্বামী, নদীয়া, ২০১০

১২. *Beel Dakatia The Environmaental Consequences of a Development Disaster,* Ataur Rahman, UPL, Dhaka, 1995

নিবন্ধ

১৩. ‘বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা’, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, *রচনা সংকলন,* মার্কস-এঙ্গেলস, ২য় খণ্ড ১ম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২

১৪. কপোতাক্ষের কান্না, গৌরাঙ্গ নন্দী, *সাপ্তাহিক ২০০০,* ঢাকা

১৫. জলবায়ু পরিবর্তন : একটি মার্কসীয় অনুসন্ধান, নূর মোহাম্মদ, *হালখাতা,* এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১০

১৬. ‘নদী ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা : অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া হয় না’, ম. ইনামূল হক, *নদী ২০১১,* নদী ও প্রবাহ বিষয়ক বর্ষপত্র, ঢাকা, মার্চ ২০১১

১৭. ‘বাংলাদেশের নদী ও নৌ পরিবহন’, নূর কামরুন নাহার, *নদী ২০১১,* নদী ও প্রবাহ বিষয়ক বর্ষপত্র, ঢাকা, মার্চ ২০১১

১৮. ‘বাগেরহাটে অভিনব নদী বিপর্যয় এলাকাবাসী হতভম্ব, অনুতপ্ত’, তৌফিক মারুফ, *কালের কণ্ঠ,* ৮ জুন, ২০১১

১৯. ভবদহ : জোয়ারাধার বন্ধ মানে জলাবদ্ধতা, ইকবাল কবীর জাহিদ, অনিল বিশ্বাস, *প্রথম আলো,* ঢাকা, ২ জুলাই, ২০১২

২০. ভবদহে জোয়ারভাটা জোয়ারাধার বিরোধী ষড়যন্ত্র/ দুই শতাধিক জনপদ ডুবিয়ে মারার অশনিসংকেত, ভবদহ পানি কমিটি, যশোর, ২০১২

২১. সুন্দরবনের ভাঙন বাড়ছে, *দৈনিক প্রথম আলো,* ঢাকা, ১৯ অক্টোবর, ২০১২

[লেখক: আমিরুল আলম খান। শিক্ষাবিদ, লেখক।]

প্রসঙ্গঃ উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধতা ; এক ভুক্তভোগীর পর্যবেক্ষণ

মো. আফসার আলী

বঙ্গ নামের এই ভূ-ভাগের প্রাচীন ইতিহাসটা খুবই চিত্তাকর্ষক, একই সাথে গর্বেরও। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ৩২৬ খ্রি. পূর্বাব্দে ভারত বিজয়ে আসেন, তাঁর ভারত বিজয়ের আশা কিন্তু পূরণ হয়নি। তিনি পাঞ্জাব অবধি পৌঁছেছিলেন। পাঞ্জাবে এসে গঙ্গানদীর মোহনায় 'গাঙ্গে' বন্দর একই সাথে 'গঙ্গারিডি' নামের একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিম্নবঙ্গের 'গাঙে' বন্দরের সাথে গ্রিক ও রোমানদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ অবশ্য পূর্বেই ছিল। গঙ্গারিডি নামের শক্তিশালী রাষ্ট্রের খবরটা তিনি পাঞ্জাবে বসে পেয়ে গেলেন। ঐ রাজ্যের শক্তিমত্তার খবর, বিশেষ করে তাদের হস্তি বাহিনীর কথা শুনে বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর থেকেই আলেকজান্ডার ফিরে গিয়েছিলেন, পথিমধ্যে ব্যবিলনে বেচারা মারা গেলেন। বঙ্গের শক্তিমত্তা পরখ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। ভেলেরিয়াস ফ্লাক্কাস রচিত 'আরগনটিকা' গ্রন্থে গঙ্গারিডির বীরদের শক্তিমত্তার কথা উল্লেখ আছে। মহাকবি ভার্জিলের 'জর্জিকাস' কাব্যেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেই প্রাচীন গঙ্গারিডির 'বাঙ্গাল' বীরেরা আরও আগে ১৫৫০ খ্রি. পূর্বাব্দে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সাথে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। এই হিসেবে আমাদের প্রাচীন গঙ্গারিডির বয়স সাড়ে তিন হাজার বছরেরও অধিক। এই গঙ্গারিডি বা গাঙ্গরাষ্ট্র যে হাল আমলের কপোতাক্ষ-ভৈরব মধ্যবর্তী ভূভাগ তাতে বোধ করি কারুর কোনো সন্দেহ নেই। 'গঙ্গা' থেকে 'গাঙ'-এর উৎপত্তি। এখানকার নদীগুলো আজও 'গাঙ' নামে পরিচিত। এই ভূ-ভাগের ভূ-প্রাকৃতিক ইতিহাসে দেখা যায় সুন্দরবন সংলগ্ন এই অংশটি ইতোপূর্বে কমপক্ষে তিন বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জলমগ্ন হয়েছে, জনশূন্য হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে প্রাকৃতিক নিয়মে আবার এখানে পলি জমে ভূমি গঠিত হয়েছে। এখানকার মানুষ গড়েছে আবাস, গড়েছে ইতিহাস। সর্বশেষ ভূমিগঠন এবং সেখানে সৃষ্ট জঙ্গল বা 'বাদা'কে আবাদ করার লোমহর্ষক কাহিনী আছে যশোর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সতীশ মিত্রের বর্ণনায়। এই গ্রন্থে দেখি, ১৩৯৪ খ্রি. দিল্লির বাদশাহ মাহমুদ শাহের প্রতিনিধি হিসেবে খানজাহান আলী এখানে আসেন। এছাড়া বীর প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস তো অনেকেরই জানা। যাহোক, খানজাহান আলী এবং তাঁর অনুচররা যে পথ দিয়ে এই ভূ-ভাগে ঢুকেছিলেন, পথিমধ্যে নানা স্থানে অস্থায়ী আস্তানা তৈরি করে সেখানে পানীয়জলের

জন্য পুকুর কিংবা দিঘি খনন করেছিলেন, আজকের স্থায়ী জলাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে সেই সব 'পথ' 'ঘাটে'র অতীত এবং পুকুর-জলাশয়ের হাল দশা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

প্রাচীন আমল থেকে এখানে 'পথের' সাথে 'ঘাট' নামের পৃথক একটা শব্দ একত্রে যুক্ত ছিল। ঘাটকে ঘিরেই ছিল সব পথ। আবার নদীর পাড়েই ছিল সব ঘাট। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে যাবার বাহন ছিল নৌকো। বর্ষায় পথগুলোতে ছোট নৌকো চলত অবশ্য পায়ে হেঁটেই মানুষ চলত বেশি। জোয়ারভাটার মধ্যেই ছিল মানুষের জীবনপ্রবাহ। ছোট-বড় সব দ্বীপে ঐসব মানুষের বসতি। ভূগোলকের ২১.৩৮ থেকে ২৩.৪৭ অক্ষাংশে এবং ৮৮.৪০ থেকে ৮৯.৫৮ দ্রাঘিমাংশের এ ভূভাগ কপোতাক্ষ-ভৈরব অববাহিকার বঙ্গোপসাগর বরাবর সুন্দরবন এবং তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ মিলে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল, যা মূলত হাজার দ্বীপমালার সামষ্টিক একটা চিত্র। ভূ-প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার দ্বীপগুলো 'ব'-এর আকৃতি বিশিষ্ট বিধায় 'ব-দ্বীপ'। এখানকার এই ব-দ্বীপগুলোকে একই সাথে 'নিষ্ক্রিয় দ্বীপ' বলা হয়। এই নিষ্ক্রিয় দ্বীপগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত। (ক) মৃত 'ব-দ্বীপ' (খ) পরিণত 'ব-দ্বীপ' এবং (গ) জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ 'ব-দ্বীপ'। হাল আমলের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়াসহ পুরো চব্বিশ পরগনা তার সাথে অধুনা খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের যশোর অবধি বিস্তৃত অঞ্চলটি মৃত ও পরিণত 'ব-দ্বীপ' এলাকা। যশোর শহরের দক্ষিণাংশ এর সাথে খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা এবং সংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমের এলাকাগুলো জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ 'ব-দ্বীপ' এলাকা। এই অংশের ভূমিগঠন ক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় দু'বার এখানে জোয়ার এবং দু'বার ভাটা হয়। জোয়ার-ভাটায় পলি ছড়িয়ে এখানকার ভূমিগঠন ক্রিয়া চলবে এটাই হল প্রাকৃতিক নিয়ম।

উপকূলীয় অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ এলাকার ভূমিগঠনের প্রকৃতি লক্ষ করলে সেখানে দেখা যাবে অদ্ভুত এক চিত্র। পুরো প্লাবন এলাকার ভূমিগঠন ক্রিয়া একই সমতলে হলেও এখানে পলিপতন ক্রিয়া কিন্তু সমান তালে সংগঠিত হত না। জোয়ারের পানিপ্রবাহের গতিপথে 'ঘোল' 'কানাল' নামের দু'টো পৃথক প্রবাহধারা লক্ষ করা যায়। 'ঘোল' বলতে জোয়ারে কিম্বা ভাটায় প্রবল স্রোতের মধ্যকার ঘূর্ণাবর্তকে বুঝায়। বাতাস যেমন প্রবাহের পথে ছোট-বড় ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে জোয়ার-ভাটার পানিও তেমনি তার দুর্দান্ত গতিপথে বাধাপ্রাপ্ত হলে ঘূর্ণাবর্ত বা 'ঘোল' সৃষ্টি করে। বড় বড় নদীর ঘূর্ণাবর্তাংশে নৌকো চালানো বিপদজনক, যে কোনো সময় নৌকোডুবি ঘটতে পারে। অতি সংগত কারণেই ঘূর্ণাবর্ত বা ঘোলের ফলে ঐ অংশে পলি পতন হয় না বরং পতিত পলি ঘোলের কারণে স্থানান্তরিত হয়। জোয়ারের পানি নেমে গেলে ঐ স্থান নিচু থেকে যায়, পাশের অংশ পলি জমে উঁচু হয়। ভিন্ন আর এক চিত্র 'কানালে'র ক্ষেত্রে। নদীর গতিপথে থাকে ছোট-বড় বাঁক। স্রোতের গতিপথে দেখা যায় নদীতে জোয়ার কিংবা ভাটার পানি ঐ বাঁকে বাঁকে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে জোয়ার কিংবা ভাটার

সময় ঐ সকল বাঁকে বাঁকে তীর বরাবর কম গতিসম্পন্ন একটা স্রোত উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়। সে কারণে ঐ সকল বাঁকের উল্টো স্রোতাংশে পলি পতন একটু বেশি হয়। বাঁকে বাঁকে এই উল্টো স্রোতের প্রবাহকে বলে 'কানাল'। তাই এই 'ঘোল' ও 'কানালে'র কারণে পুরো প্লাবনভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পলি পতন হয় কোথাও উঁচু কোথাও-বা তা নিচু। এভাবে আস্তে আস্তে চর জাগার মতো ছোট ছোট দ্বীপগুলো গড়ে উঠে, এগুলোর পাশে থাকে নিচু জলাভূমি। এ ধারায় আস্তে আস্তে ভূমিগঠন চলতে থাকে। এ কারণেই নদীর গতিপথের দিকে তাকালে সেখানকার চিত্রে দেখা যায়, জোয়ারের পানিতে পলিপ্রবাহে নদীগুলোর এক এক বাঁকে তীর বরাবর ভূমিগঠনের চিত্রগুলো এক-এক রকম। কোথাও নদীর দুই পাড় সমানভাবে উঁচু থাকে না, এক বাঁকে এক পাড় উঁচু হলে অন্য পাড় থাকে নিচু। তাইতো কবির কণ্ঠে শুনি, 'একধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি'। উপকূলীয় এলাকার বিশাল কোনো জলাভূমির মধ্যে জোয়ার-ভাটায় পলি জমে গড়ে ওঠা দ্বীপে এবং একই ধারায় গড়ে ওঠা নদীর 'উঁচু পাড়ে' আস্তে আস্তে মনুষ্যবসতি গড়ে উঠেছে। এই দ্বীপ কিংবা উঁচু পাড়ের উপর গড়ে ওঠা বাড়িঘরের বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনে পানীয়জলের জন্য খনন করেছে পুকুর-জলাশয়, যাতায়াতের জন্য সৃষ্টি করেছে পথ-ঘাট। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে যাবার জন্য এদের বাহন ছিল নৌকো। আবার শুষ্ক মৌসুমে ওটা পায়ে চলা পথ হত, পরিবহনের প্রয়োজনে সেখানে গরুর গাড়িও চলত। গত ষাটের দশক অবধি এর একটা ক্ষীণ ধারা অব্যাহত ছিল। এভাবে উপকূলীয় এলাকায় তৈরি হয়েছিল পায়েচলা পথ, এই পথের সাথে ছিল 'ঘাট'। আলোচ্য জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ এলাকার পথ বা রাস্তাগুলো সর্বত্রই ছিল বসতভিটার চেয়ে নিচু। বর্ষাকালে জোয়ারের পানি বসতবাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করত পলিপতন হত, বসতভিটা উঁচু হত। ভাটায় ঐ পানি 'পথ' দিয়েই নেমে যেত। এসব পথের সাথে ছিল নিকটবর্তী নদীর যোগ।

আগেই বলেছি বর্ষা মৌসুমে বসতবাড়ি থেকে নিচু পানিপ্রবাহের 'পথ'গুলো শুষ্ক মৌসুমে পায়েচলা পথে রূপান্তরিত হত। মানুষের প্রয়োজনে ওগুলো ক্রমে উঁচু করা হয়েছে। উনিশ শতকের দিকে উপকূলীয় অঞ্চলে এই উঁচু হওয়া কাজটার সূত্রপাত ঘটেছে। এদিকে ভূমিব্যবস্থাপনার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের দিকে জমিদারদের হাতেই ছিলভূমিব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতির লাগাম। চাষাবাদে কৃষকের পাশাপাশি সময়ের সিঁড়িতে রায়তের উদ্ভব হয়েছে। সেকালে জমির মালিকানায় ছিলেন জমিদাররা। 'জন্মাধিকার' ভিত্তিক জমিদারিতে জমি, কৃষক-রায়ত ও জমিদার একসূত্রে বাঁধা ছিল। বাংলার পথঘাট তারাই দেখাশুনা করত। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমির মালিকানার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। মালিকানা জমিদারদের হাত থেকে সরকারের হাতে চলে যায়। ব্রিটিশরা তাদের শাসনের শুরুতেই আঁচ করেছিল জমির প্রতি বাঙালির অতিরিক্ত প্রীতির ধার। তাই বাঙালিকে জব্দ করতে তারা বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় হাত দেয়। এ লক্ষ্যে তারা

Regulation-viii of ১৭৯৩ নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবতারণা করে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার ভূমির ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে তারা ভূমি বা জমিকে 'Property' হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ব্রিটিশ Land Lord Class-এর মতো সুবিধাভোগী জমিদারশ্রেণী সৃষ্টির সূচনা করে। বাংলায় বিদ্যমান জমিদারি ব্যবস্থায় 'Status' বা জন্মাধিকার হরণ করে পুরো ব্যবস্থাকে 'Contract' বা চুক্তির আওতায় আনে। সময়ের ব্যবধানে ঐ আইনকে আরও সম্প্রসারিত করে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে Regulation-ii of ১৮২৯ জারি করে। 'দুয়েম কানুন' নামের ঐ কালাকানুনের ছাঁকনির মাধ্যমে নিষ্কর বা লাখেরাজ সম্পত্তির ওপর তারা হাত দেয়। ঐ লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির আওতায় ছিল বাংলার হাট-বাজার, নদী-নালা, রাস্তা-ঘাট, মক্তব, মসজিদ-মন্দির সব। ঐ নিষ্কর সম্পত্তির আয়েই চলত এখানকার শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম সব। ঐসময় ঐ 'পথ'গুলো রাস্তায় রূপ লাভ করলেও ওর সাথে 'ঘাটের' যোগাযোগটা কিন্তু অব্যাহত ছিল। নদীমাতৃক দেশের প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই ছিল আমাদের 'পথ-ঘাট' কিংবা 'রাস্তা-ঘাট'। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভূমিমালিকানার পাশাপাশি নদীশাসনের কাজেও হাত দেয়। তারা সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে আমাদের মিষ্টিপানির মূল উৎস গঙ্গা থেকে পূর্ববাংলার অন্য নদীগুলোকে পৃথক করার কাজ শুরু করে। প্রথমে তারা কপোতাক্ষ-ভৈরবের উৎসমুখে মাথাভাঙ্গার স্রোত নিয়ন্ত্রণের পথে পা বাড়ায়। আমাদের উপকূলীয় এলাকায় তার প্রভাব প্রথমদিকে খুব একটা পড়েনি। বৈশ্বিক পর্যায়ে পুঁজি বিকাশের ধারায় এক সময় সাম্রাজ্যবাদীরা পুরো সভ্যতাকে গ্রাস করতে প্রয়াসী হয়। যার সুফল কিংবা কুফল উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছাতে খুব বেশি দেরি হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাংলার ভূমিব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ধারায় পথ-ঘাট, খাল-বিল, নদী-নালার চেহারাও পরিবর্তিত হতে থাকে।

ব্রিটিশদের সাম্প্রদায়িক অপরাজনীতির কূট চালের ফসল ভারতবিভক্তি, একই সাথে বঙ্গবিভাগ কার্যত রাজনৈতিক ভাবে পূর্ববাংলায় নদীনালার উৎসকে গ্রাস করে। একই ধারায় '৪৭ উত্তর-কালে পূর্ববাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে নদীশাসনকল্পে উপকূলীয় এলাকার নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে নদীহত্যার মহোৎসব শুরু হয়। ইতোমধ্যে গঙ্গার সাথে কপোতাক্ষ-ভৈরবের যোগাযোগটুকু ছিন্ন হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত ঐ বাঁধের ফলে বাঁধ মধ্যস্থ ভূ-ভাগে পলিপতনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়, ভূমিগঠন বন্ধ হয়। স্রোতের টানে উঠে আসা পলি নদীতেই পড়া শুরু হয়। জালের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত বড় বড় নদী ও তার শাখাগুলো নদীশাসনের কবলে পড়ে। ষাটের দশকে East Pakistan Water and Power Development Authority সংক্ষেপে ইপি ওয়াপদা পূর্ববাংলার পুরো উপকূলীয় অঞ্চলকে ৯৭টি পোল্ডারে ভাগ করে নদীশাসন কাজে হাত দেয়। মোট ঐ পোল্ডারগুলোর মধ্যে ৩৭টিই হল সুন্দরবন

সংলগ্ন এলাকায়। মহাসমারোহে শুরু হয় বাঁধ। উপকূলীয় এলাকা জুড়ে বড় নদীগুলোর তীর বরাবর উচু ভেড়িবাঁধ তৈরি হয়, ছোট ছোট নদী-খাল সবই আটকা পড়ে যায়। নির্মিত হয় স্লুইসগেট। এর পাশাপাশি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের আওতায় ছোট ছোট খাল, নালাগুলো আটকে তৈরি হয় ব্রিজ-কালভার্ট। বসতি এলাকার পানি নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত 'পথ'গুলোর বুকে মাটি ফেলে উঁচু করা হয়। প্রাথমিকভাবে পথগুলো মধ্যবর্তী অংশ উঁচু হয়ে দু'পাশ বরাবর পানি নিষ্কাশনের পৃথক পথ খোলা থাকে। সময়ের সাথে রাস্তা চওড়া হয়ে কিংবা খাসজমি বন্দোবস্তের আওতায় পড়ে ঐ নালাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে জলাবদ্ধতার সূত্রপাত এখান থেকেই। সময়ের ব্যবধানে পানিপ্রবাহের পুরো নেটওয়ার্কই ধ্বংস হয়েছে। বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি এলাকার জোয়ারের পানি প্রবেশ বন্ধ হওয়ার কারণে ঐ অংশে শুধু যে ভূমিগঠন বন্ধ হয়েছে তাই নয়, পানির স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণে বড় বড় নদী ও তার মুক্ত শাখাগুলো স্রোত হারিয়ে ফেলেছে। পানিপ্রবাহের নালাগুলো রুদ্ধ করে পথগুলো উঁচু হয়ে একই সাথে আস্তে আস্তে দু'পাশে বৃদ্ধি পেয়ে সেগুলো রাস্তায় রূপ নেয়। প্রসঙ্গত 'পথ' শব্দের আভিধানিক অর্থ গমন করা অ+(ণ), ইংরেজিতে ওটা Way, যা দ্বারা গমনাগমন করা হয়। 'ঘাট' নামের বাংলা শব্দটার কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই, ওটা ইংরেজিতে 'Ghat' লেখা হয়। Station নামের একটা শব্দ এসে ওটাকে সরিয়ে দিয়েছে। আবার রাস্তা অর্থ 'সরণি', ইংরেজিতে ওটা Road। পুঁজিবাদের বিকশিত ধারায় যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করতে পথগুলো রাস্তায় উন্নীত হয়েছে। রাস্তাগুলোর বুক আরও উঁচু হয়েছে, সেখানে ইট-পাথর পড়েছে, ওগুলো সড়কে রূপান্তরিত হয়েছে। এদিকে প্রবাহ বন্ধ হবার কারণে এলাকার অধিকাংশ নদীপ্রবাহ হারিয়ে মজে গেছে। হারিয়ে যেতে বসেছে দক্ষিণ জনপদের সুবিশাল নদীপথ।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় এলাকার হাল আমলের

'রাস্তা' 'সড়ক', 'মহা-সড়কের' সাথে নিকট অতীতের 'রাস্তাঘাট' তারও পূর্বের 'পথঘাট' নিয়ে এখন ভাবতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে সুপেয় পানি নিয়ে। ইতোমধ্যে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে সেখানে খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে। একই সাথে ভাবতে হচ্ছে উপকূলীয় নদ-নদীর দু'ধারে তৈরি ভেড়িবাঁধ নিয়ে, যেগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পলি পতন নিয়ন্ত্রিত হয়ে পুরো বিল এলাকা এখন নদীর তলদেশের তুলনায় নিচু হয়ে সেখানে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সুন্দরবনের ভূ-ভাগের উচ্চতা থেকে পুরো জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ এলাকার ভূভাগ গড়ে ৪/৫ ফুট নিচু। বন্যানিয়ন্ত্রণ-পূর্ব বাঁধগুলো এখন রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাস্তা হল যোগাযোগের বড় মাধ্যম। উৎপাদিত কৃষি কিংবা শিল্পজাত পণ্য পরিবহনের জন্য রাস্তার ভূমিকা আড়াল করার কোনো সুযোগ নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে তাই রাস্তার উন্নয়ন একসূত্রে গাঁথা। মজার ব্যাপার হল আভিধানিক সেই পথ বা ডধু যা

দ্বারা গমনাগমন করা হয়, সেই অর্থে পথ বলতে এখন শুধু রাস্তাকেই মনে করা হচ্ছে। নদীপথ বলতে শুধুই যেন জল-কাদা, যার মধ্যে আধুনিক 'ভদ্রতা' নেই। নদীমার্তৃক ভূ-ভাগের মূল নদীপথ অনেক দূর সরে গেছে। পত্রপত্রিকায় দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট নদীপথের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ এখন নৌচলাচল-অযোগ্য। নদীপথের পরিবর্তে সড়কপথই মালামাল কিংবা যাত্রী পরিবহনে গুরুত্ব পাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই উন্নয়নের নামে রাস্তা, সড়ক-মহাসড়কের উন্নয়নই প্রাধান্য পাচ্ছে। আমাদের মতো নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতিপ্রদত্ত নিখরচার নৌপথ পরিহার করে অধিক ব্যয়নির্ভর সড়কপথের দিকে ধাবিত হবার মতো বিলাসী চিন্তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে মার্কসীয় চিন্তাবিদ নূর মোহাম্মদ সাহেবের 'জলবায়ু পরিবর্তন : একটি মার্কসীয় অনুসন্ধান' শীর্ষক নিবন্ধে। ঐ নিবন্ধে বলা হয়েছে,'এখন যুক্তরাষ্ট্রে যত মানুষ তার অর্ধেকের বেশি গাড়ি। গাড়িশিল্প যত শক্তিশালী হয়ে উঠে তার সাথে সাথে নগর ও গ্রামের মধ্যে ভূ-প্রকৃতিগত পার্থক্য কমে যায়, সড়কব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এবং এই শিল্পটির বিস্তার শুরু হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়কাল থেকে'। ঐ নিবন্ধে তিনি আরও দেখিয়েছেন, 'বর্তমানে বিশ্বে আনুমানিক ৭০ কোটির বেশি রেজিস্টার্ড গাড়ি রয়েছে।....... বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সালে তা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।' গাড়ি বাড়লে রাস্তা বা সড়কও বাড়াতে হবে এটাই স্বাভাবিক। গাড়িতো আর বসিয়ে রাখা যাবে না। তা ছাড়া দ্রুত ও বিলাসী পরিবহনে গাড়িই তো সেরা। পুঁজিবাদের বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য এখন বিশ্বব্যাপী। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এমনসব সংস্থার নামে সাহায্যের আকারে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা এর বাইরে নই। অতএব, দাতা দেশগুলোর খায়েশ মেটাতে আমাদেরকে ঐ বিলাসী চিন্তায় সামিল হতে হচ্ছে। আমাদের অর্থনীতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি ওরাই নাড়াচাড়া করে। ওদের কারণে নিখরচার নদীপথ ফেলে ব্যয়বহুল সড়কের গান আমাদেরকে গাইতেই হবে।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে সাবেক আমলের 'পথ'গুলো বিবর্তনের ধারায় 'ঘাট'গুলো ত্যাগ করে রাস্তায় রূপান্তরিত হয়েছে আবার এই রাস্তা হাল আমলে 'সড়ক' কিংবা 'মহাসড়কে' রূপান্তরিত হয়েছে। বিবর্তনের ধারার অন্তঃস্থ শক্তি হিসেবে কিন্তু আমাদের স্বাধীন চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল না, তার পরিবর্তে উন্নত বিশ্বের চোখধাঁধানো চিত্রের অন্ধ আকর্ষণে সেখানে উপনিবেশিক মানসিকতাই সদা ক্রিয়াশীল। আগেই বলেছি, অতীতে 'পথ' নামক শব্দটার সাথে 'ঘাট' বলে আরো একটা শব্দ যুক্ত ছিল। পথগুলো রাস্তায় রূপান্তরিত হলেও অতীতে ঘাট শব্দটা সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। কিন্তু হাল আমলের সড়ক শব্দটা উদ্ভবের সাথে সাথেই 'ঘাট' শব্দটা একেবারেই মুছে গেছে। সড়কের সাথে ঘাটের জায়গায় এখন যুক্ত হয়েছে 'মহাসড়ক' নামের নতুন শব্দ। আগে

যেখানে উপকূলীয় এলাকার ঘাটে ঘাটে স্টিমার, লঞ্চ, নৌকো ভিড়ত, ওদের যায়গা দখল করেছে বাস-ট্রাক। সাথে এনেছে নছিমন, করিমন, আলম সাধুর মতো উৎকট নামের উদ্ভট সব যান্ত্রিক বাহন। স্মরণ করা যেতে পারে উপকূলীয় এলাকায় মনুষ্যবসতির সময় থেকেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সেখানকার পথ-ঘাটগুলোর সাথে মিলিয়ে যানবাহনের উদ্ভব হয়েছিল। এক চর থেকে অন্য চরে চলাচলে বাহন ছিল নৌকো। দেশীয় প্রযুক্তিতে নৌকো তৈরি হত, ঐ শিল্পের জন্য নিয়োজিত ছিল 'মিস্ত্রি' নামের একশ্রেণীর কারিগর। সময়ের ব্যবধানে নৌকো শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়েছে। ছোট 'বাছাড়ি' নৌকো ছাড়াও তৈরি হয়েছে 'পানসী'- 'বজরা'র মতো বড় বড় নৌযান। দাঁড়-বৈঠা নিয়ে মানুষের হাতে ওগুলো চালিত হত। গৃহস্থের নৈমিত্তিক প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক কাজে দূরবর্তী স্থানে নৌকা ব্যবহৃত হত। মালামাল হাটে-বাজারে আনা-নেয়া, যাত্রী পরিবহন সর্বত্রই ছিল নৌকোর বিচরণ। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর তা বিস্তারের পথ ধরে আমাদের এখানকার নদীগুলোতে নৌকোর পাশে লঞ্চ, স্টিমার চলত, ঘাটে ঘাটে ভিড়ত। বাজারগুলোকে কেন্দ্র করে ঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল, ঘাটে আসার পথগুলোতে শুকনো মৌসুমে চলত গরুর গাড়ি। এটাও নির্মিত হত দেশীয় নিজস্ব প্রযুক্তিতে। এই শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল গাড়ি তৈরির 'মিস্ত্রি' বা কারিগর। নদীমাতৃক দেশের সবচেয়ে টেকসই উপযুক্ত বাহন এই নৌকো ও গরুর গাড়ি। এতে কার্বন এমিশন হত না, পরিবেশের সাথে ছিল এর সখ্যতা। রাস্তার উন্নয়নের সাথে নৌকোর ব্যবহার কমতে শুরু করে বর্তমান তা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। পথগুলোর বুক উঁচু হয়ে রাস্তায় রূপ নিলে সেখানে নৌকোর পরিবর্তে মোটরগাড়ি, গরুর গাড়ির পরিবর্তে এসেছে মানুষচালিত ভ্যান, নছিমন-করিমন নামের ইঞ্জিনচালিত সব বাহন।

উপকূলীয় ভূ-ভাগ বিশেষ করে জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ 'ব-দ্বীপ' এলাকার জলাবদ্ধতার হাল দশার প্রকৃতি এবং পুরো নিষ্ক্রিয় দ্বীপ এলাকার মৃত ও পরিণত ব-দ্বীপ অংশের (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর থেকে যশোরের উত্তর ভাগ) প্রকৃতি আবার সমমাত্রিক নয়। পথ-ঘাট থেকে রাস্তা-ঘাট, শেষে সড়ক-মহাসড়ক পর্যায়ে উন্নীত করণ এবং পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রেলপথের সংযোজন মৃত ও পরিণত ব-দ্বীপ এলাকায় যে সুফলটুকু বয়ে এনেছে জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ এলাকায় তাতো হয়ইনি বরং হয়েছে উল্টোটা। জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ এলাকার ব্যয়বহুল সড়কব্যবস্থার বিদ্যমান বেহাল দশার মধ্যে এ সত্যই প্রতিভাত হচ্ছে যে, ঐ ব্যবস্থাপনার ফলে ভূমিগঠন ক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কার্যত যোগাযোগ সৃষ্টি না-হয়ে পুরো এলাকাই বিছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমনিতে গঙ্গার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে গঙ্গার উপর সৃষ্ট ফারাক্কা বাঁধ বাংলার পূর্বাংশের নদীপথের নাব্যতা নষ্ট করেছে নদীর প্রাণশক্তি হরণ করেছে। পানিসার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের কাছে হেরে গেছে। এরপরও উপকূলীয় অঞ্চলের যে

নদীপথটুকু আমরা আরও কিছুকাল ব্যবহার করতে পারতাম, রাস্তা-সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে সেটুকুও ধ্বংস হয়ে গেছে। সময়ের পরীক্ষায় এটাও প্রমাণিত যে, নৌকোর মতো সুলভ প্রাকৃতিক পরিবেশবান্ধব বাহনকে ছুড়ে ফেলে সড়কনির্ভর হয়ে আমরা যে শুধু পরিবেশবিধ্বংসী যান্ত্রিক বাহনের কবলে পড়েছি তাই নয়, বন্যা কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালে সবচেয়ে উপযোগী সাহায্যকারী বাহনকে হারিয়ে ফেলেছি। নৌকোর সাথে সাথে মাটির রাস্তায় ইট কিংবা পিচ পড়ায় সেখানে গরুর গাড়ি চলাচলও বন্ধ হয়েছে।

পানির প্রাকৃতিক গতিকে কখনও 'নিয়ন্ত্রণ', কখনও 'শাসন' আবার কখনও 'ব্যবস্থাপনা'র আওতায় ফেলে কার্যত নদীকে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে সরকারের 'পানিনীতির' বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। আমাদের পানিনীতিতে বলা হয়েছে 'যেহেতু মানুষের জীবনধারণ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজন, সেকারণে সমন্বিত ও সুষম ভিত্তিতে দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদ্ধতি কার্যক্রম গ্রহণ করাই সরকারের নীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য স্বয়ম্ভরতা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের উন্নততর জীবনমান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় যাবতীয় লক্ষ্যসমূহ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার জন্য এ নীতিমালা রচিত হয়েছে'। লক্ষণীয় যে আমাদের পানিনীতিতে ঘুরেফিরে সেই 'ব্যবস্থাপনার' কথাটা এসেছে। প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পানিপ্রবাহকে ইতোপূর্বে বাধাগ্রস্ত করে মনুষ্যকৃত ব্যবস্থাপনার কারণে ধীরে ধীরে যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ ব-দ্বীপটির ভূমিগঠন বন্ধ হওয়ায় সেটা এখন সুন্দরবনের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিচু এলাকায় পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর এই ভূ-ভাগ মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। সরকারি পানিনীতির মধ্যে এসব সংকট উত্তরণের সুস্পষ্ট কর্মধারা অনুপস্থিত। স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে নদীর তলদেশ উঁচু হয়েছে, পুরো উপকূলীয় এলাকায় মারাত্মক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। যশোর-খুলনার ইতিহাস-প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র উপকূলের এই জলাবদ্ধতাকে 'জলগণ্ড' রোগ হিসেবে শতবর্ষ আগেই আখ্যা দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে সেই শতবর্ষ আগে 'পথ'গুলোকে 'রাস্তা'য় রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে খণ্ড খণ্ড জলাবদ্ধতার কারণে পানির Echo System বা বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাকে যদি 'জলগণ্ড' রোগ হিসেবে আখ্যা দেয়া সঙ্গত হয়, তাহলে হালের ব্যাপক ও স্থায়ী এই জলাবদ্ধতাকে কী নামে আখ্যা দেয়া যায় ?

ইতোমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যক্তিমালিকানার পুকুর ছাড়াও খানজাহান আলী খনিত বড় বড় জলাশয়গুলোর পানি ক্রমেই অপেয় হতে শুরু করেছে। স্থায়ী জলাবদ্ধতা তার ওপর প্রাকৃতিক কারণে উপর্যুপরি বন্যা পুকুর-জলাশয়গুলোকে একেবারেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পুকুর-জলাশয়ের পাড় ছাপিয়ে সেখানে লোনা পানি ঢুকছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে উপকূলীয় এলাকার সুপেয় পানির বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনা আবশ্যক। পানির সংগে মানুষের জীবনের সম্পর্ক। পানিপ্রবাহ মানুষের শুধু নয়, গাছপালা সহ প্রাণীজগতের পুরোজীবন প্রবাহ একসূত্রে গাঁথা। তাই পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হলে জীবনপ্রবাহে যে বাধা সৃষ্টি হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গত ২০০৪ সালে 'উত্তরণ' নামে একটা বেসরকারি সংস্থা তাদের পানি কমিটির ব্যানারে কপোতাক্ষ-ভৈরব অববাহিকার বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। ঐ পুস্তিকায় দেখছি : পৃথিবীর পানিসম্পদ অফুরন্ত হলেও সব পানি ব্যবহারযোগ্য নয়। পৃথিবীর মোট পানির ২.৫ ভাগ মাত্র মিষ্টিপানি। এই মিষ্টিপানির ৬৮.৯ শতাংশ থাকে তুষারাবৃত নদীতে, ০.০০৯ শতাংশ লেক ও নদীতে এবং ২৮ শতাংশের অবস্থান ভূ-অভ্যন্তরে। এসব মিষ্টিপানির ২৩ শতাংশ আবার ব্যবহৃত হয় শিল্প উৎপাদনে, ৬৯ শতাংশ কৃষি উৎপাদনে এবং ৮ শতাংশ গৃহস্থালির কাজে। পুস্তি কায় আরও বলা হয়েছে, পৃথিবীর ব্যবহার যোগ্য মোট মিষ্টিপানির মধ্যে ০.০২৫ ভাগ পানি পানযোগ্য। পানির এই ভাগ বণ্টনের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানি এখন খুবই মহার্ঘ। কপোতাক্ষ-ভৈরবের সাথে গঙ্গার যোগাযোগ থাকাকালে এলাকার নদীগুলোতে মিষ্টিপানির অভাব ছিল না। তখন মাটি খুঁড়লেই মিষ্টিপানি পাওয়া যেত, ইঁদারা, কুয়া, পুকুর ছিল মিষ্টিপানির আধার। বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রভাবে নদীর পানির লবণাক্ততাও হ্রাস পেত, এসব কারণে খানজাহান আলী এবং তার অনুচরবর্গ সুপেয় পানির জন্য এখানে খনন করেছিলেন অনেক পুকুর, দিঘি। সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তিপর্যায়ে আরও অনেক পুকুর খনিত হয়েছে। পুকুরগুলো আবার বাড়ির সৌন্দর্যের অংশ, সামগ্রিকভাবে তা গৃহরচনা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। কপোতাক্ষ-ভৈরবের উৎসমুখ বন্ধ হবার কারণে এখানকার পানিতে লবণাক্ততা বেড়েছে, তার ওপর সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় পুকুরগুলোর অপমৃত্যু ঘটেছে। এককালে পানিবাহিত রোগ কলেরা-বসন্ত রোধ করতে এখানে পুকুর-জলাশয়ের পানি ব্যবহার বাদ দিয়ে অগভীর নলকূপ বসিয়ে তার পানি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হত। নলকূপগুলোতে এখন আর্সেনিকের প্রভাব। আর্সেনিক আধিক্যের কারণে আর্সেনিকজনিত রোগের বিস্তৃতির পাশাপাশি নলকূপের পানি ব্যবহারে আমাশয়ের মতো আন্ত্রিক রোগের বিস্তার ঘটছে। লক্ষণীয় যে, পুকুরপাড়ে বসানো নলকূপের উচ্ছৃষ্ট পানি পুকুরে পড়ে পুকুরের পানি নষ্ট হচ্ছে। পানির Echo System বা বাস্তুসংস্থান নষ্ট হচ্ছে। আর্সেনিকজনিত রোগ ও আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধে আবার পুকুরের পানি ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। পুকুরপাড়ে PSF বা পুকুরপাড়ে ফিল্টারের ব্যবস্থা করতে বলা হচ্ছে। এ যেন 'পুনর্মুষিকভব'।

আরও লক্ষ করার বিষয় এই যে, ইতোপূর্বে নদীশাসনের নামে গৃহীত ব্যাবস্থাপনাকে যদিও-বা বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বলা হয়েছে, সেই এলাকা কিন্তু এখন নতুন ভাবে বন্যাকবলিত। ষাটের দশকে যেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যাকবলিত এলাকার আয়তন ছিল ১২/১২ শতাংশের মধ্যে, ২০০০ সালের প্রথম দশকে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪/৩৫ শতাংশে।

প্রতি বছরই বন্যাকবলিত এলাকার আয়তন বাড়ছে। এর ওপর উপকূলীয় এলাকার বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের অভ্যন্তরে মিষ্টিপানিতে ধানচাষের পরিবর্তে খালে-বিলে চিংড়িচাষের নামে বিলগুলোতে লোনাপানি আটকে রেখে পানির Echo System বা বাস্তুসংস্থান নষ্ট করা হচ্ছে। সবমিলে পুরো জলাভূমির বাস্তুসংস্থান বিনষ্টের সাথে সাথে ভূমির উর্বরতাও নষ্ট হচ্ছে। গাছ-পালা থাকছে না, পশু-পাখি, মাটি-পানি সর্বত্রই এর প্রভাব; পুরো জনপদ এখন ধ্বংসের পথে। আমাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি, গাছপালা, পাখ-পাখালি, নদী-নালাসমৃদ্ধ সুন্দর এক প্রাকৃতিক নিসর্গ। আমাদের সেই ফুল-ফল, রূপ-রস-গন্ধে ভরা, হাটের দেশ, ঘাটের দেশ, নদীর দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ, নৌকোর দেশ, এখন শুধুই ইতিহাস। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক সব সমস্যা সমাধানে ‘পথ’ থেকে ‘রাস্তা’, ‘রাস্তা’ থেকে ‘সড়ক’, ‘সড়ক’ থেকে ‘মহাসড়ক’ এই বিবর্তনের ধারায় নদীর মৃত্যুর সাথে সাথে ঘাটগুলো উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্ট স্থায়ী জলাবদ্ধতার বিষয়টি নিয়ে এখন ভাবতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ সমস্যার গোড়ায় না-গিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে ‘ব্যবস্থ্যপনা’র আওতায় কথিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এগিয়ে গেলে একদা বীররসে সিক্ত আমাদের গর্বের এই ভূ-ভাগকে রক্ষা করা যাবে বলে মনে হয় না। সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। নদীর পাড়ের মানুষের কাছে গেলে সমাধান পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, নদীমাতৃক ভূ-ভাগের নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং তাকে কেন্দ্র করে রচিত প্রাণ-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারের মধ্যেই রয়ে গেছে এর সমাধান।

তথ্যসূত্র

বাঙালির সংগ্রামের পটভূমি- ড. জাহারাবি রিপন, *ভোরের কাগজ*, ৩০ মে ২০১২। *বিপর্যস্ত ভৈরব কপোতাক্ষ অববাহিকা ও নানা প্রসঙ্গ* আমিরুল আলম খান। *গাঙদ্বীপের সাত কাহন*– মো. আফসার আলী। *জলবায়ু পরিবর্তন: একটি মার্কসীয় অনুসন্ধান* নূর মোহাম্মদ। ২০০৪ সালে উত্তরণ প্রকাশিত- *সুপেয় পানির সন্ধানে* শীর্ষক পুস্তিকা।

[লেখক: প্রবন্ধ / নিবন্ধকার। নদী ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষক।]

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী-প্রবাহ ও পরিবেশ রক্ষায় করণীয়

অ নি ল বি শ্বা স

সূচনা: সমূহ উদ্বেগের বিষয় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জনগণ ও জনপদ এক গভীর পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। একদিকে লবণাক্ততা আরেক দিকে জলাবদ্ধতা। নদীভাঙ্গন, আর্সেনিক দূষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া সবকিছু মিলে চারিদিকে সঙ্কটের পর সঙ্কট আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরছে। সবাই আমরা চিন্তায় পড়েছি। এখন কী করণীয়? পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য, বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য খণ্ড খণ্ড আন্দোলন, আলোচনাসভা, সেমিনার ইত্যাদি হচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমন্বয় হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়ার সমস্যা তো আছেই, তাছাড়া রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। নদী ও পরিবেশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমানের চেয়ে প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেশি, সেহেতু এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়তো অসম্ভব বিষয় নয়। তবে সমস্যা সমাধানে সাময়িক ও আশু প্রতিকারের তুলনায় আজ অনেক বেশি প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হওয়া। প্রয়োজন আমাদের পরিবেশবিজ্ঞানী, পরিকল্পনায় নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও মাঠের মানুষের মধ্যে একটা কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা। তাই বর্তমান প্রবন্ধটি বাংলাদেশে কয়েক দশক যাবত বন্যানিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান কর্ডন পদ্ধতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কী ভাবে এই পদ্ধতি বন্যাসমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, নিয়মিত বন্যার সুফল থেকে প্লাবন-ভূমিকে বঞ্চিত করছে, কর্ডনের ভেতরে বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্যার সৃষ্টি করছে এবং কীভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয় করছে। এরপর এতে মুক্ত প্লাবনের পক্ষে একে একে যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আনুষঙ্গিক পদ্ধতির মধ্যে নদীখাত এবং অপরাপর জলাশয়গুলো খনন, প্লাবন-ভূমিতে পানিপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতাগুলোর অপসারণ, গ্রামীণ এবং শহুরে আবাসন ক্ষেত্রগুলো উঁচু করা, খালনালার সংরক্ষণ এবং বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর চারিপাশে নিবিড় গ্রামীণ বসতি গড়ে তোলা। এখানে দেখানো হয়েছে মুক্ত-প্লাবন পদ্ধতি পুনস্থাপিত হ'লে কী কী সুফল পাওয়া যেতে পারে এবং কোন কারণে কর্ডন পদ্ধতির চেয়ে মক্ত-প্লাবন নীতি শ্রেষ্ঠ এবং উন্নততর।

সব সমস্যার মূলে নদীসমস্যা :

একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, নদীসংক্রান্ত সমস্যাই এ এলকার প্রধান সমস্যা। আর সে কারণে পরিকল্পনাবিদরা নদী নিয়েই তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছেন। নদীতে বাঁধ দেওয়া, নদীর পাড় উঁচু করা, আরও আরও স্লুইসগেট বানানো এসবই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ আশু সমাধানের দিকেই তাদের নজর বেশি। অবশ্য পরিকল্পনাবিদরা ও ক্ষমতাসীনরা জনগণের চাপের কারণে চটজলদি সমাধানের প্রতি বেশি আগ্রহী হবেন এটা খুব একটা অস্বাভাবিকও নয়। পাশাপাশি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-আত্মসাতের বিষয়টি এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, মনে হয় সমাধানের চেয়ে সমস্যা জিইয়ে রাখার দিকেই প্রকল্পপ্রণেতাদের ঝোঁক বেশি। সমস্যার উৎস কোথায়, তার স্বরূপ কী, সেসব বিষয় থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখলে বা গুরুত্ব না-দিলে কোনো কার্যকর সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। তাই, যাই করতে চাওয়া হোক-না কেন, সমস্যার উৎস ও স্বরূপ উপলব্ধির ওপর আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

সমস্যার সূত্রপাত কোথা থেকে

অতীতে গঙ্গার প্রধান প্রধান শাখা দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মিঠাপানি প্রবাহিত হ'ত। এ অঞ্চলে গড়াই (গৌরী)-মধুমতি, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা হ'ল গঙ্গার প্রধান প্রধান শাখা। কপোতাক্ষ ভৈরবের প্রধান শাখা। কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, সরাসরি মাথাভাঙ্গা থেকে গঙ্গার পানিতে পুষ্ট হ'ত। চিত্রা, ব্যাঙ, বেগবতী, ফটকী, কালীগঙ্গা, রূপসা, দড়াটানা, বেতনা, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, ভদ্রা, খোলপটুয়া, আড়পাঙ্গাশিয়া, শিবসা, মর্জার, ঢাকি, মেনস, কয়রা, ইছামতি, কদমতলি, মালঞ্চ, সাহেবখালি, কাকশিয়ালি সমূহ নদ-নদী ভৈরব-মাথাভাঙ্গার পথেই গঙ্গার মিঠাপানির অফুরন্ত প্রবাহ পেত যা সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে জালের মতো বিস্তৃত হয়ে নানা ধারায় বঙ্গোপসাগরে পতিত হ'ত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সভ্যতা, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, বাণিজ্যসহ অর্থনীতি, সংস্কৃতি, উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য এই সকল নদীর ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। মুখে পলি জমে গঙ্গার সাথে মধুমতি বিচ্ছিন্ন হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে; মাথাভাঙ্গার সাথে ভৈরব-কপোতাক্ষ, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমারকে বিচ্ছিন্ন করা হয় শত বছর আগে। শুধু অববাহিকার বর্ষার জলধারায় এতদিন এ সব নদীতে প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। এখন অন্য সমস্যা। ভৈরব-কপোতাক্ষ এবং তাদের শাখা-প্রশাখা ভাটির অংশে সমুদ্র থেকে উঠে-আসা পলি জমে রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। শুরু হয়েছে অব্যবহিত উজানে যুগান্তব্যাপী জলাবদ্ধতা। সুন্দরবনসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিবেশ ও জনজীবন যে মহাবিপর্যয়ের মুখে এসে ঠেকেছে তা মাত্র দু'চার দিনের বৃষ্টি হলেই বোঝা যায়। নদীর প্রবাহক্ষমতা কতখানি শূন্য হয়েছে তা-ও বোঝা যায়।

সমস্যার ব্যাপ্তি (স্থানিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে)

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিটি নদী অববাহিকার সমস্যা একটু আগুপিছু করে না-দেখলে মনে হবে সমস্যাটি একেবারেই স্থানিক। কিন্তু একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে পার্শ্ববর্তী নদী অববাহিকায়। যেমন অতীতে ১৯৫০-এর কাছাকাছি সময়ে যশোরের অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর অঞ্চলে এবং খুলনার পাইকগাছা ও সাতক্ষীরার কোনো কোনো অংশে লবণাক্ততার কারণে ব্যাপক ফসলহানি ও মহা খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। তখনও মধুমতির নিম্নাংশে এ সমস্যাটি দেখা দেয়নি। ১৯৭০-৮০-র কাছাকাছি সময়ে যশোর জেলার দক্ষিণে ভবদহ এলাকায় এবং তৎসংলগ্ন খুলনার বিল ডাকাতিয়ায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয় বিরাট সমস্যা হিসেবে। নবগঙ্গা ও মধুমতির মাঝে ইছামতি বিলে তখনও জলাবদ্ধতার কথা ভাবার অবকাশ হয়নি। কপোতাক্ষ অববাহিকায় ঝিকরগাছা, মনিরামপুর ও কেশবপুর থেকে জলাবদ্ধতা ক্রমেই দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে এখন তালা সাতক্ষীরা সদর হয়ে কপিলমুনি-কয়রা-শ্যামনগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কপোতাক্ষ অঞ্চলে জলাবদ্ধতা যতই দক্ষিণে প্রসারিত হচ্ছে লবণাক্ততার সমস্যা তত দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। অন্যদিকে মধুমতিতে এখন অনেকদূর পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের অনেক গভীরে লবণপানি ঢুকছে, নিকট-অতীতেও যা ধরা পড়েনি। বড়দিয়ার নিচে বাগেরহাট এলাকায় মধুমতি অববাহিকায় কিছুদূর পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থাকলেও লবণাক্ততা আরো অনেক ভাটিতে থাকার কথা; এর কারণ ১৯০৫ সালে বড়দিয়ায় হ্যালিফক্স সাহেব খাল কেটে মধুমতিকে নবগঙ্গার সাথে জুড়ে দেওয়ায় মধুমতির পানি নবগঙ্গায় প্রবাহিত হতে থাকে। সেই থেকে পানির স্বল্পতার কারণে বড়দিয়ার নিচের অংশে মধুমতির মৃত্যুদশা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে উৎসমুখে বালু জমে এবং ফারাক্কার প্রভাবে পদ্মার পানিসঙ্কটের কারণে শুষ্ক মওসুমে মধুমতিতে উজানের প্রবাহ থেমে থাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়েছে। এরপর জোয়ারের প্রান্ত সীমা থেকে যতই নদী মজতে থাকবে ততই জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। ইছামতি বিলে জলাবদ্ধতা শুরু হয়েছে এই কারণে। পর্যবেক্ষণ বলে, উৎসমুখে খনন না-হলে জলাবদ্ধতা এখান থেকে ক্রমান্বয় দক্ষিণে প্রসারিত হতে থাকবে। ভেড়িবাঁধে এই সমস্যার সমাধান হবে না। তাতে মধুমতির নাব্যতা ফিরিয়ে আনা যাবে না। ৬০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে; কিন্তু প্লাবনভূমিতে পলি ওঠার ব্যবস্থা না-হলে অচিরেই নদীর পলিতেই পুনরায় নদী ভরাট হয়ে যাবে। সংক্ষেপে বলা যায়, আপাতত যে সমস্যা স্থানিক বলে মনে করা হচ্ছে, তা আঞ্চলিক সমস্যা বটে; একটু গভীরভাবে দেখলে আরও স্পষ্ট হয়, এটা জাতীয় সমস্যারই অংশ। বাংলাদেশ যেহেতু অভিন্ন বঙ্গীয় ব-দ্বীপেরই অংশ এবং অভিন্ন নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে আমাদের সমস্যা আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক। পানির অধিকারের দাবি থেকে আমাদের সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। তাই বলে আমাদের নিজেদের কোনো দায় নেই তা নয়;

যতটুকু করা সম্ভব তা না-করে সব দায় অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তা আত্মপ্রতারণা ও আত্মহননের সামিল হয়। তাই সমস্যার স্থানিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও মহাদেশীয় ব্যাপার-স্যাপার যেমন নজরে রাখতে হবে, তেমনি সমস্যার ঐতিহাসিক ব্যাপ্তিকালের ঘটনার প্রতিও নজর দিতে হবে।

এ অঞ্চলের নদীসমস্যার কারণসমূহ ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১. ব্রিটিশ আমলে নদীর ওপর হস্তক্ষেপ, ২. পাক আমলে ক্রুগ মিশন, ৩. ৭১-এ স্বাধীনতার পর ধারাবাহিকভাবে ক্রুগ মিশনের পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ৪. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়।

১. ব্রিটিশ আমল

১৮৫৯ সালে আসাম-বেঙ্গল রেললাইনের কাজ শুরু হয়। প্রথমে কোলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১৭০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয় ১৮৬১ সালের মধ্যে। লাইনটি বসানো হয় মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব-তীর বরাবর। দর্শনায় যেখানে মাথাভাঙ্গা থেকে ভৈরব নদ বিযুক্ত হয়েছে সেখানে ভৈরবের উপর একটি সংকীর্ণ রেলব্রিজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়া দর্শনার ৪ কিলোমিটার উজানে চিত্রা, চুয়াডাঙ্গার পাশে নবগঙ্গা এবং তার উজানে কুমার নদীকে মাথাভাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর পর ১৯৩৮ সালে দর্শনায় ভৈরবের খাত পুরাপুরি ভরাট করে কেরুর চিনিকল বসানো হয়; ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সব নদীতে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। যে বিকল্প পথ দিয়ে সামান্য পানি আসত তা-ও বন্ধ হয়ে যায় ১৯৬০ সালে জিকে প্রজেক্ট বাস্ত বায়ন ও মাগুরায় নবগঙ্গার উপর অপ্রয়োজনীয় একটি গেট নির্মাণের পর। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যে সব নদী-খাল সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় সে সবগুলো উপকূলীয় নদীর দশা প্রাপ্ত হয়। বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ অঞ্চলের নদীতে জোয়ারের তীব্রতা ও লবণের মাত্রা বাড়তে থাকে। ১৯৫০-এর সমসাময়িক কালে খুলনা-সাতক্ষীরা এলাকায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। যা ছিল নদী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ারই ফল।

২. ক্রুগ মিশন

১৯৫২-৫৪-র বন্যা ও দক্ষিণের লবণপানিতে ফসলহানি মন্বন্তর এসব প্রতিরোধে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনুরোধে মার্কিন সরকার তাদের আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের জেনারেল মি. ক্রুগকে পাঠায় বাংলাদেশে। ক্রুগ মিশনের সুপারিশ অনুসারে সারাদেশে নদীর তীর বরাবর বাঁধ, স্লুইসগেট ও পোল্ডার দিয়ে নদীকে প্লাবন-ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এতে সাময়িকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লোনাপানি ঠেকানো গেল ঠিকই, কিন্তু সেই থেকে বিলে পলি ওঠাও থেমে যায়; বন্ধ হয়ে যায় ব-দ্বীপ ভূমি

গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বিপরীত প্রক্রিয়ায় পলিতে নদীর বুক ভরাট হতে শুরু করে। বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলে বা পরবর্তীতে ভবদহ ও আরও পরে কপোতাক্ষ অববাহিকায় জলাবদ্ধতার বিস্তার হল ক্রুগ-মিশন প্রস্তাব বাস্তবায়ন এবং ধারাবাহিকভাবে তার পুনর্বাসনের কুফল।

৩. ক্রুগ মিশনের পুনর্বাসন

স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বা লবণাক্ততা বা জলাবদ্ধতা নিরসনে যতগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার সবই নানা নামে ক্রুগ-মিশনেরই পুনর্বাসন ছাড়া আর কিছু নয়। এ দেশে অতীতে, বলা যায় ১৯২১ সালে উত্তর-বাংলায় বন্যার পর ব্রিটিশ সরকার ড. প্রশান্ত মহলানবীশকে নিয়োগ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করতে। ড. মহলানবীশ ১৯২৮ সালে তার রিপোর্টটি পেশ করেন। তিনি বন্যানিয়ন্ত্রণে নদীর তীর বরাবর বাঁধ দিতে নিষেধ করেছিলেন। তাতে ভবিষ্যতে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তিনি তার আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন। ড. মহলানবীশ মুক্তপ্লাবনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সেসময় তিনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তা উপেক্ষা করা হয়েছে ক্রুগ মিশন (১৯৫৪), ফ্যাপ (১৯৭৮), এনডব্লিউপি (১৯৭৪) ও ১৯৮৮ সালে মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে গিয়ে। সাগ্রিকভাবে ক্রুগ মিশন যে পানি-নীতি সুপারিশ করেছিল সাধারণভাবে তাকে বলা হয় কর্ডন-নীতি। যার প্রধান লক্ষ্যই হ'ল পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে নদীশাসন করা। কর্ডন-নীতি বঙ্গীয় ব-দ্বীপ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; ফলাফল দেখেই বোঝা যায়, এ নীতি আমাদের নদী, বন্যা, জলাবদ্ধতার কোনো সমাধান দিতে পারেনি; বরং সমস্যাকে আরো বেশি ঘনীভূত করেছে। পরিসংখ্যান বিচারে দেখা যায় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা ভালো, ১৯৮৮ হার্ভাড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. পিটার রোজার্স বাংলাদেশে এসেছিলেন ইউএসইডের পরামর্শে। তিনিও যেহেতু শেষপর্যন্ত প্রশান্ত মহলানবীশের মতোই কর্ডন-পদ্ধতির বিরোধিতা করে উন্মুক্ত প্লাবনের পক্ষে মত দিলেন, সেই হেতু তাঁকে বাদ দিয়ে বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে মেগা প্রজেক্ট নেওয়া হ'ল যা মূলত কর্ডন-নীতিরই পুনর্বাসন।

বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

লবণাক্ততা, জলোচ্ছ্বাস, ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৬০ সালের পর ইউএসএইড-এর পরামর্শে ওয়াপদা তিন ধরনের পদক্ষেপ নেয়। নদীবেষ্টনী ও বাঁধ, পোল্ডার ও স্লুইসগেট। বিশ্বব্যাংক ও এডিবির ঋণে ১৯৬৭ সালের মধ্যে সারাদেশে ৪০০০ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৯২টি পোল্ডার ও ৭৮২টি স্লুইসগেট নির্মাণ করে নদীকে প্লাবনভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ১৫৫৬ কিলোমিটার বাঁধ, ও ৩৭টি পোল্ডার নির্মাণ করা হয় লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদটি এখন আমাদের জন্য মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এখনও জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও নেদারল্যান্ডের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে নিয়ে কেবল উপকূলীয় বাঁধ উঁচু করার তাগিদে আমাদের সরকার ও কর্তাব্যক্তিরা ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে তথাকথিত দাতাদের পিছনে পিছনে ঘুরছেন; তাতেও বেশি কিছু জুটছে না। এনজিওদের লাগানো হচ্ছে অ্যাডাপটেশন অথবা মিটিগেশনের প্রশিক্ষণ দিতে। অর্থমন্ত্রীসহ বিশেষ বিশেষ পরামর্শদাতারা বিদেশে মাইগ্রেশনের প্রস্তাব করছেন। এর কোনোটাই বাস্তবসম্মত নয় হয়তো সম্ভবও নয়।

বিকল্প বাঁচার পথ : অভিযোজন। অর্থাৎ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা। তথাকথিত দাতাদের কাছ থেকে ছবক নেওয়ার আগেই হাজার হাজার বছর যাবত এ দেশের মানুষ অভিযোজনের পথে বঙ্গীয় ব-দ্বীপ ভূমিতে বাস করে আসছেন। কিন্তু এ ভূমিতে মাতৃস্বরূপা নদীকে কখনও শত্রুর পর্যায়ে ভাবা হয়নি। ইদানিং কর্ডন পদ্ধতি নদীকে সেই পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। কর্ডন দিয়ে নদীকে প্লাবনভূমি, তথা জনপদ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর শুনতে হবে বিপন্ন পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতা যে একটি বিকৃত প্রস্তাব; আজ সেটা না-বুঝলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কু-পরামর্শ থেকে আমাদের রেহাই নেই।

মনে রাখা দরকার অতীতে আমাদের জমি নদীর পলি পড়ে উঁচু হ'ত, প্রতি বছর সেই পলি ভূমির অবনমনকে রুখে দিত, পলিতে জমি উর্বর হত, মুক্তপ্লাবনে ভূ-গর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার পূর্ণ হত, পরিবেশ বিশোধিত হত, গাছপালা উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্য উপকৃত হত, উজানের মিঠাপানির চাপে লবাণাক্ততা বিদূরিত হত, মাছেদের বিচরণ-ভূমি তখন বাধামুক্ত ছিলসে সব কথা বাদ দিয়ে আমাদের এখন বিদেশি ঋণের টাকায় ও পরামর্শে এ দেশের কমিশনভেগীদের তৈরি বিপন্ন পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার কৌশল আয়ত্ত করতে হবেএ কেমন নীতি, এ কেমন পরামর্শ?

প্রকৃত করণীয়

আমাদের প্রকৃত দেশপ্রেমিক পরিবেশ-বিজ্ঞানী, সৎ দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সর্বোপরি এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষ যে রীতিতে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে ববসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আমাদের সেই রীতি অনুসরণ করতে হবে। তার আগে দরকার আমাদের নদী ব্যবস্থাপনা কখন কোথায় কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার অনুসন্ধান করা।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, বন্যা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙ্গন নিরসনে সমন্বিত ব্যবস্থা

এক. নদী ও পানির প্রাকৃতিক প্রবাহকে রক্ষা, পুনরুদ্ধার করা;
দুই. বন্যাকে সহনশীল মাত্রায় মেনে নেওয়া।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ও নদীভাঙ্গন রোধে আশু করণীয়

১. একটি সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে পদ্মা-মাথাভাঙ্গার সাথে ভৈরব-কপোতাক্ষের সংযোগ এবং মধুমতির উৎসমুখ খনন করে পদ্মার সাথে সংযোগ পুনঃস্থাপন করতে হবে। এছাড়া কপোতাক্ষের ভাটিতে যে পলি জমে এর প্রবাহ আটকে দিয়েছে সে পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতোমধ্যে প্রবল গণআন্দোলনে চাপে ২৬১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে; কিন্তু উজানের নদী-সংযোগের কর্মসূচি এর সাথে যুক্ত করা হয়নি। তা না-হলে শুধু ভাটিতে পলি অপসারণের কর্মসূচি সফল হবে না; বরং শেষ পর্যন্ত জনগণকে ফাঁকি দিয়ে অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লুটপাটের সুযোগ করে দেওয়া হবে। উজানে নদী-সংযোগের দাবি তাই অবশ্যই মানতে হবে।

২. জীবিত নদীগুলো খনন করে প্রবাহ ও পানিবহন ক্ষমতা যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. মজা নদীগুলো খনন করে নদ-নদীর নেটওয়ার্ক বাড়িয়ে তুলতে হবে যাতে এক অঞ্চলে নদীতে পানি বাড়লে তা বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত করে দেওয়া যায়।

৪. বর্ষাঋতুতে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে বন্যার পানি প্রবেশের সুযোগ করে দিতে হবে।

৫. পর্যায়ক্রমে কর্ডন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে উন্মুক্ত প্লাবন-ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৬. উন্মুক্ত প্লাবন-নীতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বসতভিটা, বাজার, গঞ্জমোকামের ভিটা উঁচু করতে হবে।

৭. প্লাবনভূমি থেকে বন্যার পানি দ্রুত সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও বাধা থাকলে সে বাধা অপসারণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে রেলসড়কের সংকীর্ণ ব্রিজগুলো পর্যাপ্ত প্রশস্ত করে নিতে হবে।

৮. শুষ্ক ও বর্ষাঋতুর সাথে সঙ্গতি রেখে ধান ও অপরাপর ফসলের জাত নির্বাচন এবং গবেষণায় তাদের উন্নয়ন ঘটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. মাছসহ সমস্ত জলজপ্রাণীর বিচরণক্ষেত্র উন্মুক্ত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় স্লুইসগেটগুলো অপসারণ করতে হবে।

১০. হাজামজা পুকুর, খাল এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোর সংস্কার, সংরক্ষণ করে বর্ষার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; তাছাড়া আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে কোনো একটি এলাকায় ব্যারেজ-জাতীয় বিরাট আকারের প্রকল্প নির্মাণ করে জায়গা অপচয় করা কতখানি সঙ্গত তা ভেবে দেখতে হবে। আমাদের বিল-বাওড়গুলো যুগ যুগ ধরে এ দেশে প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে কাজে লেগে আসছে, এগুলোর যথাযথ সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো থেকে সেচের পানি যেমন পাওয়া যাবে তেমনি মৎস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য সমূহ উপকারে আসবে। এই সব বিল-বাওড়ের সাথে নদী ও খালের সংযোগ পুনঃস্থাপন করতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে।

জাতীয় ক্ষেত্রে: কর্ডনপদ্ধতির পরিবর্তে উন্মুক্ত প্লাবন-পদ্ধতি নির্ভর প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণের বিষয়টি জাতির কাছে প্রস্তাব করছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

১. অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে উজানের দেশগুলোর সাথে আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণে দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে দাবি আদায়ের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভারত নেপাল ভুটান চীনকে বহুপাক্ষিক বিবেচনায় না-রাখলে স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাঘাত ঘটবে। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশই যৌথভাবে উজানে পানি সংরক্ষণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হতে পারে।

কর্ডন পদ্ধতির তুলনায় উন্মুক্ত প্লাবন-পদ্ধতির তুলনামুলক সুবিধাসমূহ :

প্রথমত কর্ডন এলাকা বাড়ার সাথে সাথে পানির প্রাকৃতিক চলাচলের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে; ফলে বন্যায় পানির উচ্চতা বাড়ে। তাতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও বাড়ে। ১৯৫০ থেকে এ পর্যন্ত বন্যা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান বিচার করলে এর সত্যতা যাচাই করে দেখা যাবে।

এর বিপরীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বিস্তীর্ণ সমতলভূমির উপর দিয়ে বন্যা বা বর্ষার পানি গড়িয়ে যেতে পারলে পানি সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া এ পদ্ধতিতে প্লাবনতলের উচ্চতা কখনও বিপপদসীমার উপরে উঠতে পারে না। নদীর বিস্তীর্ণ নেটওয়ার্ক কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ফ্রান্স। সে দেশে কখনও

বন্যা হয়েছে এমন নজির দেখানো যাবে না। ফ্রান্সে ৪০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নাব্য নৌ-পথ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত উন্মুক্ত প্লাবন-নীতি মেনে চললে এবং সেইসাথে পুনরায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নদী ও খালের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা গেলে কোনো নির্দিষ্ট এলায় পানি বাড়লে তা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা ভারসাম্য গড়ে ওঠা সহজ হয়। তেমন হলে নদীর পাড় উপচিয়ে এলাকা প্লাবিত হওয়ার বিপদ কেটে ওঠাও সহজতর হয়।

তৃতীয়ত কর্ডন পদ্ধতিতে মাছের এবং অপরাপর জলচর প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়েছে; দেশে যে আজ মৎস্যসম্পদের ঘাটতি দেখা দিয়েছে তার জন্য কর্ডন পদ্ধতি বিশেষত স্লুইসগেটগুলো দায়ী।

চতুর্থত উন্মুক্ত প্লাবনকে মেনে নিলে পুনরায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভূমিতে উর্বর পলিমাটি ছড়িয়ে পড়বে। এতে আরও অনেক ধরনের সুবিধা হবে, যেমন –

১. পলি পড়ে ভূমির অবনমন পূরণ হবে এবং উচ্চতা বাড়বে।
২. জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. বন্যার পর পলিযুক্ত জমিতে ছিটে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বিনা খরচে এবং সামান্য শ্রমে মটর, সরিষা, ও রাই-জাতীয় ফসল উৎপাদন করা যাবে। অতীতে মধুমতি-নবগঙ্গা অববাহিকায় এ পদ্ধতি চালু ছিল।
৪. প্রতিবছর বন্যায় ভূ-গর্ভস্থ পানির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে।
৫. পরিবেশের আর্দ্রতা বাড়বে; উষ্ণতা হ্রাস পাবে।
৬. গাছপালা পুষ্ট ও আরও সবুজ হয়ে উঠবে।
৭. বন্যায় ভূমির অম্লতা কমে আসবে; আর্সেনিকের তীবতা হ্রাস পাবে।
৮. বন্যাকে মেনে নিলে মশামাছির উপদ্রব হ্রাস পাবেএবং জনস্বাস্থ্যে প্রভূত উন্নতি ঘটবে।
সমতলভূমিতে পলি ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হলে নদীতে পলি জমবে না; তাতে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। বছরে বছরে ড্রেজিং খরচ বেঁচে যাবে।
৯. নৌ-পথের দৈর্ঘ্য বাড়বে এবং কৃষিপণ্যের পরিবহন খরচ কমবে।
১০. জলপথের বিস্তার হলে পরিবেশদূষণের সমস্যা কমবে।
১১. নদীর গভীরতা বাড়লে নদীভাঙ্গন হ্রাস পাবে।
১২. উজানের মিঠেপানির প্রবাহ বাড়লে লবণাক্ততা দূরীভূত হবে। এবং সুন্দরবনের উন্নতি হবে।
১৩. নৌ-চলাচলের বিস্তার ঘটলে জ্বালানি খরচ কমে আসবে এবং অর্থ সাশ্রয় হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. Professor Dr. Md. Khalequzzaman, Assistant Professor, Department of Geology & Physics, Georgia South Western State University Americus, USA ; *Flood Control in Bangladesh through Best Management Practice*.

২. Professor Dr. Nazrul Islam : *Alternative Approach to Floodcontrol : The Case of Bangladesh.*

৩. *History of Indian Railway* : Google.

৪. প্রতাপ চন্দ্র : বাংলাদেশ ডুবছে না, *ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ।

৫. দীপেন ভট্টাচার্য : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি ও বাংলাদেশ: *প্রথম আলো*, ২১ মার্চ, ২০১০ ।

৬. সতীশচন্দ্র মিত্র : *যশোর খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ড* - পৃ:৪৩ –সংহতি সংস্করণ, ঢাকা ।

৭. আশরাফুল আলম টুটু : প্রতিবেশিক প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী খুলনা-যশোর অঞ্চলের জলাবদ্ধতা, নিষ্কাশন ও ভূমি উন্নয়নের প্রস্তাবাবলীর রূপরেখা, খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ।

৮. অনিল বিশ্বাস : বিল জেঠুয়া সমাচার – সাপ্তাহিক *নতুন কথা* ।

[লেখক : আহবায়ক, কপতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন ।]

বুড়িগঙ্গার মরণদশা ও একটি নদী চুরির তদন্ত রিপোর্ট

মো স্ত ফা কা মা ল

বুড়িগঙ্গার মরণদশা

বিখ্যাত নদী ঢাকার বুড়িগঙ্গার অবস্থা মুমূর্ষু। এটি মৃত্যুপথযাত্রী। পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন এমন সুধীজনেরা সম্ভবত কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারছেন। এ জন্য তারা মাঝে মধ্যে বুড়িগঙ্গাকে বাঁচানোর আহ্বান জানান। চালান কিছু সংগঠনিক তৎপরতা। কিন্তু এসব আহ্বানে এবং তৎপরতায় তেমন ফল আসছে বলে মনে হচ্ছে না।

বুড়িগঙ্গার পানি আজ ঘোলা, বিষাক্ত ও আবর্জনাময়। নদীর পাড়ে গেলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। নদীতীর এলাকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। প্রায় দেড়শ' বছর আগে থেকেই বুড়িগঙ্গার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছে। '৮৬ সালের একটি পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়, বুড়িগঙ্গার মুখে চর পড়েছে। পত্রিকাটি লিখেছিল্ত বুড়িগঙ্গার গভীরতা ও প্রবাহ প্রবর্তনের উপায় বের করতে হবে। সে অনুসারে ব্যবস্থাও নিতে হবে। উনিশ শতকের পৌর প্রশাসনের নগর পরিকল্পনায় বুড়িগঙ্গার একটি স্থান ছিল। কারণ তখন নদীর তীরকে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। পাকিস্তান আমল থেকে নগর পরিকল্পনাবিদ এবং নগর প্রশাসনের চিন্তায় নদীটি জায়গা পায়নি। তারপর কেটে গেছে অনেকদিন। ঢাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে। বুড়িগঙ্গার গতিতে ভাটা পড়েছে। পয়ঃবর্জ্য নির্গমনের পরিমাণ বেড়েছে। পানির স্তর বিপদসীমার অনেক নিচে। দুই পাড়ে শিল্প-কারখানা আর দখলদার দিন দিন বাড়ছে। হাজারিবাগ এলাকায় প্রায় দুই শ' ট্যানারি বর্জ্য এই বুড়িগঙ্গায় যায়। জরিপে দেখা গেছে, শুধুমাত্র হাজারিবাগ এলাকার ট্যানারিগুলো থেকে প্রতিদিন ১৫ হাজার ঘনমিটার দূষিত পানি এবং অন্যান্য এলাকা থেকে বুড়িগঙ্গায় ২ হাজার ৭ শ' ঘনমিটার দূষিত তরল বর্জ্য বুড়িগঙ্গার পানিতে মিশছে। বর্জ্য নির্গমনের পরিমাণ বাড়ছে প্রতদিনিই। এছাড়াও বুড়িগঙ্গার বুকের উপর দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করে অসংখ্য জলযান। তাদের তেল নিঃসরণের জন্যেও বুড়িগঙ্গার পানি দ্রুত দূষিত হচ্ছে। পানিতে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ থাকা উচিত প্রতি লিটারে ৬ মিলিগ্রাম। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, কামরাঙ্গীরচর থেকে পাগলা পর্যন্ত পানিতে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দু' থেকে শূন্য মিলিগ্রাম। ধোলাইখাল সংযোগস্থলে এর পরিমাণ

শূন্য। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শুকনো মৌসুমে কোনো জলজপ্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। পরিবেশ অধিদপ্তর এক জরিপে উল্লেখ করেছে শুকনো মৌসুমে বুড়িগঙ্গার সকল স্থানের পানির দূষণ সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। এ অবস্থায় এ পানি পান তো দূরের কথা গোসল পর্যন্ত বিপজ্জনক। ওই জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, '৮৬ থেকে '৯৭ সাল পর্যন্ত এ দূষণের পরিমাণ ক্রমেই বেড়েছে।

এই বুড়িগঙ্গা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত? উত্তর ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। এ প্রশ্নোত্তর কত মুখস্ত করতে হত ছোটবেলায়। কিন্তু এটি এক সময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী হবার আলামত দেখা দিয়েছে।

বুড়িগঙ্গা মূলত ধলেশ্বরীর শাখানদী। টাঙ্গাইলের দক্ষিণে যমুনা নদী থেকে বের হয়ে মানিকগঞ্জ, সাভার, মিরকাদিম হয়ে মুন্সিগঞ্জের কাছে মেঘনা নদীতে গিয়ে মিশেছে ধলেশ্বরী। সাভার থেকে আরেকটি নতুন রূপ চলে এসেছে ঢাকামুখী। নাম নিয়েছে বুড়িগঙ্গা। নদীর ইতিহাসে জানা যায়, গঙ্গা নদীর একটি ধারা প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী হয়ে বঙ্গোপসাগরে যেয়ে পড়ত। এক সময় প্রকৃত গঙ্গা আলাদা পথ ধরে চলে যায়। কিন্তু প্রাচীন গঙ্গা এই পথ ধরে প্রবাহিত হতে থাকে। নদীটি সাভার-এর দক্ষিণে ধলেশ্বরী থেকে বের হয়ে ফতুল্লার দক্ষিণে আবারো ধলেশ্বরীতে মিলিত হয়েছে। যে গঙ্গাটি প্রাচীন ছিল সেটাই বুড়িগঙ্গার সঙ্গে মিশে থাকত বলে নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা।

এক সময় বুড়িগঙ্গায় স্রোতের জোর ছিল। তেজ ছিল। নদীর পথ পরিক্রমায় চলতে চলতে নরম হয়ে উঠেছে তার ঢেউ। এখন আর সেই বেগবান গতি নেই বুড়িগঙ্গার। এ যেন নামের সঙ্গে মিলে যাওয়া চারিত্রিক অবয়ব।

নদীটি তার শারীরিক তেজ হারাচ্ছে বটে কিন্তু নদী-দখলদার একদল মানুষের তেজ বাড়ছেই। তাদের তেজের কাছে বুড়িগঙ্গা তার সৌন্দর্যরূপকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে। দিনকে দিন চলছে বুড়িগঙ্গা দখলের চেষ্টা। ছোট হয়ে আসছে বুড়িগঙ্গা। হারাচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। বাঁশের মাচা বানিয়ে তার উপর ঘর তুলে প্রভাবশালীরা নদী দখলের পাঁয়তারা করছে। কেউ কেউ ভুয়া নামে বুড়িগঙ্গা বিক্রিও করে দিচ্ছে। সংঘবদ্ধ চক্র প্রতারক-দল এখন বুড়িগঙ্গার মৃদু নরম ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রতারণা কৌশলও হিসাব করে দেখছে।

বর্ষা মৌসুমে বুড়িগঙ্গায় দু'কূল ছাপিয়ে পানির প্রবহমানতা বৃদ্ধি পায়। কলকল শব্দে নদীর তীর ছন্দময় তরঙ্গের সৃষ্টি করে। শুকনো মৌসুমে নদীর বুক শীর্ণকায় শান্ত গতি নিয়ে বেঁচে থাকে। অসাধু মানুষের নদীদখল লড়াই মূলত সে সময়ই শুরু হয়। গত কয়েক বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলছে। এলাকায় প্রভাবশালী মহল এই কাজটি করছে। বুড়িগঙ্গার পানিতে উঁচু করে পাড়ের বিভিন্ন অংশে বাঁশ পুঁতে রাখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সীমানা খুঁটি। বর্ষার পানিতে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলবে দখলের

লড়াই। জোর যার মুলুক তার এই মন্ত্রে বিভোর এলাকার প্রভাবশালী এবং তাদের চেলাচামুণ্ডা।

ঢাকা মহানগরীর ঐতিহ্য এই বুড়িগঙ্গাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। দক্ষিণে জিঞ্জিরা, কামরাঙ্গীর চর এলাকার মানুষদের জীবিকা প্রধানত এই নদীটিকে ঘিরে। অথচ নদীটি নিয়ে প্রভাবশালী মহলের দখল-প্রতিযোগিতার তীব্র উল্লাস স্তম্ভিত করে দেয় নাগরিক বোধকে। কোনো প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই। নতুন ঢাকার নতুন নেতারা হয়তো ভাবছেন কী দরকার ঘিঞ্জি এলাকা পার হয়ে দখল প্রতিরোধে নামার? যাদের এলাকা তারাই দেখবে। কিন্তু এটি সত্য এই নদী এলাকার নয়। এটি কোটি মানুষের স্বপ্নময় ঐতিহ্যের সাক্ষী। এর পলিমাটি হত্যা করে আবাসন গড়ার মতো দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারে না।

এলাকার সাধারণ মানুষ বলছে বিনামূল্যে গায়ের জোরে যে যেভাবে পারছে বুড়িগঙ্গা দখল করে নিচ্ছে। দখলবাজির অত্যাচারে অতিষ্ঠ বুড়িগঙ্গা যেন কী কথা শোনাতে চায়! শোনাতে চায় তার বুকের জমিনে বাঁশ-খুঁটির ব্যথার কথা। শোনাতে চায় মানুষের কারণে তার গতির পথে প্রতিবন্ধকতার কথা। এ কথাগুলো শোনার জন্য কি কেউ নেই? সত্যি মানুষের কাছে আজ বুড়িগঙ্গা বড়ই অসহায়।

বুড়িগঙ্গা দখলের ওপর ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ২৪৪ জন অবৈধ দখল করে আছে বুড়িগঙ্গার ৫০ একর জমি। এর মধ্যে কোতোয়ালি সার্কেলে ১৫৭ জনের দখলে ৩৮ একর জমি। তেজগাঁও সার্কেলে ৯ জনের দখলে ৭ একর জমি। কেরানীগঞ্জ সার্কেলে ৭৮ জনের দখলে ৪ একরেরও বেশি। দখলকৃত এসব এলাকায় গড়ে উঠেছে বসতবাড়ি, বস্তি, স'মিল, কাঠের দোকান, কাঠ ও বাঁশের আড়ত, লঞ্চ ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা, ফল ও শবজির আড়ত, মসজিদ, মাদ্রাসা, ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা, মার্কেট, টেক্সটাইল মিলসহ অন্যান্য স্থাপনা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বুড়িগঙ্গা দখলের ভালো দাওয়াই হচ্ছে মসজিদ-মাদ্রাসা। আল্লাহ্-রাসুলের নামে ঘর বানিয়ে দখলবাজরা তাদের দখলবাজি চরিতার্থ করছে। বুড়িগঙ্গার দু'পাড়ে কমপক্ষে ২০টি মসজিদ ও ৮টি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মসজিদ ও মাদ্রাসার পুরো অবকাঠামোই তৈরি করা হয়েছে নদীর উপর। বুড়িগঙ্গার দু'পাড়ে যত মসজিদ আর মাদ্রাসা আছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক ধরনের ব্যবসা। তা হল মসজিদের জন্য যে চাঁদা উঠিয়ে দিতে পারবে তাকে শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত দেওয়া হয়। মসজিদ-মাদ্রাসার নাম ভাঙিয়ে ওঠানো টাকা দিয়ে সদরঘাট এলাকায় বেশ কয়েকজন লোক সংসার চালায়। আশপাশের মসজিদের কমিটি নাকি তাদের এ পথ পাতলে দিয়েছে।

একটি নদী চুরির তদন্ত রিপোর্ট

একদা এই ঢাকা শহরের ভিতরে একটি নদী ছিল। শুনতে অবাক লাগে? অবাক লাগলেও এটি ঐতিহাসিক সত্য। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে সেই নদীটি এখন কোথায়? নদী কি হারিয়ে বা চুরি হয়ে যেতে পারে? হ্যাঁ পারে। পেরেছে তো!

নগরসভ্যতা সেই নদীটিকে খেয়ে ফেলেছে। সেই নদীটির নাম ছিল দুলাই। কেউ বলতেন দুলাই নদী; কেউ বলতেন ধোলাই খাল। ধোলাই খাল নামটি বেশি পরিচিতি পেয়েছিল। এখন ধোলাই খাল আর কোনো নদী বা খালের নাম নয়। এটি রাজধানীর একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম।

ঢাকার ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটিতে জানা যায়, ঢাকার অভ্যন্তরে নৌ-চলাচল ও পানি নিষ্কাশনের জন্য বিখ্যাত ছিল দুলাই। পরবর্তীকালে দুলাই, দোলাই বা ধোলাই খাল একটি কৃত্রিম শাখা হিসেবে গত শতাব্দীর শেষদিকে একেবারে হারিয়ে যায়। আর এই হত্যার পেছনে এবং সামনে রয়েছে ঢাকার নগর পরিকল্পনার ফল। কোনো বছর অতিবৃষ্টি হলে ঢাকা নগরীর ওপর আজ বিরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী, এই ধোলাই খাল না-থাকার জন্য।

কারও কারও মতে, ঢাকার প্রথম মোগল গভর্নর ইসলাম খান (শাসনকাল ১৬০৬-১৬১৩) ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের উদ্দেশ্যে এই খাল খনন অথবা পুরনো ছোট নদীকে সংস্কার করান। এটি বাবুবাজারের কাছে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে বের হয়ে জিন্দাবাজার ও গোয়ালনগরের উত্তর দিক দিয়ে নবাবপুর রোড এবং নারিন্দা রোড অতিক্রম করে। তারপর জালুয়ানগর হাল শরাফতগঞ্জ প্রদক্ষিণ করে লোহার পুলের নিচ দিয়ে (বর্তমানে লোহার পুল স্মৃতিমাত্র) প্রবাহিত হয়ে আবার বুড়িগঙ্গা নদীতে মিশেছে। লালবাগের কেল্লা, শায়েস্তা খানের প্রাসাদ, পাকুরতলী মসজিদ, চক মসজিদ, শাহ সুজার বড় কাটরা, শায়েস্তা খানের ছোট কাটরা প্রভৃতি প্রাচীন মোগল কীর্তিসমূহ ধোলাই খালের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ১৯৬৪-৬৬ সালে এই খাল ভরে ফেলে। অর্থাৎ সরকারিভাবে তার ধ্বংসের কাজ সমাধা হয়। ফলে সেই থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় পুরনো ঢাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে।

ঐতিহাসিক ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে দুলাই নদী হল বালু নদীর নিম্নাংশ। বালু নদী কাপাশিয়ার লক্ষ্যা থেকে উৎপন্ন হয়ে ডেমরার কাছে আবার লক্ষ্যার সঙ্গে মিশেছে। দুইলাই নদী ডেমরার কাছে বালু নদী থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ঢাকার ভেতর দিয়ে এসে ফরাশগঞ্জ (আসল নাম ফ্রেন্সগঞ্জ)-এর কাছে বুড়িগঙ্গায় মিশেছে। ঐতিহাসিক মির্জা নাথানের মতে, এটি দুলাই নদীর একটি শাখা। বর্তমান মিল ব্যারাকের কাছে এসে দুলাই দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল।

একটি উত্তর দিকে চলে যায়, অন্যটি পশ্চিম দিকে। এই পশ্চিমের শাখাটি আধুনিক ঢাকা শহরের শাহবাগ অতিক্রম করে ঢাকা তেজগাঁও রোড (পরবর্তী ময়মনসিংহ রোড) অতিক্রম করেছিল। এ সময় দুলাই নদীর উপরে ছিল অম্বর পুল। এটি ছিল শাহবাগ এলাকায় কারওয়ান নদীর (কারাভান নদী, যা থেকে মুখে মুখে কাওরানবাজার নাম) সঙ্গে যুক্ত। তারপর দুলাই মিরপুরে গিয়ে হারিয়ে যায়। ততদিনে তার ধোলাই নাম হয়ে গেছে। আসলে এটি আরো এগিয়ে গিয়ে তুরাগ নদীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়। এখনো ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারের মানচিত্রে একে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

মেজর জেমস র‌্যানেল ঢাকায় এসেছিলেন জরিপ ও মানচিত্র তৈরি করতে। র‌্যানেলের বিখ্যাত ডায়েরিস-এ দুলাই সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। সেই দুলাই বা ধোলাই আধুনিক ঢাকা শহরের পরিকল্পনাবিদদের অত্যাচার ও অবহেলায় কংক্রিটের নালা হয়ে গেছে। দুলাই নামক একটি নদী হয়ে গেল ইতিহাস।

দুলাই নদীর মাঝের অংশ প্রথমে আধুনিক ঢাকা শহর গ্রাস করে নেয়। এই মুছে যাওয়া পাণ্ডু নদী ঢাকা শহরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রক্ষার দাবিদার ছিল। ড. ভট্টশালী বলেছেন এই পাণ্ডু নদী দক্ষিণ দিকে দু'টি শাখা পাঠিয়েছিল দুলাই নদীতে। তার মধ্যে একটি রেসকোর্স বা বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব দিকে দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে প্রবাহিত ছিল এবং ধোলাই নদীতে কাওসার বাগ এসে মিশেছিল। অন্য শাখাটি বা ঊর্ধ্ব স্রোতটি ঢাকা শহর নির্মাণের সময় সম্পূর্ণ ভরাট করে ফেলে। শুধু তার নিম্নাংশের চিহ্ন এখনো আবিষ্কার করা যায়। নাজিমউদ্দিন রোড ও মেডিকেল কলেজের মোড়ে তার শেষ চিহ্ন রেখে গেছে।

উপরোক্ত দু'টি শাখা কয়েতটুলিতে মিশে একটি স্রোত হয়ে প্রায় সোজা পশ্চিম দিকে বংশাল রোডের সমান্তরাল হয়ে বয়ে যেত। শেষে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়ে আর্মানিটোলা জলাভূমি হয়ে আবার পূর্ব দিকে মালীটোলার দক্ষিণ প্রান্তে ধোলাইতে রায় সাহেব বাজারের কাছে নারিন্দা (আদি নাম নারায়ণদিয়া) পুলে গিয়ে মিশেছিল।

এটি সামগ্রিকভাবে ঢাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও পানি নিষ্কাশনের সহায়ক ছিল। ধোলাই ছিল সরকারি খাল, তার পাশে ছিল সরকারি জমি, অর্থাৎ তার তীরবর্তী জায়গা-জমি এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর যোগসাজসে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যায়। এভাবে জমি হারাতে হারাতে ধোলাই সংকীর্ণ হয়ে যায়।

মোগল গভর্নর ইসলাম খান দুলাইকে নাব্য রাখার জন্য খনন করে ঢাকাবাসীর ব্যবহার-উপযোগী করেছিলেন। ইংরেজরাও এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে একে নাব্য রেখেছিল। তখন দুলাইতে নৌকা চলাচল ও জিনিসপত্র আনা-নেওয়া হত। দুলাই ছিল কর্মমুখর। আস্তে আস্তে ঢাকা হয়ে ওঠে বাণিজ্যকেন্দ্র ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজধানী। তারপর ইংরেজরা চলে গেছে। নদী চুরির কাজ শুরু হয়ে গেল। এছাড়া কারখানার দূষিত বর্জ্য, মানুষের লাগামহীন অত্যাচার ও অবহেলা তাকে করে দেয় মৃতপ্রায়। পরবর্তীকালে দফায় দফায় গত ৫০ বছরে একেবারে চুরি হয়ে গেল দুলাই নদী।

উৎস : গ্রন্থ,: ***বাংলাদেশের নদ-নদীর ইতিকথা।***

[লেখক:প্রাবন্ধিক, গবেষক। সাংবাদিক।]

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

উজানে উন্নয়ন বাহাদুরি আর ভাটিতে রক্তক্ষরণ

পা ভে ল পা র্থ

পএলা বন্দনা করি মালিক ছত্তার
দুছরা বন্দনা করি নবী মছতফার ।
পুবেতে বন্দনা করি আসামের পাড়
দক্ষিণে বন্দনা করি জিলা ত্রিপুরার ।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালী পর্বত
পছছিমে বন্দনা করি মৈমনসিংহের পথ
তিছরা বন্দনা করি ছিলটি মানুষ
না-কিছের কথা গুলো হুন দিয়া হুশ ।
ধন আছে জন আছে আছে ধান চাউল
অরিন আছে পাখি আছে আছে মাছ হউল ।
আকল আছে বুদ্ধি আছে আছে শান মান
গলা ভরা গান আছে গোলাভরা ধান ।

(সিলটি নাগরী লিপিতে লেখা প্রাচীন এক বন্দনাগীত, পৃ. ২৩)

১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনের বাংলাদেশের ২৩০ টি নদীর ভেতর ৫৭টি প্রধান নদীর উৎস সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের পাহাড়ি অঞ্চল। বাংলাদেশের নদীপ্রণালী এক জটিল জলসার্কিট তৈরি করেছে যা দুনিয়ার অন্য কোনো নদীপ্রণালী দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মতো এই ব-দ্বীপ ভূমির নদী অববাহিকার জলধারার উৎস উজানের উত্তর-পূর্বের হিমালয়-মেঘালয় পাহাড়ভূমি যা ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী বহুমাত্রিক জলসার্কিট তৈরি করে ভাটিতে দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকায় বছরে সর্বাধিক বৃষ্টির পানি নামে যা মিসিসিপি নদের তুলনায় চারবারেরও বেশি এবং এই পানি পাহাড়ি ঢলের মাধ্যমে প্রচুর

পলি নিয়ে আসে উজান থেকে ভাটিতে।[১] বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের হাইড্রোলজিক্যাল প্রতিবেশ অঞ্চলকে মোট ১৭টি হাইড্রোলজিক্যাল রিজিয়নে ভাগ করেছে যার ভেতর দেশের উত্তর-পূর্বের হাওর এলাকার নদীসমূহ পড়েছে উত্তর-পূর্ব হাইড্রোলজিক্যাল রিজিয়নে।[২] পানি উন্নয়ন বোর্ড রায়মঙ্গল, ইছামতি-কালিন্দি, বেতনা কোদলিয়া, ভৈরব কোবাদাক, মাথাভাঙ্গা, গঙ্গা, পাগলা, আত্রাই লোয়ার, পুনর্ভবা, তেঁতুলিয়া, টাংগন, কুলীক, নাগর, মহানন্দা, ডাহুক, করতোয়া, তালমা, ঘোড়ামারা, দেওনাই-চাড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী, বুড়ি তিস্তা, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, ব্রহ্মপুত্র, জিঞ্জিরাম, চিতলখালী, ভোগাই, নিতাই, সোমেশ্বরী, যাদুকাটা রক্তি, জালুখালি-ধামালিয়া, নয়াগাং, উমিয়াম, ধলা, পিআইন, সারি গোয়াইন, সুরমা, কুশিয়ারা, সোনাই বরদল, জুড়ি, মনু, ধলাই, গোপাল-লংলা, খোয়াই, সুতাং, সোনাই, হাওরা, বিজনী, সালদা, গোমতী, কাকরী-ডাকাতিয়া, সেলোনিয়া, মুহুরী, ফেনী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং নাফ সহ এই ৫৭ টি সীমান্ত ও অভিন্ন নদ-নদীর তালিকা তৈরি করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাইড্রোলজিক্যাল রিজিয়নে মোট ৫৫টি নদীর ভেতর সীমান্ত নদীর সংখ্যা ২১। যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ড কোরাঙ্গী নদীর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ এলাকায় দেখিয়েছে যা সঠিক নয়।[৩] উত্তর-পূর্ব হাইড্রলজিক্যাল রিজিয়নের ভোগাই, সুমেশ্বরী, উমিয়াম, নয়াগাং (খাসিয়ামারা), জালুখালি (চলতি), নিতাই, চিতল, যাদুকাটা-রক্তি, সুরমা, কুশিয়ারা, ধলা, সারী-গোয়াইন, পিআইন, সোনাই-বরদল, মনু, ধলাই, জুড়ী, লংলা, খোয়াই, সুতাং, সোনাই, কোরাঙ্গী এই ২২টি ভারতীয় এলাকা থেকে উৎপন্ন নদী ও সীমান্তবর্তী পাহাড় থেকে নেমে আসা নানান পাহাড়ি ছড়ার জলধারাই আমাদের হাওর জলাভূমির জলের মূল উৎস।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট ও ঢাকা বিভাগের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই ৭টি প্রশাসনিক জেলার ৭,৮৪,০০০ হেক্টর জলাভূমি নিয়ে দেশের প্রায় ৪২৩ টি হাওর বিস্তৃত রয়েছে। ভাটির দেশ হিসেবে পরিচিত সুনামগঞ্জ জেলায় হাওরের সংখ্যা সর্বাধিক ১৩৩টি, সিলেটে ৪৩টি, হবিগঞ্জে ৩৮টি, মৌলভীবাজারে ৪টি, কিশোরগঞ্জে ১২২টি, নেত্রকোণায় ৮০টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩টি হাওর রয়েছে।[৪] বাংলাদেশের এই হাওরাঞ্চলসমূহ একসময় গৌড়, লাউড়, তরপ, বানিয়াচং, ইটা ও জগন্নাথপুর সামন্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাওর এলাকা সুনামগঞ্জের সর্ববৃহৎ ও প্রধান নদী সুরমা। কথিত আছে, গৌড়ের রাজা ক্ষেত্রপালের দুই স্ত্রী সুরম্যা ও রত্নাবতী। রাজা ক্ষেত্রপাল আসামের বরাক নদী থেকে খাল কেটে আদিসুরমা নদী সৃষ্টি করেন এবং সুরম্যার নাম অনুসারে নদীর নাম রাখেন সুরমা।[৫] আসামের বরাক উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা নদী সিলেট, ছাতক, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ, জামালগঞ্জ, দিরাই, শাল্লা হয়ে আজমিরীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে কুশিয়ারার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভৈরবের কাছে মেঘনা নদীতে

পড়েছে। সুরমাবাহিত পলিমাটিতে ভাটি এলাকার ব্যাপক অঞ্চল ভরাট হয়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা ভারতের চেরাপুঞ্জি সুনামগঞ্জ সীমান্তের খুবই কাছে। চেরাপুঞ্জিতে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪৪ ইঞ্চি। চেরাপুঞ্জি থেকে বৃষ্টির পানি পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ছোট ছোট ঝরনা ও নদী দিয়ে জেলার বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে। এই পানির সঙ্গে আসে কোটি কোটি টন পলিমাটি। আর এতেই দিনে দিনে ভাটি এলাকার নালা-হাওর ভরাট হয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। এই কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জেলার ১৪৫ মাইল নৌপথ। আসামের বরাক উপত্যকা থেকে বরাক নদী ২৪.৫৩? অক্ষাংশে এবং ৯২.৩২? দ্রাঘিমাংশে উৎপন্ন হয়ে সিলেটের জকিগঞ্জ এলাকার অমলসীদ সীমান্তের কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে ভাগ হয়ে বরাকের এই দক্ষিণ শাখা কুশিয়ারা জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, রাজনগর, মৌলভীবাজার, নবীগঞ্জ এবং জগন্নাথপুর উপজেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ এলাকার মার্কুলী বাজারের কাছে সুরমার সাথে মিলিত হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরব এবং কুলিয়ারচরের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। শুকনো মওসুমে বরাক নদীর ৮৫ ভাগ পানি কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় (পৃ.২৫-২৬)।[৬] ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহরের কাছে পাহাড়ি এলাকা থেকে জন্ম নিয়ে মনু নদী ভারতীয় অংশে ৯০০ বর্গমাইল অববাহিকা তৈরি করে সিলেটের গোবিন্দপুর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর সিলেট এলাকাতেও তৈরি করেছে ২২০ মাইল অববাহিকা। মোট ১১০ মাইলের এই পাহাড়ি নদীর ভারতীয় এলাকার দৈর্ঘ্য ৫৮ মাইল এবং বাংলাদেশে ৫২ মাইল। বাংলাদেশে ২১ মাইল চলার পর ধলাই নামের আরেকটি ছোট নদী সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এসে মনু নদীতে মিলেছে। এই দুই নদীর মিলিত ধারা মৌলভীবাজারের সদর ও তারাপাশা ঘেঁষে মনুমুখ-এর কাছে কুশিয়ারা নদীতে মিলিত হয়েছে।[৭] জুড়ী নদী উপজেলার প্রায় পাঁচ লাখ কৃষিনির্ভর এক জনগোষ্ঠীর কৃষি উৎপাদনের এক বৃহত্তম জীবনদায়িনী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। জানা যায়, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের জম্পই পাহাড় থেকে জন্ম নিয়ে এই নদী আসামের করিমগঞ্জ এবং পার্বত্য ত্রিপুরার অন্তত ৬/৭টি পাহাড়ি ছড়ার মিলিত স্রোতে গড়ে-ওঠা জুড়ী নদী উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের বটুলী সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে উপজেলার ফুলতলা, সাগরনাল, গোয়ারবাড়ি, জায়ফরনগর ও পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়নের হাজার হাজার একর বিস্তীর্ণ কৃষিজমি পানি ও পলি দিয়ে সমৃদ্ধ করে দেশের বৃহত্তম হাওর হাকালুকি হয়ে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কুশিয়ারা নদীতে মিলিত হয়েছে।[৮]

এককালে পাহাড়ি এলাকা থেকে বৃষ্টির পানি নেমে হাওর এলাকায় বর্ষায় তৈরি করত ঋতুভিত্তিক বন্যা আর ঐ বন্যার সাথে মানুষের এক ধরনের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক ছিল। কখন কোন নদী দিয়ে কোন হাওরে কী মাসে এই পাহাড়ি ঢলের পানি নামবে

তার একটা নিয়মরীতি মানুষের চেনাজানা ছিল। কিন্তু চলতি সময়ে এই নিয়মরীতি সব ভেঙে গেছে, এখন যখন-তখন যেকোনো জায়গা দিয়েই যেকোনো হাওরেই নামে পাহাড়ি ঢলের পানি। হাওর এলাকায় এই হঠাৎ অকাল বন্যার প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। পাহাড়ি ঢলের এই অকাল বন্যাই আজকের হাওরবাসীর জন্য ডেকে এনেছে সীমাহীন দুর্ভোগ। হাওরবাসীর জন্য এই নয়া দুর্ভোগের জন্য স্থানীয় মানুষেরা দায়ী করেন ভারতীয় সীমান্ত এলাকার প্রতিবেশগত অবস্থা পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক অব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত নির্মাণকে। জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকের কাছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সিলেট এলাকার হাওরের পানির উৎস নদী সুরমা, কুশিয়ারা, খোয়াই, মনু, কালনি, পিয়াইন নদী সহ এইসব নদীর শাখাপ্রশাখাগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে।[৯] জলবায়ুজনিত পরিবর্তন এবং বর্ষাকালে উজানের স্রোতে পাহাড়ি বালির ফলে আজ এইসব নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, সুরমা নদী তার উৎস এলাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মতো হাওর এলাকাও একসময়ে মরুভূমিতে পরিণত হবে বলে কর্মকর্তারা ধারণা করছেন। বরাক নদী মনিপুর রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা থেকে উৎপন্ন হয়ে আসামের ভেতর দিয়ে সিলেটের জকিগঞ্জের অমলসীদ সীমান্ত দিয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মনিপুরে নানান অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দেশের কুশিয়ারা-সুরমা-মেঘনা এই প্রধান নদীপ্রণালীও আজ হুমকির মুখে। মৌলভীবাজার এলাকার এক প্রধান পাহাড়ি নদী মনুনদী প্রতিবছর প্রায় ৪২ লাখ টন পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসে। মনুনদীর পাহাড়ি ঢল প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার একর এলাকার ফসল কেড়ে নেয় (পৃ.৬৪-৬৬)।[১০] জানা গেছে, ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে বিগত প্রায় পঞ্চাশ দশক থেকে পাহাড়ি এলাকায় আবাদ শুরু হওয়া এবং জনবসতি গড়ে ওঠায় পাহাড়ি এলাকার মাটি আলগা হয়ে পড়েছে এবং বর্ষা মৌসুমে এ মাটি পলিবাহিত হয়ে নদীগর্ভ ভরাট করে পানি ধারণ ক্ষমতা বিনষ্ট করে আসছে। জুড়ী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন বৃষ্টি পড়লে অথবা সামান্য পাহাড়ি ঢল নামলেই নদীর দু'কূল উপচে পড়ে এলাকায় বন্যা দেখা দেয়, তেমনি শীত মৌসুমে নদী শুকিয়ে গিয়ে পানির অভাবে বোরো চাষ ব্যাহত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে বনবিভাগের বেশ কটি বাঁশ ও কাঠমহালের বাণিজ্য এই নদীপথেই হয়। জেলার প্রাচীনতম বাজার কামিনীগঞ্জ এখন হুমকির মুখে এবং প্রায় অংশই কন্টিনালা খালে বিলীন হয়ে গেছে। সুনামগঞ্জের উত্তর সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় বিভিন্ন নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করায় প্রতি বছর ছাতক, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, ধর্মপাশা এই ছয়টি উপজেলার বিস্তীর্ণ ফসলি জমিতে পড়ছে বালির স্তর। নদী হারাচ্ছে নাব্যতা। যাদুকাটা, বৌলাই, রক্তি, পুরান যাদুকাটা, চলতি, মাহারাম, খাসিয়ামারাসহ পাহাড়ি নদীর বিভিন্ন ছড়া দিয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ

টন বালি পলি এসে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সোনারপাড়া, চেংবিল, জিনারপুর, ডলুয়া, রামপুর, নাজিরপুর, মাঝেরটেক, ভাদেরটেক, জগন্নাথপুর, আলীপুর, লামাপাড়া তাহিরপুর উপজেলার রাজাই, পুরানঘাট, গন্ডামারা, রিজার্ভ, পটিয়া, বিন্নাকুলি, মাহারাম, পাঠানপাড়া বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ইকরআটিয়া, বসন্তপুর, উলাসনগর, শক্তিয়ারখলা, মিয়ারচর, সিরাজপুর, বাগগাঁও, সোনাপুর, দুর্গাপুর দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকাসহ প্রায় নব্বই হাজার একর হাওর এলাকার ফসলি জমিতে পাহাড়ি বালির স্তর পড়ে চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। জেলার ৭টি স্রোতস্বিনী নদী এখন মরা নদীতে পরিণত হয়ে প্রায় ৬৬,০০৩৫ হেক্টর এলাকার পানিধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে যার জন্য হাওর এলাকায় বর্ষা শুরু হতে না-হতেই দেখা দিচ্ছে অকালবন্যা। নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ায় জেলার প্রায় ২০টি নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে।[১১] দেশের উত্তরে মেঘালয় পাহাড়, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড়ভূমি, পূর্বে মনিপুরের পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা বর্ষার জল হাওর এলাকায় নলতল বাইরা বা সর্বপ্লাবী প্লাবন তৈরি করে। কখনো কখনো বন্যাজলের উচ্চতা ৬ ফুট ছাড়িয়ে যায়। এসময় আফাল (হাওরের তীব্র ঢেউ) ও আফরমারা (ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে যাওয়া)র তাণ্ডবে এলাকাবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। হাওরসমূহের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ৪ মিটার উঁচু হলেও সুনামগঞ্জ এলাকার হাওরসমূহের উচ্চতা ২ ফুটের মতো। এ কারণে মেঘালয় ও বরাক উপত্যকায় বৃষ্টিপাত হলে সুনামগঞ্জের হাওরে প্রথমেই গড়িয়ে নামে। ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের ভেতর মাত্র ২০০৩ সালেই একবার বোরো ফসল সুনামগঞ্জের হাওরবাসীরা ঘরে তুলতে পেরেছিলেন। বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ামণ্ডলে পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় অতিরিক্ত ও আগাম বৃষ্টিপাত হওয়া ও বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশিত হতে না-পারা, পাহাড় এলাকার গাছ উজাড়, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে জলস্রোতের সাথে পলি ও বালি নেমে হাওর ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখন অকাল বন্যা ও জলাবদ্ধতা হচ্ছে।[১২]

পাহাড়ি ঢল ও অকাল বন্যা

নানান দুর্যোগ ও দুঃশাসন মোকাবেলার ভেতর দিয়েই এগিয়েছে আমাদের দেশের প্রান্তিক মানুষের জীবন ও সংগ্রামের ইতিহাস। এ দেশে বন্যার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ১৫শ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল দেশের বিরাট এলাকা। পরবর্তীতে ১৭৮৭, ১৮৪২, ১৮৫৮, ১৮৭১, ১৮৭৫, ১৮৮৫, ১৮৯২, ১৯৩১, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০ সালের বন্যার পর ২০০৪ সালের বন্যার ভয়াবহতা ছিল আগের মতোই ব্যাপক। পুস্তকি বিশেষজ্ঞদের ভাষ্যমতে, বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যার ভেতর (River flooding, flash flood, urban flooding, tidal

or storm surge floodingr) হাওর এলাকার জন্য বর্তমানে অকাল বা হঠাৎ পাহাড়ি ঢলের বন্যাকেই (flash flood) সবচেয়ে বেশি বিবেচনা করা হচ্ছে।[১৩] হাওর এলাকার মানুষেরা একে 'পাহাইড়্যা ঢল/বান' বলেই জানেন এবং এর ফলে হাওর এলাকায় দুর্ভোগ দিনে দিনে বেড়েই চলছে। এদেশের বন্যা নিয়ে আগেরকার গবেষণা বা সমীক্ষা কাজেরও তেমন একটা হদিশ মেলে না। সিলেট এলাকায় প্রচলিত বেশকিছু ধামাইল গীত, বান্ধা গান বা উত্তরাধিকারের পরম্পরায় চলে আসা কথ্য ইতিহাসে স্থানীয় বন্যার বেশকিছু উপাত্ত মেলে। বাংলাদেশের বন্যা বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য খুবই কম পাওয়া যায়। পরিসংখ্যানবিদ ও আবহাওয়াবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ১৮৭০ থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী অঞ্চলের বন্যার তথ্যাদি নিয়ে *'রিপোর্ট অন রেইনফল এন্ড ফ্লাডস ইন নর্থ বেঙ্গল: ১৮৭০-১৯২২ (Report on rainfall and floods in North Bengal : 1870-1922)* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। মহলানবীশ দেখান মাঝামাঝি মানের বন্যা ২ বছর অন্তর অন্তর হলেও ভয়াবহ আকারের বন্যাসমূহ ৬-৭ বছরের ভেতর হচ্ছে। এই এলাকার বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ১৯৫৩ সন থেকে মোটামুটি ভাবে জানা যায় (পৃ.৪৭)।[১৪] ১৯৫৪ সনে বন্যায় প্রায় ৩৬,৭৭৭ বর্গ কি.মি এলাকা এবং ১৯৫৫ সনে ৫০,৫০৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫৫ সনের বন্যার পরপরই তৎকালীন সরকার এদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের পথ ও পদ্ধতি বিশ্লেষণের জন্য জাতিসংঘের জুলিয়ান ক্রুগ, মিশিসিপি নদীর জেনারেল হার্ডিন, নেদারল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাইসিওকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেন। ১৯৫৬ সনে জুলিয়ান ক্রুগ তার প্রতিবেদন পেশ করেন যা 'ক্রুগ মিশন' নামে পরিচিতি পায়।[১৫] ১৯৬৩ সনে জেনারেল হার্ডিন এবং ১৯৬৪ সনে অধ্যাপক থাইসিও তাদের নিজস্ব প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনটি প্রতিবেদনেই এদেশের বন্যা সমস্যাকে পৃথিবীর জটিলতম বলে উল্লেখ করা হয়। জালের মতো বিস্তৃত শাখা নদীসমূহকে সচল রেখে নদীসংস্কার এবং নদীর তীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৬২ সনে বন্যায় দেশের ৩৭,২৯৫ বর্গ কি.মি. এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৩ সনে ৪২,৯৯২ বর্গ কি.মি., ১৯৬৯ সনে ৪১,৪৩৮ বর্গ কি.মি., ১৯৭০ সনে ৪২,৪৭৪ বর্গ কি.মি., ১৯৭১ সনে ৩৬,৩৩৪ বর্গ কি.মি., ১৯৭৪ সনে ৫২,৫১৫ বর্গ কি.মি., ১৯৮৭ সনে ৫৭,২৬৮ বর্গ কি.মি. এবং ১৯৮৮ সনে ৮৯,৯৭০ বর্গ কি.মি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত। বরাক-সুরমা-মেঘনার মোট দৈর্ঘ্য ৮০০ কি.মি. এবং বাংলাদেশ অংশে ৪১৮ কি.মি.। ১৯৯৮ সালের স্মরণকালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যার তিনটি কারণের ভেতর প্রথম কারণটিই হচ্ছে নদীর উজান এলাকায় অতিবর্ষণ।[১৬] উজানের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের পানি দেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালী সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা দিয়ে দেশব্যাপী অকাল বন্যার অবস্থা তৈরি করে। অপরিকল্পিত বাঁধ, নদী ভরাট ও দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে দিনকে দিন বন্যার ভয়াবহতা বেড়েই চলছে। সরকারি সূত্র মতে, ২০০৪ সালের

বন্যায় ৪৬টি জেলার ৩০০ উপজেলায় ৮ লাখ ৫১ হাজার ১১৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪৮ লাখ ৮৪ হাজার কৃষক পরিবার। এর ভেতর আবার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ২৬ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ জন। ২০০৪ সালের বন্যায় কৃষিক্ষেত্রে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ দেড় হাজার কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যায়। বন্যা-পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সরকারের পক্ষ থেকে ১৫৮ কোটি টাকার এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের বন্যা এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শস্য-ফসলের ক্ষতির তালিকা (১৯৫৩-১৯৮৮)[১৭]

[সূত্রঃ ১৯৮৭ flood and agricultural rehabilitation programme (in Bengali), BARC, Dhaka, Bangladesh, ১৯৮৭ এবং জনাব কে এম এলাহীর ১৯৮৮ সালের গবেষণাপত্রটি *‘The strategy for living with flood and flood rehabilitation’* নামে একটি পেপার হিসেবে ঢাকায় ২৪-২৭ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে ‘The seminar on floods in Bangladesh : Bangladeshi views’ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত হয়]

সন	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি.)	শস্য-ফসলের ক্ষতি (মিলিয়ন টন)
১৯৫৩	২৭,০০০	০.৬
১৯৫৪	৩৭,০০০	০.৭
১৯৫৫	৪০,০০০	০.৯
১৯৫৬	৩৬,০০০	০.৫
১৯৬২	৩৭,০০০	১.২
১৯৬৩	৩৫,০০০	০.৭
১৯৬৪	১০,০০০	০.৩
১৯৬৬	৩৩,০০০	১.০
১৯৬৮	৩৭,০০০	১.০
১৯৬৯	৪১,০০০	১.১
১৯৭০	৪২,০০০	১.০
১৯৭১	৩৬,০০০	১.২
১৯৭২	২১,০০০	০.৩
১৯৭৩	২৯,০০০	০.৬
১৯৭৪	৫২,০০০	১.৪
১৯৭৫	১৭,০০০	০.৪
১৯৭৬	২৮,০০০	০.৯
১৯৮০	৩৫,০০০	০.৪
১৯৮১	১২,০০০	০.৩
১৯৮২	২৩,০০০	০.২
১৯৮৩	১১,০০০	০.৭
১৯৮৪	৪৮,০০০	১.৩
১৯৮৫	২২,০০০	০.৬
১৯৮৬	১৮,০০০	০.৬
১৯৮৭	৬০,০০০	১.৫
১৯৮৮	৯৮,০০০	৩.২

দেশের বন্যা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের কাজে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভারতীয় অংশের মেঘালয়-আসাম-ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি এলাকার অতিবর্ষণের কারণগুলো খতিয়ে দেখা হয়নি। পাহাড়ি এলাকার প্রতিবেশে কী এমন পরিবর্তন ঘটেছে, অবকাঠামোগত কী পরিবর্তন ঘটেছে, এক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রিক নীতি ও সমন্বিত

উদ্যোগগুলো কী হতে পারে তা কখনোই বাংলাদেশের বন্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হতে দেখা যায় না। দেশে হাওর এলাকার মানুষেরাই যেহেতু সরাসরি এই পাহাড়ি ঢলের হঠাৎ-অকাল বন্যার দুর্ভোগ-পোহানো মানুষ তাই হাওরবাসীরাই বাংলাদেশের বন্যার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী অবকাঠামোগত, প্রতিবেশগত ও উন্নয়ননীতিগত বিষয়কে ব্যাখা করে বিষয়টিকে আন্তঃরাষ্ট্রিক জায়গা থেকে ভাববার পাটাতন মেলে দিলেন।

জলাবদ্ধতা ও চর: জনগণের নয়া দুর্ভোগ

১৭৬৯-৭০ সালে দীর্ঘস্থায়ী খরায় বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিলএবং ১৯৪৩ সনে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ খরার কারণে মারা যায় (পৃ.৩১)।[১৮] হাওর জলাভূমির দেশ ভাটি এলাকায়ও এখন বিরাজ করে খরা। চৈত্রের নিদান। প্রবর্তিত উফশী ধানের জমিন পায় না সেচের পানি, মানুষের ঘরে থাকে না খাবার। এ এক কঠিন সময়। দিন দিন হাওর এলাকার প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য বদলে গিয়ে হাওর এখন নামে মাত্র হাওর আছে, বর্ষা মওসুমে যা পাহাড়ি ঢলের পানিতে এক জলাবদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার দাড়াইন ও গোদী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধ হয়ে অনাবাদী থাকে।[১৯] দিরাই-শাল্লার সাবেক সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে হাওরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান, ভাটি অঞ্চলের অধিবাসীরা বার বার ফসল হারিয়ে এখন তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে।[২০] বর্ষায় একদিকে পাহাড় থেকে অজস্র জলরাশি নামে অপরদিকে সেই সঙ্গে বালি এসে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাওর রক্ষা বাঁধের উচ্চতা কোথাও কোথাও ৬ মিটার থেকে ৪ মিটারে নেমে এসেছে। নেত্রকোণার প্রধান নদী সোমেশ্বরী, মহাদেও, লেঙ্গুরা, কংশ, উবদাখালী নদী শুকিয়ে চর পড়ে ভরাট হয়ে বছরে আট মাস নদীতে পানি না-থাকায় এবং চর পড়ায় নদীগুলো সমানে বেদখল হয়ে যাচ্ছে।[২১] সোমেশ্বরী নদীর প্রায় ২০ ভাগ বেদখল হয়ে গেছে। উজানের পাহাড়ি এলাকায় স্বপ্রতিবেশীয় অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পাহাড় ধ্বসে নামে বালি ও নুড়ি পলির স্তূপ। হাওরের বিস্তীর্ণ ভূমিতে যা জমা হয়ে দিন দিন চরভূমি তৈরি করছে। এই নয়া বালির চরভূমির সাথে হাওরবাসীরা পরিচিত নন। হাওর এলাকার কৃষিপ্রতিবেশ বদলে দিচ্ছে এই পাহাড়ি বালির চর। এখানে কোন ধরনের শস্য ফসল চাষ করা যায় তা হাওরবাসীর জানা নেই। আর এভাবেই হাওর এলাকায় খরা, জলাবদ্ধতা, চর তৈরি হয়ে জনজীবন ও প্রকৃতিতে নিয়ে এসেছে এক নিদানের কাল।

বদলে গেছে হাওর এলাকার যোগাযোগ

তোরা কে যাস রে ভাটির গাঙ বাইয়া
আমার ভাইধনরে কইও নাইওর নিত আইয়া
সুজন মাঝিরে ভাইরে কইও গিয়া
নাইওর না আইলে নিতে পরান যায় জ্বলিয়া

[ভাটি এলাকার এক জনপ্রিয় গীত]

না, হাওর এলাকায় এখন আর পাল-তোলা নৌকা চলে না। এখন আর কালনী নদীর তীরে বসে বাউল আবদুল করিম শাহর পক্ষে *কুন মিস্তরী নাও বানাইল কেমন দেখা যায়, ঝিলমিল ঝিলমিল করেরে ময়ূরপংখী নাও..* গীত বান্ধা কি সম্ভব। হাওরবেষ্টিত সুনামগঞ্জের দিরাই শাল্লার সুরমা, কুশিয়ারা, কালনী নদী এবং হোরুয়া মন্দরী, বালি খাল, চাতল বিল, খাগাছিরা বিল, কালিয়া কোঠা, কামাল বিল, সিকান্দাইড, বান্ডা, আত্রা, জাহানপুরের খাল, কাইমা খাল, লাউরাঞ্জানী খাল, মরদাপুরের খাল, কুচিরহাঁও খাল, কিত্তাগাঁও, চরনার চর খালসহ সকল নদী, খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাওরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র মাধ্যম নৌকা, নদীর নাব্যতা হারানোর জন্য জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই প্রত্যন্ত এলাকায় প্রতিবছর ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসী জানান, অতীতে নদনদীর যে নাব্যতা তারা দেখেছেন তার অর্ধেকও বর্তমানে নেই।[২২] পলিমাটি ও বালির স্তর পড়ে ভরাট নদীগুলো হল সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের সুরমা, রক্তি ও বৌলা। সেলিমগঞ্জের নিকট সুরমা ভরাট হওয়ার কারণে ভৈরব ও মোহনগঞ্জের সাথে তিন অঞ্চলের নৌ-যোগাযোগ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কালনী নদী মার্কুলি থেকে ধলবাতার পর্যন্ত দুই কি.মি. জায়গা ভরাট হওয়ায় ১৯৮০ সাল থেকেই দিরাই-ভৈরব, শেরপুর লঞ্চ যোগাযোগ বন্ধ।[২৩] নেত্রকাণা এলাকার সীমান্তবর্তী সোমেশ্বরী নদীর ভাঙ্গনে ডাকুমারা, ইসলামপুর, কামারখালীসহ পাঁচটি গ্রামের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিলীন হয়ে গেছে।[২৪] ডাকুমারা-ইসলামপুরের প্রায় তিন কি.মি. রাস্তা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। নেত্রকোণার প্রধান নদী সোমেশ্বরী, মহাদেও, লেঙ্গুরা, কংশ, উবদাখালী নদী শুকিয়ে চর পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভেঙে গেছে জেলার সার্বিক নৌ-ব্যবস্থা। ৩০০-৫০০ মণি নৌকার প্রচলন আর নেই বললেই চলে।[২৫] হাওরের মানুষেরা জলের সাথেই গড়েছিলেন এক স্বনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা ক্রমেই বিলীন ও বিপন্ন। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে হাওরবাসীর চৈতন্যগত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে যা হাওর উন্নয়নের কোনো উন্নয়ন প্রকল্প মাথায় রাখে না।

রাষ্ট্রের বাহাদুরি জেল্লা ও পানির নিরন্ন ধারা

ক্রুগ মিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'পূর্ব পাকিস্তান পানি ও শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (East Pakistan water and power development authority) গঠন করা হয়।[২৬] উক্ত কর্তৃপক্ষ ১৯৬৪ সালে বিদেশি ও দেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করে ২০ বছরের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি পানি উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা করার। এই পানি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার একজন বিশেষজ্ঞ এবং মিসিসিপি নদী কমিশনের পূর্বতন চেয়ারম্যান জেনারেল হার্ডিন ১৯৬৩ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় ধরনের কোনো অবকাঠামোগত নির্মাণের বিরোধিতা করেছেন। তিনি রিপোর্টে জানান, বাংলাদেশের নদীর সাম্প্রতিক পরিবর্তন এবং ব-দ্বীপ ভূমির অবস্থাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। নদীর স্বাভাবিক বন্যা জীবনের অংশ, মানুষ এই বন্যার সাথে তার জীবনের কৌশল বদলে বদলে শিখে নিরন্তর কিভাবে বাঁচতে হয়। ১৯৬৪ সালে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে পানি পরিকল্পনা শুরু হয় যখন ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পানি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে।[২৭] ১৯৮৬ সালে মাস্টার প্ল্যান অর্গানাইজেশন একটা খসড়া মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে, ১৯৯৯ সালে তা সময়োপযোগী করা হয়। বাংলাদেশের ২৫ বছর মেয়াদি ৯১৫ বিলিয়ন টাকার (১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ৬৪ ভাগ রাখা হয়েছে খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য, ৩২ শতাংশ কৃষির জন্য, ১.২ শতাংশ পরিবেশ ও বনের জন্য এবং বাকি ০.৭৭ ভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য রাখা হয়েছে।[২৮]

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া-জৈন্তিয়া, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সাধারণত এপ্রিল মাসেই হাওর অঞ্চল তলিয়ে যেত। কখনো কখনো ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই এই ঢল হাওর অঞ্চল ডুবিয়ে ফেলত। স্থানীয় কৃষকেরা নিজেরাই জমির আল বেঁধে আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেত। কালের আবর্তে পাহাড়ি ছড়াগুলোর গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় আগাম বন্যার পানি নদীতীর উপচিয়ে হাওর অঞ্চলে ব্যাপক ফসলহানি ঘটাত। এমন দুরবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হাওর এলাকার ফসল ভারতের পাহাড়ি ঢলের হাত থেকে রক্ষা করতে বেশকিছু ডুবন্ত বাঁধ তৈরি করে। পাশাপাশি উচ্চফলনশীল জাতের চাষের জন্য সেচ সুবিধা ও জলাবদ্ধতা দূর করার প্রকল্প হাতে নেয় (পৃ.৫)।[২৯] পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্র থেকে জানা যায়, অকাল বন্যা ও পাহাড়ি ঢল থেকে সুনামগঞ্জের ৩২ টি হাওরের বোরো ফসল রক্ষার জন্য ২০০৬ সালে বরাদ্দ হয়েছিল ৪কোটি ৬৭ লাখ টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার বড় হাওরগুলোর কোথাও ৪০ থেকে ৫০ ভাগের বেশি কাজ হয়নি। তাহিরপুরের শনির হাওরের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬ লাখ টাকা এবং মাটিয়ান হাওরের জন্য বরাদ্দ ছিল ১২ লাখ টাকা।[৩০] সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা দিরাই উপজেলার ফয়জুল্লাপুর নামক স্থানে ফসল রক্ষা

বাঁধের ১৯৭ মিটার নির্মাণের জন্য ২০০৬ সনে প্রয়োজন ছিল ৮২ লাখ টাকা কিন্তু এ খাতে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১২ লাখ টাকা।[৩১] এ বাঁধের উপরেই দিরাই-শাল্লা-জগন্নাথপুরে উপজেলার ভান্ডা বিল, বরাম হাওর, চেপটির হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, নলুয়ার হাওর ও কালিকোটা হাওর পাড়ের মানুষদের কৃষিজীবন নির্ভর করে। সুনামগঞ্জের ৩২ টি হাওর এলাকার বোরো ফসল পাহাড়ি ঢল ও বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১,১০২ কি.মি. ডুবন্ত বাঁধ রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড যাদুকাটা নদী ৩ কি.মি. খনন, বৌলাই নদী ৫ কি.মি. পুনঃখনন, ঘাঘটিয়া নদী দেড় কি.মি. পুনঃখনন, রক্তি নদী ৫ কি.মি. পুনঃখনন, সুরমা নদী ৫ কি.মি. পুনঃখনন, বৌলাই নদী ৭ কি.মি. খনন, ডাউকী-ইটাখোলা-নলজুর নদী ৩৫ কি.মি. পুনঃখনন এবং পাটলাই নদী ৩ কি.মি. পুনঃখননের প্রকল্প প্রস্তাব করলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না।[৩২] ফ্যাপ (FAP)-এর অংশ হিসেবে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় রাজধানী ঢাকাতে দেশের প্রথম বন্যাপূর্বাভাষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ‘Flood forecast & Warming center (FF & WC)’ নামে।[৩৩] কিন্তু এইসব পূর্বাভাষকেন্দ্র হাওরবাসীকে জানাতে পারে না কখন নামবে পাহাড়ি ঢল আর কী পরিমাণে বালির ধস নিয়ে নামবে। এইসব পূর্বাভাষ কেন্দ্র উজানের দেশকে সতর্ক করতে পারে না তার সীমান্ত এলাকার প্রতিবেশগত অবস্থা ঠিক করার। কেবলমাত্র পাহাড়ের পাথর আর কয়লাবাণিজ্য আজ হাওরের এই দুরবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী। কর্পোরেট পণ্য রাষ্ট্র বিপন্ন হাওরের দিকে না-তাকিয়ে বারবার বালি-পাথরের ব্যবসাকেই প্রধান করে দেখে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় বলতে শোনা যায়,‘সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে’ সুনামগঞ্জের বালি, পাথরমহালগুলো ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।[৩৪] জেলায় ছোট বড় মহালের সংখ্যা ১৩টি। তাহিরপুর উপজেলার ফাজিলপুর পাথরমহাল, যাদুকাটা নদীর ভাসমান মহাল, ছাতক উপজেলার সুনাই মহাল, বাইরং নদী মহাল, দোয়ারাবাজার উপজেলার খাসিয়ামারা-কালিউড়া-সুজাউড়া-ছিলাই-ভোলাখালী নদী মহাল, বিশ্বম্ভরপুর ও সুনামগঞ্জ উপজেলার ধোপাজান নদীর বালি ও পাথরমহাল থেকে প্রতিবছর ১৫ কোটি ঘনফুট বালি ও ৫ হাজার ঘনফুট বালি দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হয়। হাওর উন্নয়নে জান দিয়ে দেয়া প্রকল্প কার্যালয়গুলো তৈরি হয় এইসব বালি ও পাথর দিয়েই। উন্নয়ন কর্মকর্তা আর পরিকল্পনাবিদদের দালান-বাড়ি তৈরি হয় হাওরকে বিপন্ন করে তোলা এইসব পাথর-বালি দিয়েই। এইসব পাথর বালির ব্যবসা করেই আমাদের জনপ্রতিনিধিরা তার সশস্ত্র নিরাপত্তা আরো জোরদার করেন। অথচ হাওরবাসী মানুষেরা দিন দিন তার জলভূমি থেকে, তার জমিন থেকে উচ্ছেদ হয়ে আজ এই বালুমহালে ঐ পাথর কোয়ারি দিনমজুরি করে জান দিয়ে দেয়। এছাড়াও আছে এইসব পাথর, বালু ও কয়লা ব্যবসা নিয়ে নতুন শ্রমিক-মালিক ক্ষমতা সম্পর্ক। এই ক্ষমতা দেশের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। প্রতিটি বারকি শ্রমিক সর্দারের অধীনে ৫০/৬০ জন বারকি শ্রমিক কাজ করে। এইসব

শ্রমিক সর্দারেরা বিভিন্ন প্রভাবশালী স্টিল নৌকার মালিকদের সাথে কাজ করে। সেই সুবাদেই নৌকা মালিক সমিতির বিশাল সংগঠনের নির্দেশেই যাদুকাটা নদীর পাড় কেটে বালু উত্তোলন করে যাচ্ছে শ্রমিকরা। স্থানীয় সংসদ সদস্য নজির হুসেনের ভাগনা মাওলানা বদর ইদ্দিনের নামে বালু ও পাথরের মহাল থাকায় এসব বিষয়ে এমপি নীরব ভূমিকা পালন করছেন বলে এলাকাবাসী জানান।[৩৫] নদীর তীরবর্তী গ্রামসমূহের বিভিন্ন পেশাজীবী লোকজনের সাথে কথা বললে তারা জানায়, আমরা অসহায়, তোমরা আমাদের রক্ষা কর।

লংঘিত নীতি ও নথি : দলিত দলিল ও চিৎকার

বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃরাষ্ট্রিক বিষয়গুলোকে হাওর এলাকার জন্য বুঝবার তাগিদে আমরা একটু পেছন থেকেই শুরু করছি। ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ, চুক্তি ও নীতিসমূহ কিভাবে আমাদের হাওর এলাকায় প্রভাব তৈরি করেছে আমরা তা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। ভারতীয় এলাকায় কী ধরনের উন্নয়ন উদ্যোগ নেয়া হলে আমাদের হাওরে কী ধরনের প্রভাব পড়ে এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো আলোচনার কথা আমরা জানতে পারি না। পানি সম্পর্কিত বিষয় এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও আন্তঃরাষ্ট্রিক সিদ্ধান্তসমূহ কিভাবে আমাদের হাওর এলাকাকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা জনগণের প্রতি কিরূপ তা আমাদের আলোচনায় তোলা জরুরি।

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (১৮৫৪)-এর মাধ্যমে বর্তমান ভারতের আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর, লক্ষীপুর, কাছাড়, গারো হিলস, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া হিলস, নাগা হিলস নিয়ে ১৮৭৪ সালে গঠিত হয় আসাম চিফ কমিশনারশিপ। ১৮৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সিলেটকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ পৃথক হয়। ১৯১১ সালে সিলেট পুনরায় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সিলেট আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে সিলেট তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অংশ হয় (পৃ. ১৫-১৬)[৩৬]।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন

১৯৭২ সালে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন উজানের প্রতিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রভাব ভাটিতে হাওর এলাকায় কী ধরনের পরিবর্তনশীলতা তৈরি করছে সে বিষয়ে আদৌ কোনো ইতিবাচক কার্যকরী আলোচনা করেছে কি না আমাদের জানা নেই। শোনা যায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে ভারত পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা বজায় রাখে, অথচ থাকার কথা সমমর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ শাখা ভারতের অসন্তুষ্টি এড়ানোর জন্য গঙ্গা এবং ফারাক্কা বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে

খোলামেলা আলোচনা করতে নিরুৎসাহিত করে। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রকৌশলীদের ভয় এ নিয়ে কোনো রকমের সমালোচনা ভারতকে একলা চলো নীতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। এর ফলাফল তার পার্শ্ববর্তী ছোট এবং কম ক্ষমতাশালী ভাটির দেশের ওপর যাই হোক-না কেন তাই গঙ্গা বিষয়ক পরিসংখ্যান জোগাড় করা কষ্টকর (পৃ.৩৩)[৩৭]। ১৯৯৬-৯৭ সালের শুকনো মৌসুমের কথা বলা যায়, সর্বশেষ ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র কয়েক মাস পর সরকার বাংলাদেশে হাডিঞ্জ ব্রিজের নিকটস্থ পানি পরিমাপক কেন্দ্র থেকে নদীর প্রবাহের উপাত্ত প্রকাশ নিষেধ করে দেয়। সেই বছর গঙ্গার প্রবাহ ৬,০০০ কিউসেক নেমে আসে যা গঙ্গার পানিপ্রবাহের সর্বকালের সর্বনিম্ন রেকর্ড।

বাংলাদেশে ২৫ টি জেলায় ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি জুড়ে রয়েছে গঙ্গা-নির্ভর এলাকা, এর মধ্যে ২.৫ মিলিয়ন হেক্টরে চাষাবাদ হয়। প্রায় ১০ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে উপকূলীয় বাদাবন এবং ১৩ শতাংশ জুড়ে রয়েছে নদী ও বিল জলাশয়। শুকনো মওসুমে গঙ্গার পানিপ্রবাহ দ্রুত পড়ে যায়, ভারত উজানে গঙ্গার পানি একতরফা ভাবে প্রত্যাহারের ফলে আমাদের উত্তরাঞ্চলে দেখা দেয় খরা ও বিপর্যয়।[৩৮]

বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও সীমান্ত নদী বিষয়ক বিবাদ মেটাতে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের ৩৬ তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫-১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখ পর্যন্ত আলোচিত স্থানগুলো দুই দেশের পানিসম্পদ মন্ত্রীরা পরিদর্শন করেন।[৩৯] পরিদর্শন শেষে ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশের একটি হোটেলে বৈঠকে বসেন দেশের পানিসম্পদ মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী সাইফুদ্দিন সৌজ। বৈঠক শেষে ঐদিনই হোটেল শেরাটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তারা জানান, মূলত চারটি বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ইছামতি নদীতে ড্রেজিং, ফেনী নদীর পানি ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণ এবং মুহুরী সহ বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৪টি সীমান্ত নদীর ভেতর ১০/১২টি নদীতে ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ভূমি হারাচ্ছে। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভেতর উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ জোবায়ের, জেআরসির সদস্য তৌহিদুল আনোয়ার খান, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত লিয়াকত আলী চৌধুরী। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও পানিসম্পদ মন্ত্রী সুভাষ নস্কর, পানিসম্পদ সচিব গৌরী চ্যাটার্জি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রি, ভারতের জেআরসি সদস্য এসপি কাকরান। বৈঠকে সীমান্ত-নদীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভারত বাংলাদেশের ওপর একতরফা চাপ সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশ রাজি হয়নি। হাওর এলাকার সীমান্তবর্তী আন্তঃরাষ্ট্রিক বিষয়গুলো সকল পরিকল্পনা এবং দ্বিপাক্ষিক আয়োজনগুলোতে এড়িয়ে যাওয়া হয়। জানা যায়, বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম রাজ্যের সরকারি কর্মকর্তারা একবার একটি

যৌথ দ্বিপাক্ষিক সভায় সুরমা নদীর নাব্যতা বাড়ানোর জন্য সিলেট অংশে এবং সুরমার উৎস নদী ভারতের বরাক উপত্যকা অংশে খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু এই কাজ আর আগায়নি[৪০] ।

গঙ্গা পানিচুক্তি ১৯৯৬

ভারত, নেপাল, চীন (তিব্বত) ও বাংলাদেশের ২,৫০০ কি. মি. নিয়ে বিস্তৃত গঙ্গা ৫০ কোটি মানুষের জীবিকার উৎস। পৃথিবীর জনসংখ্যার আট ভাগের এক ভাগ এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। গঙ্গা অববাহিকার মোট আয়তন ১,০৯৩,৪৫০ বর্গ কি.মি.-এর ভেতর বাংলাদেশে এর চার শতাংশ মানে ৪০,০০০ বর্গ কি.মি এলাকা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যা দেশের মোট এলাকার ৩৬ ভাগ গঙ্গার পানির ওপর নির্ভরশীল। গঙ্গা নদী থেকে বাংলাদেশের মোট প্রবাহিত মিঠা পানির ১৮ শতাংশ আসে। ব্রহ্মপুত্র থেকে দেশের ভূপৃষ্ঠের পানিপ্রবাহের ৬৭ ভাগ আসে এবং মেঘনার মাধ্যমে ১৫ ভাগ আসে। দেশের জনসংখ্যার ৪১ ভাগ মানুষ গঙ্গার পানির ওপর নির্ভরশীল। ভারতে গঙ্গার পানিপ্রবাহে হস্তক্ষেপ শুরু হয় চতুর্দশ শতকে যখন ১৩৫৮ সালে ফিরোজশাহ তোঘলক পশ্চিমে যমুনা খালটি খনন করেন। পলিমাটি জমে যাওয়ায় সমস্যা সমাধানের জন্য ভাগিরথী ও হুগলী নদীর পানিপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য স্যার আর্থার কটন ১৮৫৪ সালে প্রথম গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের কথা বলেন। পরে উইলকক্স (১৯৩০), ওগ (১৯৩৯) এবং ওয়েবস্টার (১৯৪৫) একই ধরনের কাঠামোগত হস্তক্ষেপের কথা বলেন। ভাগিরথী-হুগলীর চ্যানেলকে নৌ-চলাচলের জন্য চালু রাখার কথা বলে ১৯৬৩ সালে ভারত ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ শুরু করে। ১৯৭৫ সালে বাইপাস ফিডার খালের কাজ শেষ হয়। ১৯৭৬ সালে বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উত্তাপিত হয়। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে নেপালের সাথে মহাকালী চুক্তি সইয়ের বছর ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত ২০০২ সালে ৫,৬০০ বিলিয়ন রূপির আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প (আরএলপি)-এর পরিকল্পনা ঘোষণা করে।[৪১]

বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০০ মিলিমিটার হলেও স্থান ও সময়ভেদে তা বিভিন্ন হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিভাগে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩,৪৬৮ মি.মি। ১৯৯৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী শুকনো মৌসুমে গঙ্গার পানি পাওয়া যাওয়ার কথা ৭১১ থেকে ৯৯৫ কিউসেক (ঘনমিটার), যখন এখানকার সার্বিক পানির চাহিদা থাকে প্রায় ৩,৪০০ কিউসেক। কিন্তু অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশ ন্যূনতম পরিমাণ পানি পাওয়ার জন্য ভারতকে বাধ্য করতে পারে এমন কোনো বিধান এই চুক্তিতে থাকা দরকার।[৪২] চুক্তিতে উভয়পক্ষের শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ, সমতাকেন্দ্রিক আন্তঃরাষ্ট্রিক নদী ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে।

Article VIII : ‘The two governments recognize the need to co-operate with each other in finding a solution to the long term problem of augmenting the flows of the Ganga during the dry season.’

Article IX : ‘Guided by the principles of equity, fairness and no harm to other party, both the governments agree to conclude water sharing treaties/agreements with regard to other common rivers.’

[Source: Articles are collected from the Treaty of 1996 singed between India and Bangladesh on the sharing of the Ganga water at Farakka barrage][43]

ভারতের প্রস্তাবিত আন্তঃনদী মহাসংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাঁধের রাজনীতি

ভারতের বিদ্যুৎ আইনের ২৯ ধারা বলে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০৩ সালের ১৮ জানুয়ারি উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিমিটেডের ‘টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পটি’ অনুমোদন দেয় ভারত সরকার। স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন (এনইইপিসিও) মনিপুর রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বরাক নদীর উজানে চুরাচাঁদপুর জেলার বরাক ও তুইভাই নদীর মিলনস্থলের টিপাইমুখ এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০ মিটার উঁচু এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬,৩৫১ কোটি রুপি। মাত্র ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বানানোর জন্য চিরস্থায়ী জলাবদ্ধ বা মরুকরণ শুরু হতে পারে বরাক নদীর ভাটি অঞ্চলে মানে বাংলাদেশের হাওর এলাকায়। বলা হচ্ছে টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরপূর্ব ভারতের ২০,৭৯৭ হেক্টর প্রাকৃতিক বনভূমি, ১১৯৫ হেক্টর গ্রাম, ৬১৬০ হেক্টর কৃষিবাগান, ২,৫২৫ হেক্টর কৃষিজমি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮টি গ্রাম, ১৪৬১ টি আদিবাসী পরিবার, ৬০ কি.মি. দীর্ঘ ৫৩ নম্বর মহাসড়ক এবং প্রায় ৬৭টি গ্রামের মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের উত্তর-পূবাঞ্চলের সিলেট ও ঢাকা বিভাগের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই ৭টি প্রশাসনিক জেলার ৭,৮৪,০০০ হেক্টর জলাভূমি নিয়ে দেশের প্রায় ৪২৩ টি হাওর বিস্তৃত রয়েছে। টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগ এই হাওর অঞ্চলসহ মেঘনা অববাহিকাতে এক দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় তৈরি হবে। খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়বে ভারত-বাংলাদেশ-মিয়ানমার এই তিন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নদী বরাক। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ডের পাটকাই পাহাড়ের গভীর অরণ্য থেকে ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু নিয়ে বরাকের জন্ম। মনিপুরের লোগতাক হ্রদ থেকেও জল পেয়েছে বরাক। মনিপুর রাজ্যের সেনাপতি জেলার লাইলাই গ্রাম থেকে তামেলং হয়ে চুরাচাঁদপুর জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসামের বরাক ও কাছাড় উপত্যকায় প্রবেশ করেছে বরাক। বরাক উপত্যকার কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বরাক নদী

আসামের করিমগঞ্জ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসীদ এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে প্রবাহিত হয়েছে। সুরমা পরবর্তীতে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে এবং কুশিয়ারা-সুরমা-মেঘনার এই মিলিত প্রবাহই বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালী। টিপাইমুখ অঞ্চল থেকে উচ্চ অববাহিকায় প্রবাহিত হয়েছে নোনে, নুংবাহ্ এবং তুইভাই নদী। নোনে ও নুংবাহ্ মণিপুরের পাহাড় থেকে এবং মিয়ানমারের পাহাড় থেকে জন্ম নিয়েছে তুইভাই। টিপাইমুখ থেকে নিম্নঅববাহিকায় প্রবাহিত হয়ে বরাকে মিলিত হয়েছে নারায়ণছড়া, বড়বেকড়া, ছোট বেকড়া, কাংরিংছড়া, জিরি, চিরি, সোনাই, রূকণি, মধুরা, জাটিঙ্গা, ঘাঘরা, কাটাখাল, ধলেশ্বরী, লঙ্গাই, সিংলার মতো নদীগুলো। এছাড়াও বরাক নদীতে মিলিত হয়েছে ৫-১০ ফুট প্রশস্ত অসংখ্য পাহাড়ি ঝিরি ও ছড়া। যদিও কোনো প্রকল্প গ্রহণের ন্যূনতম প্রাথমিক শর্ত অবহিতকরণ, পরিবেশগত প্রভাব যাচাই এবং তৃণমূলের অংশগ্রহণ। কিন্তু টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশ-প্রতিবেশগত প্রভাব প্রতিবেদনের কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। জনগণের প্রতিবাদকে গুরুত্ব না-দিয়ে গায়ের জোরে টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এটি লংঘন করবে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জলপ্রবাহ-প্রাণবৈচিত্র্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও সনদসমূহ। ভারতের মতো একটি 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন কি কাম্য? ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর এবং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময়ও ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে আশ্বাস দেয়া হয় টিপাইমুখ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু টিপাইমুখ প্রকল্পটি দুনিয়ার এক ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় নদীর উজানে করা হচ্ছে। এর ফলে ভাটির বাংলাদেশে কী ধরনের দুর্যোগ ও ভয়াবহতা নেমে আসতে পারে তা আমরা ফারাক্কা বাঁধ ও বাংলাদেশের কাপ্তাই বাঁধের করুণ অভিজ্ঞতা থেকেও আন্দাজ করতে পারি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০ মিটার উঁচু এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬,৩৫১ কোটি রুপি। মাত্র ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বানানোর জন্য চিরস্থায়ী জলাবদ্ধ বা মরুকরণ শুরু হতে পারে বরাক নদীর ভাটি অঞ্চলে মানে বাংলাদেশের হাওর এলাকায়।

একসময় হাওরে জন্মাত টেপী, বোরো, রাতা, শাইল, লাখাই, মুরালী, চেংড়ি, সমুদ্রফেনা, হাসিকলমী, কাশিয়াবিন্নি, দুধলাকি, দুধসাগর, লাটলি, মারতি, তুলসীমালা, আখনিশাইল, গাছমালা, খৈয়াবোরো, রাতাশাইল, দেউড়ি, কন্যাশাইল, বিচিবোরো, লোলাটেপী, পশুশাইল, হাঁসের ডিম, গুয়ারশাইল, বেতী, ময়নাশাইল, গদালাকি, বিরঅইন, খিলই, ছিরমইন, আগুনী, গুলটিহি, ল্যাঠা, জাগলীবোরোর মতো অবিস্মরণীয় সব গভীর পানির ধান জাত। বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন *সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যাবস্থাপনা প্রকল্পের* অন্তর্গত *ফিশারিজ*

রিসার্চ সাপোর্ট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার কর্তৃক ২০০৭ থেকে ২০০৯ সন পর্যন্ত শুধু সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন হাওর ও বিল হতে ১২২ প্রজাতির মাছ রেকর্ড করা হয়েছে। হাওর জলাভূমির এক অবিস্মরণীয় ভৌগোলিক নির্দেশনা নানিদ মাছ হাওর এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। হাওরের চিতল, বাঘাইর, মহাশোল, বেরকুল, এলং, বামস, রানী, আলুনী, সিলং, বাছা, ঘাইরা, চিরাই, দেশি পাঙ্গাস, গাং মাগুর, কোটা কুমিরের খিল, ঘাঘলা, ঘোড়ামুখ, রিঠা, আগুনচোখা, আইড়, গুতুম মাছ মাছগুলোও হাওর থেকে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে হাওরাঞ্চলের গভীর পানির টিকে থাকা মুমূর্ষু ধানবৈচিত্র্য, মাছবৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হাওরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জলাবন, করচের বাগ হারাবে প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য। হাওরাঞ্চলের হিজল, করচ, বরুণ, তমাল, কদম, বেত, মূর্তা, কাইশ্যা, শণ, খাগ, মনকাঁটা, বনতুলসী, ঢোলকলমীর মতো জলাভূমির বৃক্ষপ্রজাতিগুলো হারাবো বিকাশমানতার পরিবেশ। হাওর জলাভূমি থেকে আকালের দিনে গ্রামীণ নারীরা সংগ্রহ করেন ঢ্যাপ, শাপলা, কেওরালী, পুখল, কলমী, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, রসুন্ডা, গণিয়ারী, মদনমস্তকের মতো কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে হাওরাঞ্চলে পানিপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়বে যার ফলে এসব খাদ্যবৈচিত্র্য থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবে এক গ্রামীণ সমাজ। জলধামালী, ব্যাঙের বিয়ে, তিল সংক্রান্তি, বান্ধা গান, ঢপযাত্রা, বাঘাই শিরণী, গঙ্গাপূজা, হিদলনাটাই বর্ত, শীতলা পূজা, শ্রাবণী পূজা, কর্মপুরুষের বর্ত, জালাবর্ত, হাজং আদিবাসীদের জাখামারা গীত, হোমাই ঠাকুরের মেলা, সোমেশ্বরী মেলা, ধল মেলা, আড়ঙ্গ, বারুণী স্নান ও মেলা, বুড়াইবুড়ি পূজা, ভোলাভূলির মতো ভাটি-সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ সরাসরি হাওরের প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের সাথে সরাসরি জড়িত। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে হাওরাঞ্চলের জনসংস্কৃতি ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। কারণ স্থানীয় প্রাণসম্পদ ও প্রতিবেশ বদলে যাবে। কৃষিনির্ভর হাওরাঞ্চলের এক বিশাল জনগোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যায় খননের ফলে কৃষিজীবন হারিয়ে আজ পাথর ও কয়লাখনির শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধ হলে হাওরাঞ্চলের জীবিকা ও পেশায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে এবং নিজস্ব উৎপাদনসম্পর্কের ধারা থেকে উদ্বাস্তু হবে এক বিশাল জনগোষ্ঠী।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের নদীগুলোর উপরে ১৬টি বৃহৎ বাঁধ চালু করেছে এবং আরও ৮টি বাঁধ নির্মাণাধীন রয়েছে। ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতে সর্বমোট ২২৬টি বা নির্মাণের সম্ভাব্য স্থানও নির্ধারণ করে ফেলেছে। এই বাঁধ নির্মাণ করে ভারত আগামী ৫০ বছরের মধ্যে ৯৯,২৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায়। জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯৭, গঙ্গা পানিচুক্তি ১৯৯৬, যৌথ নদী কমিশন ১৯৭২ ও প্রচলিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রথার আইনসমূহে পরিষ্কার বিধান থাকা সত্ত্বেও ভারত তা লংঘন করছে।[৪৪] মণিপুর-আসাম এলাকার বাঁধবিরোধী নেতা রিভার বেসিন ফ্রেন্ডস-এর রবীন্দ্রনাথ জানান, ভারতের নবনিযুক্ত পানিসম্পদ মন্ত্রী সন্তোষ মোহন

দেবের ধারণা টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প বাস্তাবায়ন করলে তার ভোটব্যাংক সমৃদ্ধ হবে ।[৪৫] এই ড্যামের পাশাপাশি আসামে সেচ প্রকল্পের জন্য শীতকালে বরাক নদীর পানি মনিপুর ও ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়া হবে । এই বরাক নদীই হাওর এলাকার প্রাণ সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মূল উৎস নদী । এতে করে বাংলাদেশ সুরমা ও কুশিয়ারাতে কোনো পানি পাবে না । এভাবে ভারত একতরফাভাবে সুরমা ও কুশিয়ারার পানি প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশের ভাটিতে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে ।

নদীর উপর এলোপাথারি কোপ বনাম নিম্নবর্গের জলবিদ্রোহ

দম পতুত দম রামচকমাই কিমাউ কিনচেং মাওমাদী
নং রাজাই নং মাদী নংকিলাই নং পাঁচগাও
চাই ইনসম সা জাইট লেঙাম কিরতিং আমফেও
চং আমফেৎ রেইট জালত ইয়াও হা ক্রিং আমফেও
হা রুব্রিনিরা ইলং ব্রেওখেত হাদেরে জাইট লেঙাম বেফাও ।

নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা থানার সীমান্তবর্তী মনগড়া গ্রামের সুরেশ নংমিন চলতি সময়ে এই গানটি রচনা করেছেন । গানটি বেশ দীর্ঘ । উপরের কথাগুলোর বাংলা মানে এরকম দাঁড়ায়, দমপতুত পাহাড়, দমরামচকমাই পাহাড়, কিমাউ কিনচেং (পাতল নদী), কিমাউ মাওমাদী (মাহাদেও/মহাদেব নদী) আমাদের লেঙাম নামের পুনর্জাগরণের জন্য জীবন দিয়েছে । এই সকল পাহাড় ও নদীর কূলে আমরা আমাদের জীবন পেয়ে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত । আমরা প্রায় ঝরে পড়ছিলাম, আমরা হারিয়ে যাচ্ছিলাম প্রায়, কিন্তু নদী ও পাহাড় তোমরা আবার আমাদের নতুন জীবন দিয়েছ । ঝরে পড়তে যেয়েও এমন জিনিস পেয়েছি যাতে ভর করে দাঁড়ানো যাচ্ছে । নদী ও পাহাড় আমাদের কোলে নিয়েছে বলেই আমরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারছি ।

প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নিয়ে জর্জ পারকিন্স মারসের ‘ম্যান এন্ড নেচার’ নামের গবেষণাপুস্তক থেকে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পারি ।[৪৬] দুনিয়ার প্রাচীনতম বাঁধ সায়েদ-আল-কাফারা যা মিশরের রাজধানী কায়রোর ৩০ কি.মি. দক্ষিণে নীল নদীর উপরে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল । ১১৭ মিটার লম্বা এবং নদীর স্রোতপৃষ্ঠ হতে ১২ মিটার উচ্চ এই বাঁধের ফলে কৃষিক্ষেত্রে সেচের সাময়িক সুবিধা হলেও তা প্রাকৃতিক জলধারার গতিপথ পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছে । এ যাবত কালে প্রাকৃতিক জলধারার উপর কোনো ধরনের অবকাঠামোগত স্থাপনা তা বাঁধ হোক, ব্রিজ হোক, পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প হোক কোনো ন্যূনতম স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ইশারা জানাতে পারেনি । ১৭৯৬ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের পর অনেক ভূস্বামীরা নদীর তীর বাঁধ দেয় । প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ।[৪৭] এসব বাঁধের আকার ছিল ছোট এবং নিচু মাটির আইল এবং পানিপ্রবাহের জন্য ফাঁকা জায়গা

(আরবিএ, ১৯৮০)। ইদানীং কৃষিবিশেষজ্ঞরাও বলছেন যেকোনো ধরনের বাঁধের মতো অবকাঠামোগত নির্মাণ মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ইস্পান (Irrigation support project for Asia and Near east/ISPAN) সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যে, বাঁধ জমির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে এবং এর উর্বরতার পরিবর্তন ঘটায়।[৪৮] দেশে নদী, হাওর, পানি সম্পর্কিত যতগুলো প্রকল্প করা হয়েছে তা বরাবরই প্রাণ ও প্রকৃতির বিপক্ষে গেছে। দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক সম্পদ ব্যবহার করে করা ফ্যাপ দেশের জলপ্রতিবেশে যে চূড়ান্তরকমের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে তা আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের হাওর এলাকার জন্য পরিকল্পিত পানিব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ/এফএপি) অনুযায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা প্রতিরোধের জন্য আংশিক বন্যাপ্রতিরোধী ডুবন্ত বাঁধ, সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য উঁচু বাঁধ, নদী সংযোগ, নদী ও খাল খনন, পানি ধারণের জন্য অবকাঠামোগত নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। ফ্যাপ-৬ (১৯৯৩-এ) অনুযায়ী দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য ১৯টি সাময়িক বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৬টি প্রকল্পই মৎস্যক্ষেত্রের জন্য নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে। এর ভেতর বাকি ৯টি প্রকল্পের কোনো না কোনো প্রভাব মৎস্যক্ষেত্রে পড়েছে। পূর্ণ বন্যা প্রতিরোধের ১৮টি প্রকল্পের ভেতর ৮টি প্রকল্পরই নেতিবাচক প্রভাব মৎস্যক্ষেত্রে পড়েছে (পৃ.২৩)।[৪৯] জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যখন বর্ষামৌসুম ও বন্যার সময় তখনি মিঠাপানির মাছেদের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ও মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়।[৫০]এই সময়ে মাছের মৃত্যুহারও বেড়ে যায় (পৃ. ১৬)। ১৯৯২ সালে মধ্য জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সুনামগঞ্জের শনির হাওর বন্যায় পুরো ভেসে যায় এবং এই পূর্ণ বন্যার সময়টাই মাছেদের উৎপাদনের মূল সময়। মৌলভীবাজারের কাউয়াদিঘি হাওর বাংলাদেশের হাওরসমূহের ভেতর গভীরতম। সিলেট অঞ্চল থেকে ডিমঅলা মাছেরা ডিমপাড়ার জন্য কুশিয়ারা নদী দিয়ে কাউয়াদিঘি হাওরে চলে আসত বর্ষামৌসুমের আগেভাগেই। কাউয়াদিঘি হাওর সম্পর্কে এই কথাও শোনা যায় এখানে এত বড় মাছ পাওয়া গিয়েছিল যা তুলতে হেলিকপ্টার লেগেছিল। এই হাওর মনু নদীর উৎস মুখের কাছাকাছি অবস্থিত আর এই মনু নদী দিয়েই সম্পন্ন পলি বাহিত হয়।[৫১] জনগণবিচ্ছিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নীতিনির্ধারক, উন্নয়নবিদ আর ঠিকাদারের আর্থিক লাভ হতে পারে কিন্তু একটিবার ভাবা দরকার এর জন্য হাওর-জলাভূমির প্রাণ ও প্রকৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। জলাভূমি এলাকায় নানান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে স্থানীয় প্রতিবেশ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রাণবৈচিত্র্যের বহুপাক্ষিক সমাহার। এতে ভেঙে পড়ে স্থানীয় প্রতিবেশের সাথে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক এবং স্থায়িত্বশীল বাস্তুতন্ত্র। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত দাতা সংস্থার উন্নয়ননীতিতে চলা রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রকল্পসমূহের জন্য আজ হাওর জলাভূমির অনেক মাছবৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নানিদ (*Labeo*

nandina), আংরট (*Labeo angra*), পাংগাস (*Pangasius pangasius*), মহাশোল (*Tor tor*), কোরাল (*Lates calcarifer*), সরপুঁটি (*Puntius sarana*) মাছগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে হাওর জলাভূমি থেকে। এমনকি ভেদা মাছ (*Nandus nandus*) খালিয়াজুড়ি এলাকা থেকে, টাকি (*Channa punctata*) ও ঘাঘলা মাছ (*Arius gagora*) হোমাইপুর হাওর এলাকা থেকে, বাচা (*Eutropicthys vacha*) ও চিতল মাছ (*Natopterus chitala*) আজমিরিগঞ্জ এলাকা থেকে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে।[৫২] সান্যাল এবং চক্রবর্তী (১৯৯৫) দেখিয়েছেন, কিভাবে ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার ২৫ বছরের অধিক সময় পরেও তার প্রভাব ভাগিরথী ও হুগলী নদীর মোহনায় খুব সামান্য এবং প্রশ্নসাপেক্ষ রয়ে গেছে।[৫৩] একলাখ আদিবাসীকে উচ্ছেদ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটির কর্ণফুলী নদীর উপর জোর করে বসানো কর্পোরেট মুনাফাকারী ‘কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প’ আজ প্রায় বন্ধের পথে, কাপ্তাই কৃত্রিম জলাধারের পানি শুকিয়ে চর তৈরি হচ্ছে।

জেনিফার দ্যইনি পানিসম্পদ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় প্রকল্পগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান যে, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় উদ্যোগ ও গ্রামের স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত না-করার ফলে প্রকল্পসমূহ সর্বজনগৃহীত ও স্থায়িত্বশীল হয় না।[৫৪] ১৯৯৬ সালে সুনামগঞ্জের চেপটির হাওরের ফসল রক্ষার জন্য স্থানীয় গ্রামের মানুষেরা দিনে রাতে মাটি কেটে ৬০,০০০ টাকার ভেতর বাঁধ দেন এবং প্রায় ২৬ গ্রামের ফসল রক্ষা করেন। হাওর সম্পর্কিত উন্নয়ন নীতিমালা ও আন্তঃরাষ্ট্রিক আলোচনায় অবশ্যই স্থানীয় মানুষ এবং মানুষের নিজস্ব হাওর ব্যবস্থাপনা জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করা জরুরি। উন্নয়ন আঘাতের বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বারবার মানুষ দাঁড়ায় যৌথ ও সমস্বরে। যখন হাওর এলাকার ভূমি টংক প্রথার মাধ্যমে, নানকার প্রথার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে দখল করা হচ্ছিল তখনও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলহাওরবাসীর বলপ্রয়োগবিরোধী চৈতন্য। জনগণের হাওরভূমি যখন বারবার কর্পোরেট পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার জোড়ে লিজের মাধ্যমে দখল পাল্টাদখল চলতে থাকে তখনও হাওরবাসী জনতা ভাসান পানি আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ন্যায়বিচারের দাবিতে জলাভূমির প্রান্তিক জনতা বারবার নানান সময়ে নানান রাজনৈতিক বাহাসে বলপ্রয়োগকে প্রশ্ন করে দাঁড়িয়েছেন। সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত ঘেঁষে কুশিয়ারা নদীতে তৈরি করা হয়েছিল সরকারি প্রকল্পের বাঁধ-এর ফলে জকিগঞ্জ থানার বিরশ্রী ইউনিয়নের কিছু কৃষকেরা সেচের জন্য পানি পেলেও বরহল ইউনিয়নের মানুষের জমি প্রতিবছর বন্যায় তলিয়ে যেত। বরাক নদী থেকে নেমে আসা বালি ও পলিতে কৃষিজমিগুলো ভরে যায়। বাধ্য হয়ে বরহল ইউনিয়নের নারী-পুরুষ সর্বনাশা এই বাঁধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। ২৬ জুলাই ১৯৯৩ সালে বরহল ইউনিয়নের হাজার হাজার নারী-পুরুষ প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সীমান্তবর্তী বাঁধ এলাকায়, গ্রামের ২০০০ নারী-পুরুষ বাঁধ কেটে দেয়ার প্রস্তুতি নিলে কোনো ধরনের জানান না-দিয়ে সতর্ক করে, না-

দিয়ে সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশ রাইফেলসের বন্দুক গর্জে ওঠে মানুষের জমায়েতে। কৃষিজমি বসতভিটা সর্বনাশা বাঁধের কবল থেকে বাঁচাতে রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদার বিডিআরের গুলিতে শহীদ হন চারজন গ্রামবাসী, আহত হন প্রায় ৫০-এরও বেশি মানুষ।[৫৫]

প্রতিবেশীর প্রতি জলপ্রবাহের ন্যায়বিচার

হাওরের স্বপ্রতিবেশ এবং জনগণের জীবিকার ন্যায্য অধিকার বিপন্ন হওয়ার জন্য বহুপাক্ষিক পরিবর্তনশীলতার সূচকের পাশাপাশি উজানের পাহাড়ি ভূমির অবক্ষয় ও উন্নয়ন নীতিকৌশলগুলোও সমানভাবে সম্পর্কিত। ভারতীয় এই উন্নয়নকৌশল, পানি ও পরিবেশ সম্পর্কিত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নীতিমালাসমূহও আমাদের পর্যালোচনা করা জরুরি। আমরা এখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিবেশ এবং পানি সম্পর্কিত ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও আইনগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাজির করছি[৫৪] :

Forest (conservation) act (FCA), 1980

এই আইনে আছে বন এলাকায় রাস্তা, বাঁধ নির্মাণ বা খনি প্রকল্পের জন্য এফসিএর অনুমোদন থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে Nodal officer, আঞ্চলিক পর্যায়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে অবস্থিত regional cheif conservator of forest (MoEF) এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে MoEF-এর সেক্রেটারি এইসব অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করেন।

The freedom of information act, 2002

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকেরই তথ্য জানার অধিকার আছে। এই তথ্য যা জনগুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট তা জানার অধিকার সবারই আছে।

The biological diversity act, 2002

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে State biodiversity board, স্থানীয় পর্যায়ে Biodiversity management committee এবং জাতীয় পর্যায়ে National biodiversity authority এই আইনের সাথে সম্পর্কিত।

Wildlife protection act (WLPA), 1972

বন্যপ্রাণী, পাখি, গাছপালা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সংরক্ষণের ভেতর দিয়ে এই আইন রাষ্ট্রের পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত সুরক্ষার দিকটি বিবেচনা করে। স্থানীয় পর্যায়ে Honorary wildlife wardens, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে State board

for wildlife (SBWL) & Chief wildlife warden এবং জাতীয় পর্যায়ে National board for wildlife (NBWL) এই আইনের সাথে সম্পর্কিত ।

Water (control and prevention of pollution) act, 1974

এই আইন জলধারা, স্রোতধারা, আভ্যন্তরীণ পানি, সমুদ্র এবং উপকূলীয় পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কাজ করে। ভারত সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা Pollution control board এই আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট ।

এছাড়াও আন্তঃরাষ্ট্রিক এই সমস্যাকে বোঝার জন্য ভারতের আরো আইন ও নীতিমালা যেমন, Air (control and prevention of pollution) act, 1981; Envioronment (protection) act,1986 ; Environmental Impact Assessment notification, 1994 ; State pollution control board, MoEF, Impact assessment division MoEF regional officer ; National environment appellate authority act, 1997 ; National environment appellate authority (NEAA), NewDelhi সমূহও আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিয়ে আসা জরুরি। জরুরি বাংলাদেশের এই সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালা সমূহ দ্বিরাষ্ট্রিকভাবে বিশ্লেষণ এবং তখনি আমরা বাংলাদেশের হাওর এলাকা এবং উজানের মেঘালয় পাহাড়ের জন্য কোনো আন্তঃরাষ্ট্রিক যৌথ উন্নয়ন উদ্যোগ হাতে নিতে পারি। এটি কখনোই একতরফাভাবে, একপক্ষীয়, একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতি কৌশল দিয়ে স্থায়িত্বশীল হওয়া সম্ভব নয় ।

হাওর সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলো এবং বাংলাদেশের যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা জরুরি

বাংলাদেশের হাওর এলাকার অধিকাংশ অংশ জুড়েই ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্ত , এছাড়াও আসাম, ত্রিপুরার বেশ কিছু সীমান্ত হাওর এলাকাকে প্রভাবিত করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই সীমান্ত পাহাড়ি রাজ্যগুলোর বেশ কিছু আলাদা সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্য ও নীতিকৌশল আছে। বাংলাদেশের হাওর এলাকার সমস্যা সমাধানে উত্তর-পূর্ব রাজ্যকে যুক্ত করলে বাংলাদেশকেও এইসব রাজ্যের সাংবিধানিক কাঠামোকে গুরুত্ব দিতে হবে। আন্তঃরাষ্ট্রিক কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই এইসব রাজ্যের শাসনকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগগুলোকে দ্বিরাষ্ট্রিক উন্নয়ন নীতিমালায় সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।[৫৭]

মেঘালয় রাজ্য (রাজধানী : শিলং)

উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে এই পাহাড়ি রাজ্য থেকেই বাংলাদেশের হাওরে পাহাড়ি ঢল নামে সর্বাধিক। এই রাজ্যের Constitutional provisions :

Articles 244(2) & 275(1)-6th schedule- Garo hills district council (HDC), Khasi HDC, Jaintia HDC. ভারত-বাংলাদেশ কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে (আমরা এখানে বাংলাদেশের হাওরের সম্যার কথা বলছি এবং এর জন্য মেঘালয় রাজ্যের উন্নয়ন কৌশলকে আলোচনায় রেখে চিন্তা করছি) মেঘালয় রাজ্যের Pollution control board, Department of environment, forest department, State biodiversity board (SBB), State board for wildlife (SBWL), Autonomous district councils (Khasi, Garo & Jaintia ADCs), Traditional institution (Syiemships, Doloiships, Nokmaships) এইসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে নিয়ে যৌথ উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

আসাম রাজ্য (রাজধানী : গৌহাটি)

এই রাজ্যের বরাক উপত্যকা থেকেই বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী সুরমার উৎপত্তি। হাওর এলাকার বড় নদীগুলোর উৎস এই রাজ্যেই। এই রাজ্যের Constitutional provisions : Articles 371-B; 224(2) & 275(1)-6th schedule- North Cachar hills district council, Karbi Anglong DC & Bodo territorial council (BTC). ভারত-বাংলাদেশ কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে আসাম রাজ্যের যেসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কাঠামোর সাথে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক বিবেচনায় আনতে হবে: Pollution control board, Department of environment, Forest department, State biodiversity board (SBB), State board for wildlife (SBWL), Local self government at block and village levels (Panchayats), 6th scheduled areas Karbi Anglong ADC, Bodo territorial council (BTC), North Cachar hills ADC and non 6th schedule areas Rabha ADC, Tiwa ADC, Mising ADC, Biodiversity management committees (BMCs), Traditional institution (Mel, namghar, Kebang etc.)

মনিপুর রাজ্য (রাজধানী : ইম্ফল)

বাংলাদেশের সাথে মনিপুরের সরাসরি কোনো সীমান্ত না-থাকলেও মনিপুরের পাহাড়ি এলাকা থেকেও নামে বর্ষার ঢল। আর তাছাড়া বাংলাদেশের সিলেটের জকিগঞ্জ-এর অমলসীদ সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ কি.মি. দূরে বরাক নদীতে মনিপুর সরকার টিপাইমুখ বাঁধ দিচ্ছে। এই বাঁধ সম্পূর্ণত বদলে দিতে পারে হাওর এলাকার প্রতিবেশ ও জনজীবনের ধারা। এই রাজ্য Constitutional provision : Article 371-C এর অন্তর্ভুক্ত। টিপাইমুখ বাঁধসহ আন্তঃরাষ্ট্রিক কোনো যৌথ উদ্যোগে এই রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত

Pollution control board, Department of environment, Forest department, State biodiversity board (SBB), Local self government at block and village levels (Panchayats), Autonomous district councils under Manipur (hill areas) district council act, Biodiversity management committees (BMCs) রাষ্ট্রীয় ও রাজ্য কাঠামোগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ত্রিপুরা রাজ্য (রাজধানী : আগরতলা)

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই রাজ্য Constitutional provisions : Articles 371-G; 224(2) & 275(1)-6th schedule- Tripura tribal district council-এর অন্তর্ভুক্ত। এই রাজ্যের Pollution control board, Department of environment, Forest department, State biodiversity board (SBB), State board for wildlife (SBWL), Local self government at block and village levels (Tripura Panchayats act 1994), Tripura tribal areas autonomous district council, Biodiversity management committees (BMCs),Traditional institution (role not known.) সমূহকেও দ্বিরাষ্ট্রিক কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যৌথ করা জরুরি।

ফালি ফালি করে কাটা ভাটির জল-জীবনীঘটনা : ১ : (নেত্রকোণা, বাংলাদেশ। ভারতীয় সীমান্ত মেঘালয় রাজ্য)[৫৮]

বীরসিঞ্জি ঘাটআলসিয়া ...

বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের পাদদেশে কিমাউ কিনচেং (পাতাল নদী), কিমাউ মাওমাদী (মাহাদেও/মহাদেব নদী) নদীর ধারে ১২টি নং (গ্রাম) এবং সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী ১টি নং(গ্রাম)-এ লেঙামদের মোট পাঁচ হাজার জনগোষ্ঠী বসবাস করছেন। লেঙাম ভাষায় বিল/জলাভূমি এলাকা মানে বীর। নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার ৮নং রংছাতি ইউনিয়নের সন্যাসীপাড়া মৌজার নংসন্যাসী পাড়ার ধারে বীরসিঞ্জি বিল আজ প্রায় নিরুদ্দেশ। এই বীরসিঞ্জি বিলেই আগে লেঙামরা মাছ ধরতেন, খাবার পানিসহ ব্যবহারের পানির এক প্রধান উৎস ছিল এই বীরসিঞ্জি। মেঘালয় থেকে নেমে আসা পরসিঞ্জি ছড়া থেকে উৎপন্ন এই বীরসিঞ্জি বিলে লাইস্যুর ও লাইসার মাছ পাওয়া যেত। আশপাশে নদী ও পাহাড়ি ছড়াগুলো ছিলমহাশোল মাছের আবাসভূমি। পাথর ও কয়লা খনন জলাভূমির স্থানীয় প্রতিবেশ বিপন্ন করায় আজ আর মহাশোল মাছ লেঙাম বসতির আশ পাশের জলাশয়ে দেখা যায় না। ধীরে ধীরে বীরসিঞ্জি বিল ঢেকে যাচ্ছে মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাথুরে বালির তলায়। বর্ষাকালে মেঘালয় পাহাড় থেকে সমানে বালি ও পাথরের নুড়িসহ নামে পাহাড়ি ঢল। বাংলাদেশের কলমাকান্দা সীমান্তের ভারতীয় মেঘালয় পাহাড়ে এখন আর কোনো বনজংগল নেই। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে ভারতীয় মেঘালয়

রাজ্যের গারো পাহাড়ে পাহাড় কেটে করা হয়েছে রাস্তাঘাট। স্থানীয় লেঙামরা জানান এইসব অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলেই মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় থেকে পাহাড়ি ঢলের পাহাড় ক্ষয়ের বালিমিশ্রিত পানি এলাকায় নামে এবং বীরসিঞ্জির মতো যত বিল ও কৃষিজমি আছে তা ভরাট করে ফেলছে। বয়েসী লেঙাম নারীরা বলেন, বীরসিঞ্জি ঘাটআলসিয়া (বীরসিঞ্জি বিল মরে যাচ্ছে ...)। কিমাউ মাওমাদী (মাহাদেও/ মহাদেব নদী) মেঘালয় রাজ্যের দক্ষিণ গারো পাহাড়ের বাগমারা হেডকোয়ার্টারের কাছ দিয়ে বাঘমারা পাহাড়ি এলাকা থেকে নেত্রকোণার কলমাকান্দার বরুয়াকোণার সীমান্তবর্তী লেঙাম গ্রামের রংচকমাই (দাগ নং ৪০০) পাহাড় ঘেঁষে এই নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নংসন্যাসীপাড়া গ্রামের মংওয়াই নংউড়া (৮০), লাংবাও নাফাক (৮৬), জুলিয়ানা নংউড়া (৫০) জানালেন, একটা সময় এই কিমাউ মাওমাদী নদীতে কড়ি পাওয়া যেত। লেঙাম নারীরা এই কড়ি সংগ্রহ করতেন। নংসন্যাসীপাড়া গ্রামের বড়শিং নংমিন এবং রনজিনা নংউড়া ছিলেন বড় কড়ি সংগ্রাহক। এই কড়ি বাগমারা থেকে কলকাতায় চলে যেত। লেঙামরা এই কড়ি দিয়ে খেপ্পেং (এক ধরনের গলার মালা) বানাতেন। এখন আর সেই আগের নদী নাই। গারো পাহাড় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি বালি ও নুড়িপাথরে ঢাকা পড়েছে এককালের পাহাড়ি নদী কিমাউ মাওমাদী। গারো পাহাড়ে অত্যধিক কয়লা ও পাথর তোলার জন্য পাহাড় খুঁড়তে হয়, ফলে বর্ষাকালে পাহাড় ভেঙে বালি পাথরসহ পানি নামে সীমান্তের পাদদেশে লেঙাম বসতিতে। এভাবেই আজ গারো পাহাড়েরর বালিতে ঢাকা পড়েছে লেঙাম গ্রামের এককালের স্রোতস্বিনী নদী, যে নদীর জল টাঙ্গুয়ার হাওর অবধি পৌঁছাত।

ঘটনা : ২ : (সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ। ভারতীয় সীমান্ত মেঘালয় রাজ্য)[৫৭]

মেঘালয় পাহাড়ের মরা বালিতে আটকে গেছে নজিমউদ্দীনের গেরস্থির স্বপ্ন ...

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে টাঙ্গুয়ার, চুনখলা ও সংসার হাওরে সীমান্তবর্তী মেঘালয় পাহাড় থেকেই আসে বর্ষার পাহাড়ি ঢল। মেঘালয় পাহাড় থেকে লালঘাটছড়া, বুরুঙ্গাছড়া, টেকেরঘাটছড়া, লাকমাছড়া, চারাগাঁওছড়া, কলাগাঁওছড়া, জংগলবাড়িছড়া, লামাকাটাছড়া, বাগলিছড়া ও রংরুছড়া দিয়ে পানি নামে সংসার হাওরে। সংসার হাওরের ধারেই উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়নের বাঁশতলা গ্রামে মো. নজিমউদ্দিনের(৪৭) বাড়ি। উত্তরাধিকারসূত্রে তার মোট জমির পরিমাণ ১২ কেয়ার। এই জমিতেই বোরো ধান, আলু, বাদাম চাষ করে বেশ ভালোই চলছিল তার গেরস্থি জীবন। পাঁচ-ছয় বছর হয় মেঘালয় পাহাড়ের ঢল বালুসহ নামে তাদের এলাকায়। চৈত্র-বৈশাখে ঢল নামা শুরু হয় পানি ছয় মাস থাকে। পানি সরে গেলে দেখা যায় জমি ভরে গেছে পাহাড়ি বালুতে। এভাবে পাঁচ-ছয় বছরে তার প্রায় ৫ কেয়ার জমি পাহাড়ি বালুতে নষ্ট হয়ে গেছে। বালুমাটিতে কোনো গেরস্থি করা যায় না, তাই বাধ্য হয়ে তাকে ভারতীয় এলাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কড়া নজরদারিকে ফাঁকি দিয়ে কয়লা ও পাথর খনিতে

কাজ করতে যেতে হয়। নজিমুদ্দিন জানালেন, নষ্ট হয়ে যাওয়া এইসব হাওরের জমির মূল্য ছিল কেয়ার প্রতি প্রায় ২০,০০০ টাকা। কিন্তু দুই থেকে আড়াই ফুট বালির স্তর পড়াতে এইসব জমি কেউ কিনতে চায় না। লাকমা গ্রামের মো. আবদুর রহিম (৪০), লালঘাট গ্রামের মো. আলী (৪৫) যারা এককালে কৃষক ছিলেন আজ ভারতীয় পাহাড়ের পাথর কোয়ারির মজুর জানালেন, মাগনা দিলেও আমরা এই মরা বালু যারে ইচ্ছা তারে দিমু, এই মরা বালু কোনো কাজে লাগে না। এই কাজ রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ হলেও তার মতো গ্রামের এককালের সম্পন্ন অনেক কৃষকই আজ পাহাড়ি ঢলে বারবার ফসল ঘরে তুলতে না-পেরে, পাহাড়ি বালুতে জমি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে জীবনের সব ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেন। হাওর এলাকায় কৃষিপ্রতিবেশ বদলে যাওয়ায় কেবলমাত্র জীবিকার সন্ধানে দিনরাত পাহাড়ে পাহাড়ে আজ নজিমউদ্দিনের মতো কৃষকেরা পাথর আর কয়লাখনির মজুর হয়েছেন। যারা ভোররাত থাকতেই বাংলাদেশ ছেড়ে যান বিডিআরের বন্দুক ফাঁকি দিয়ে আর গভীর রাতে ভারত থেকে বাড়ি ফিরেন বিএসএফ-এর বন্দুক ফাঁকি দিয়ে।

ঘটনা : ৩ : (সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ। ভারতীয় সীমান্ত মেঘালয় রাজ্য)[৬০]

তিন কুইন্নে আর নি বাওয়ামারা যাব ...

তিন কুইন্নে আর নি বাওয়ামারা যাব
চেংরাচেংরি হুবাই আজি পলক জাখা নিব
ও আজি পলক জাখা নিব..
ও আজি জাল জলপি আতর খইলা
হাতে কাখে নিব
হুবাই লকন মিরলে মসুন বাওয়া মারা যাব ।

(সীমা রানী হাজং, অর্চনা দেবী হাজং, শিলাদেবী হাজং, রঞ্জিতা দেবী হাজং, নীলিমা দেবী হাজং, ছলনা দেবী হাজং, গ্রাম-ঘিলাগড়া হাজং গ্রাম, ধরমপাশা, সুনামগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।)

হাজং ভাষায় টাঙ্গুয়ার হাওরকে তিন কুইন্নে আর বলে। স্থানীয় হাজংদের ভূবিদ্যা অনুযায়ী টাঙ্গুয়ার হাওর একটি তিনকোণা হাওর। এর একটি কোণ উত্তরে, একটি পুবে ও একটি পশ্চিমে। আরেকদিকে মেঘালয় পাহাড়। হাজং নারীরা স্থানীয় টাঙ্গুয়ার হাওরে জাখা মারতে (দল বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়া) যান এবং এটি একটি জাখামারার গান। এখানে টাঙ্গুয়ার হাওরে বাওয়ামারা (জাল-জুলপি-জাখা নিয়ে দল বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়া) করতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের আদিবাসিন্দা হাজং জনগোষ্ঠী আজ আর এই হাওরভূমির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী নন। নানকারপ্রথা,

টংকপ্রথা, ১৯৪৭ দেশভাগ, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্তঃরাষ্ট্রিক রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো হাজংদের আপন বসতভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে। এছাড়াও টাঙ্গুয়ার হাওরের অনেক বিল-জলা আজ আর আগের মতো নেই। ভরাট হয়ে গেছে পাহাড়ি বালি ও পাহাড়ি ঢলের পলিতে। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এমন দলাগুলো যেমন, লক্ষ্মীপুর দলা, তারাবাড়ি দলা, গহীন দলা এসবই ছিল হাজংদের কৃষিজমিন। এককালের সম্পন্ন হাজং কৃষক গহীন অধিকারীর নামে গহীনের দলা নাম হয়, এখন এই দলা বহিরাগত বাঙালি মুসলমানেরা দখল করে নিয়েছে।

ঘটনা : ৪ : (সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ। ভারতীয় সীমান্ত মেঘালয় রাজ্য)[৬১]
পচাশোল হাওর উধাও!

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নে পচাশোল নামে এক হাওর ছিল এককালে। আশেপাশের চানপুর, রজনীনাই, আমতলা, হলহলিয়া, পুরানঘাট, শান্তিপুর, বড়ছড়া, মারাম গ্রামগুলোর ৩-৪ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে এককালে সীমান্ত এলাকার এক বিশাল হাওর ছিল এই হাওর পচাশোল। এই হাওরে মেঘালয় পাহাড় থেকে ভোলাঠাক্কর নধী, কড়ইগড়া ছড়া, ভুরঙ্গাছড়া নদী, বড়ছড়া নদী নেমে এসেছিল। মেঘালয়ের খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে ৩২ কি.মি. দীর্ঘ যাদুকাটা নদী বিশ্বম্ভরপুরের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। যাদুকাটা নদীর একটি শাখা লাউড়ের গড় টিলার কাছে মাহারাম নদী হয়ে পচাশোল হাওরে প্রবেশ করেছে। এই মাহারাম নদী ১০ কি.মি. দীর্ঘ পথে খাইমারা খালের মাধ্যমে পাটনাই নদীতে মিশেছে। খাইমারাও পচাশোলের একটি খাল ছিল। খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে পাহাড়ি ঢলের পানি বালুসহ খাইমারা খাল দিয়ে পচাশোল হাওরে পড়তে পড়তে এই হাওর পাহাড়ি বালিতে ভরাট হয়ে উঠে। ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সমস্যা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর পুরো পচাশোল হাওর পাহাড়ি বালিতে ভরে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানালেন, যাদুকাটা নদী থেকে পাহাড়ি বালি নিয়ে পাহাড়ি ঢল পচাশোলে ঢুকে বারিকেরটিলার পাশ দিয়ে। যদি ঐখানে বান দেয়া যেত তবে পচাশোল হাওরকে পাহাড়ি বালির হাত থেকে রক্ষা করা যেত। রক্ষা করা যেত পচাশোল হাওরের কৃষিজমি। পুরানঘাট গ্রামের মো. নিজামউদ্দীন ও তমিজউদ্দীনদের প্রায় ৫০-৬০ হাল জমি এই পচাশোল হাওরে বালুতে নষ্ট হয়। হলহলিয়া গ্রামের বাঘশিকারী আবদুস সোবহানদের প্রায় ১০ হাল জমি নষ্ট হয়। এই হাওরে রাজাই গ্রামের মান্দিদের জমি ছিল। যখন পাহাড়ি বালুতে জমি চর পড়ে তখন শান্তিপুর গ্রামের দিকের জমি নিয়ে মান্দিদের সাথে বাঙালিদের বিবাদ হয়। কারণ বাঙালিরা এই জমিতে বালু পড়ায় নিজেরা দখল নিতে চেয়েছিল। এভাবে পাহাড়ি বালুতে নষ্ট হওয়ায় স্থানীয় মান্দি আদিবাসীদের অনেক জমি অন্যরা দখল করে নিয়ে নেয়। এছাড়াও মেঘালয় পাহাড় থেকে নেমে আসা রজনিলাইন ছড়া এবং বুরুঙ্গাছড়ার বালিতে ঢেকে গেছে তাহিরপুর

সীমান্তের একরের পর একর কৃষিজমি। জমিহারা মানুষের অভিজ্ঞতা যে, ভারতীয় এলাকায় কোনো নিয়মনীতি ছাড়া উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ফলে এই পাহাড়ি বালির ধস নামছে এবং পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে হাওর এলাকার কৃষিপ্রতিবেশ।

ঘটনা : ৫ : (হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ। ভারতীয় সীমান্ত ত্রিপুরা রাজ্য)[৬২]
ভারতীয় রাবার বাগানের বিষে মুমূর্ষু কোরাঙ্গী ...

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী বর্ষারণ্য কালেঙ্গা অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি নদী কোরাঙ্গী। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই নদীর নাম করাংগী (আইডি নং ৩৭) এবং এর উৎপত্তিস্থল বাহুবল উপজেলার পাহাড়ি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করলেও কোরাঙ্গী নদী পাড়ের মানুষেরা জানালেন ভিন্ন কথা। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলার কালাপাহাড় এক জংগল পাহাড়ি এলাকা। কোরাঙ্গী নদী কালাপাহাড়ের লোঙ্গা (পাহাড়ি গুহা) থেকে উৎপন্ন হয়ে চাইরঘরিয়ার উত্তর এবং গঙসিং বাড়ির লালটিলার দক্ষিণ বরাবর প্রবাহিত হয়ে ১৫-২০ কি.মি. দূরে বাংলাদেশের কালেঙ্গা বনের ডেবরাবাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ডেবরাবাড়ি থেকে তোতারামবাড়ি হয়ে ঘিলাঘাট হয়ে ছনবাড়ি বিট হয়ে কালেঙ্গা বিটের ভেতর দিয়ে কোরাঙ্গী নদী বাহুবল উপজেলার পুঁটিজুড়ি হয়ে ঘুইঙ্গাজুরী হাওরে গিয়ে পড়েছে। ঘুইঙ্গাজুরী হাওর থেকে বালিখালে পানি যায়, বালিখাল গিয়ে মেঘনাতে মিশেছে। মেঘনা বঙ্গোপসাগরে। এভাবেই একটি নদী উজানের পাহাড়ি ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভাটিতে সমুদ্রের দিকে যায়। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এই নদীতে কাইল্ল্যারা, বোয়াল, বড়পুঁটি, লাসো মাছ পাওয়া যেত। ঘাঘট, গাঙগুতুম, ভেদা, পাইক্যা, কালিশুনি, রানী, বাইল্যা, খইয়া, টেংরা মাছ পাওয়া যেত। এখন এইসব মাছ একেবারেই পাওয়া যায় না। পুঁটি, চিংড়ি, লাটি এবং মাঝে মধ্যে শিং-মাগুর মাছ পাওয়া যায়। কোরাঙ্গীতে বারোমাসই পানি কিছু না-কিছু থাকে। বৈশাখ মাস থেকে পানি বাড়া শুরু হয়, বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত পানি থাকে। আষাঢ় মাসে পানির স্রোত ও গভীরতা বেশি থাকে। পাহাড়ি ঢলের পানি কখনো কখনো মাথার উপর দিয়ে যায়, এই পানি দুই-তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কোরাঙ্গী নদীর উপরে যে কাঠের ব্রিজ করা হয়েছে সেখানে কোরাঙ্গী লক্ষীয়াছড়া ও কোরাঙ্গী দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বর্তমানে কোরাঙ্গী নদী দিয়ে পাহাড়ি ঢলের পানি খাইল্ল্যা, চাতলা, রাজাখোলা, মাইট্ট্যাজুড়ি, সিরাজনগর, চকরামপুর পর্যন্ত ৮০টি গ্রামের আমন ও আউশের ক্ষেত নষ্ট করে। বৈশাখ থেকে আষাঢ় এবং কার্তিক থেকে আশ্বিন মাসে এই ক্ষতি হয়। ১৯৯১ সালে একদিন দুপুরের দিকে কোরাঙ্গী নদীর সব মাছ-সাপ-ব্যাঙ-কুইচ্চ্যা মরে ভেসে ওঠে। হাইল ও ঘুইঙ্গাজুড়ির মাছও উজানের স্রোতে এসে মারা যায়। খাইল্ল্যা গ্রামের আবদুল হক কালেঙ্গা বিটের ফরেস্ট ভিলেজার আবদুল গণি এবং ছণবাড়ি বিটের ডেবরাবাড়ি ত্রিপুরা কামি (গ্রাম)র মুক্তা চন্দ্র দেববর্মার বিরুদ্ধে মামলা করেন ইউনিয়ন পরিষদের

অফিসে। তার দাবি ছিল এরা কোরাঙ্গী নদীতে বিষ দিয়ে মাছ মেরেছে। কিন্তু এই মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় এলাকায় রাবার বাগানে বিষ দেয়ায় তা কোরাঙ্গী নদীর জলে মিশে মাছ মারা যাচ্ছে। কিন্তু মামলা চালাতে দরিদ্র কোরাঙ্গী পাড়ের বনবাসী ফরেস্ট ভিলেজারদের শেষ সম্বলটুকুও ছাড়তে হয়। কালেঙ্গা বনের সীমান্ত ঘেঁষে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলা। এখানেই সীমান্তবর্তী এলাকায় বন কেটে ভারত সরকার চাইরঘরিয়া, লালটিলা, তুলসীবাড়ি, কচুবাড়ি, গঙসিংবাড়ি, নতুনকলোনী, বেলারামবাড়ি, চামবস্তি, বনবাজার, চইতেরামবাড়ি এলাকায় রাবার বাগান করেছে। আর এই রাবার বাগানগুলোতে ব্যবহৃত হয় নানান ধরনের কর্পোরেট বিষ। স্থানীয়রা জানান জার্মানির বিএএসএফ কোম্পানির বিএএসএফ পাউডার বেশি ব্যবহৃত হয় ভারতীয় রাবার বাগানে। আর এইসব বিষ কোরাঙ্গী নদী ও লক্ষীয়াছড়া দিয়ে কোরাঙ্গী নদীতে আসে, ধীরে ধীরে এই বিষ হাওর থেকে নদী, নদী থেকে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আশেপাশের চাবাগানগুলোতেও বিপদজনক হারে ব্যবহৃত হয় থাইডিয়েন, রাউণ্ডআপ, এনড্রিন বিষ। কালেঙ্গা বনের অধিবাসীরা জানান, এইসব বিষ এত ভয়াবহ যে মাটির তিন হাত নিচের কুইচ্চ্যাও টেনে বের করে আনে। কালেঙ্গা বনের বাঙালি, ত্রিপুরী, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, খাড়িয়া পরিবারগুলোর একমাত্র জলের উৎস কোরাঙ্গী আজ বিষে বিষে অনেকটাই বেহুঁশ। কোরাঙ্গীতে বনের ভেতর পাহাড়ি স্রোত থাকায় এর বিষের প্রকোপ এখানে সরাসরি না-দেখা গেলেও হাওর এলাকায় এর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই ধরা পড়ে। এই অভিজ্ঞতাগুলো ছাড়াও হাওর এলাকার সীমান্তবর্তী মানুষদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে নানান সময়ে হেনস্থা হতে হয়। পাহাড়ি ঢল থেকে জমির ফসল রক্ষা করার জন্য সীমান্ত এলাকায় মাটির আইল দিতে গেলে বা কোনো বান কাটতে গেলে বিএসএফ গুলি করে। এভাবে হাওর এলাকার অনেক কৃষক জীবন দিয়েছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বন্দুকের গুলিতে। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের খাসিয়ামরা নদীর বাংলাদেশে প্রবেশের পথে ভারত কৃত্রিম বেড়া এবং পাথর ফেলে বান দিয়েছে যার ফলে পাহাড়ি ঢলের সাথে বালি এসে মুহূর্তে দোয়ারাবাজার এলাকায় অকাল বন্যা তৈরি হয়।[৬৩] মেঘালয় পাহাড়ের নানান জায়গায় পাহাড় কেটে রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলে বাংলাদেশের হাওরে জমে বালির ধস। মেঘালয় পাহাড়ের বৃক্ষশূন্যতা এবং প্রাকৃতিক বনউজাড়ও চলতি সময়ের পাহাড়ি ঢলের কারণ। উজানের পাহাড় থেকে আগে বর্ষার পানি প্রাকৃতিক বনের ভেতর দিয়ে এক প্রাকৃতিক ছাঁকন পদ্ধতিতে ভাটির দিকে ধীরে ধীরে নেমে আসত। উজানের পাহাড়ে ঝোপ জংগল এই বৃষ্টির পানি ধরে রাখত। কিন্তু উজানের পাহাড়ে প্রাকৃতিক বনভূমির হ্রাসে বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই চলতি সময়ে ভাটিতে পাহাড়ি ঢল হিসেবে নামে। উজানের পাহাড়ে প্রাকৃতিক বনভূমি থাকা কেবলমাত্র ভাটির বাংলাদেশের জন্যই প্রতিবেশ-উপযোগী নয় তা ভারতের প্রতিবেশের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। হাওর এলাকায় আজকের দুর্যোগের জন্য হাওরবাসীরা উজানের পাহাড়ে মাত্রাতিরিক্ত কয়লা

ও পাথর উত্তোলনকে দায়ী করেছেন। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে এভাবে কয়লা ও পাথর উত্তোলন কেবলমাত্র পরিবেশের জন্যই ক্ষতিকর নয় তা কয়লা ও পাথরখনিতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্যও সমান ঝুঁকিপূর্ণ। মেঘালয় পাহাড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকেরা পাথুরে পাহাড় খুঁড়ে কয়লা বের করে আনে। এইসব কয়লার কোয়ারিতে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া দরিদ্র দিনমজুর কৃষিহারা হাওরপাড়ের মানুষের সংখ্যাই বেশি। কয়লার জন্য পাহাড়ের পর পাহাড় নানান ঢঙের সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়। কয়লা তুলতে তুলতে অনেক পাহাড় ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে যায়। বর্ষার পানির ঢলে বা ঝড় হলে ধসে যায় আর এই পাহাড়ভাঙা বালির ধস নামে বাংলাদেশের হাওরে। বর্ষার পানিতে পাহাড়ের কয়লা ও পাথর খোঁড়ার গর্তে পানি জমে বিশ্রি পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এমনিতেই এই এলাকা ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা তার ওপর পাহাড়ি কয়লার গর্তে পানি জমে মশার বংশবিস্তার আরো বাড়িয়ে তুলে। কয়লা ও পাথর উত্তোলনের ফলে এলাকায় ম্যালেরিয়াসহ নানান জ্বর ও অসুখের মাত্রাও অনেক বেড়ে গেছে। আর ঐসব কয়লা পাহাড়ের গর্তে কত-যে শ্রমিকের জান শেষ হয়, লাশ চাপা পড়ে তার খবর কেউ শেষ পর্যন্ত জানতেও পারে না। উজানের পাহাড়ে বসতি ও নানান অবকাঠামোগত নির্মাণও ভাটির বাংলাদেশের বদলে যাওয়াকে প্রভাবিত করছে। উজানের পাহাড়ে বাণিজ্যিক একক ফসল চাষ, বাণিজ্যিক বাগান এবং চা-বাগানও বাংলাদেশের হাওর প্রতিবেশকে প্রভাবিত করে। এইসব বাণিজ্যিক বাগান ও চা-বাগানে ব্যবহৃত কর্পোরেট বিষের তলানি জমা হয় উজান থেকে ভাটির বাংলাদেশের হাওর এলাকায়। বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অসম চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসেবে বাংলাদেশে এবং ভারতকে আন্তঃরাষ্ট্রিক কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিগুলোকে বিবেচনায় রেখে এলডিসির স্বার্থ রক্ষা করে কোনো যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং সার্বজনীন মানবাধিকারের সনদ উভয়েই স্বাক্ষর করেছে। উভয়েই আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (সিবিডি: ১৯৯২) স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এইসব আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণাসমূহকে দ্বিরাষ্ট্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচনা করা জরুরি। আন্তঃরাষ্ট্রিকভাবে কোনো দেশেরই অভিন্ন জলধারা ব্যবহার বা কোনো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া উচিত হবে না যা কোনো না-কোনো দেশের প্রতিবেশ এবং জনজীবনে দুর্ভোগ তৈরি করে। যেসব বিষয়ে দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক জড়িত সেইসব যৌথ পরিকল্পনায় দুই দেশের জনগণের সমান পূর্ব সমর্থন, সম্মতি ও অংশগ্রহণ জরুরি।

দুনিয়ার ২০০টির বেশি নদী অববাহিকা দুনিয়ার মোট ভূমির পঞ্চাশ ভাগ। এইসব প্রতিটি অববাহিকাই ভৌগোলিকভাবে দুই তিনটি রাষ্ট্রের অধীন এবং যেখানে দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ ভাগ মানুষের বসতি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, নীল, নাইজার, কঙ্গো, জাম্বেসি, দানিয়ুব, রাইন, টাইগ্রিস, মেকং, পারানা-প্যারাগুয়ে

আন্তর্জাতিক নদীসমূহের রয়েছে বৃহত্তম অববাহিকা। এইসব আন্তর্জাতিক বৃহত্তম নদী অববাহিকার জন্য কোনো সমতাকেন্দ্রিক, বিশ্বস্ত, সর্বোপযোগী কোনো উন্নয়ন উদ্যোগ ও যৌথ নীতিপরিকল্পনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নদীর উৎসমুখের কাছাকাছি উজানের রাষ্ট্রসমূহ থেকে পানি অধিকারের জায়গায় বঞ্চিত থেকে যায় একই আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার ভাটির দিকের রাষ্ট্রগুলো।[৬৪] হাওর রক্ষায় ভারত-বাংলাদেশ কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রেও দুটি দেশের সমঅধিকারের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনায় রাখা একটি 'জটিল' ব্যাপার। কিন্তু এই 'জটিল' ব্যাপারটিকে দ্বিরাষ্ট্রিক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ভেতর দিয়ে বিবেচনা না-করে দুটি দেশের প্রাণ ও প্রকৃতির সর্বস্বান্ত হওয়া ও অধিকারের জায়গা থেকে ভাবা দরকার। আর এই ভাবনার জায়গায় ভারত-বাংলাদেশ দুটি দেশ তার অন্যান্য বাণিজ্য, কূটনীতিক ও কৌশগত সম্পর্ককে বাদ রেখে সমউদ্যোগী হলে উভয় দেশের জন্যই কোনো আন্তঃরাষ্ট্রিক সমঅধিকারভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। আর বিশাল ভারত রাষ্ট্রে এই সম্ভাবনা শুরু হতে পারে উত্তর-পূর্ব রাজ্য থেকেই।

১৯২৭ সালে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার রণকেলী গ্রামের আবদুর হামিদ চৌধুরী(সোনা মিয়া) ১৯২২ সালে গোলাপগঞ্জ থানার মাইঝভাগ গ্রামে মগফুর আলীর বাড়িতে সংঘটিত ছিন্ন কোরান মামলার আসামি দারোগার শাস্তি সম্পর্কে জানতে চেয়ে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করেন। জবাবে পরিষদের জুডিশিয়াল মেম্বার বলেন, বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলে এর উত্তর দেয়ার বিধান আইনে নাই। তখন সিলেটের সব সদস্য রুখে দাঁড়ান। তারা দাবি জানান মাতৃভাষায় কথা বলা মানুষের জন্মগত অধিকার। সরকার ১৯২৭ সালে বাংলা ভাষাকে পরিষদের ভাষা হিসেবে যুক্ত করেন[৬৫]। বাংলাদেশের ভাটির মানুষও স্বপ্ন দেখেন যে আসাম প্রাদেশিক সরকার জনগণের মাতৃভাষার অধিকারের জায়গাটিকে বুঝতে পেরেছিল আজ প্রাণ ও প্রকৃতি বিনাশের যাতনাও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেই রাজ্য সরকারের মাধ্যমে শুরু হতে পারে। নিশ্চয়ই রাজ্যসরকারের যুক্তিগুলো কেন্দ্রীয় সরকারও সমানভাবেই বিবেচনা করবেন। নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকারও হাওরবাসী প্রান্তজনের আহাজারির দিকে রাষ্ট্রীয় মনোযোগ আরো প্রসারিত করবে এবং ভারত-বাংলাদেশে একটি ইতিবাচক দ্বিরাষ্ট্রিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণের জন্য উজানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কাছে জনগণের দাবি তুলে ধরবে। বাংলাদেশের হাওরবাসী জনগণের আশা অবশ্যই উজানের পাহাড় থেকে আর নেমে আসবে না কোনো দুর্ভোগ ও দুর্যোগ। ৭০০০ কি.মি. দীর্ঘ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নিল তিন মিলিয়ন বর্গ কি.মি. অববাহিকা তৈরি করেছে, যেখানে ১৫০ মিলিয়ন মানুষের বাস। বুরুন্ডি, কঙ্গো, মিশর, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা, সুদান, তানজানিয়া, উগান্ডার মত দশটি রাষ্ট্র এই নদীর পানি ব্যবহার করে আর নিল এই দশটি দেশের ভেতর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে।[৬৬] আর আমাদের বিষয় কেবল মাত্র দুটি রাষ্ট্রের। উভয়দেশেরই আন্তঃরাষ্ট্রিক উন্নয়ন আঘাতগুলোকে জনগণের অভিজ্ঞতার

জায়গা থেকে পাঠ করা জরুরি। আমরা হাওর-কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় দ্বিপক্ষীয় কোনো উন্নয়ননীতির জন্য এখনি সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে উভয় রাষ্ট্রকে আহবান জানাই। জনগণ বারবার আন্তঃরাষ্ট্রিক উন্নয়ন আঘাতের ফলে তার আপন প্রাণ ও প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন হতে পারে না, জনগণ সম্মিলিত দ্রোহে এই বিচ্ছিন্নকরণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সমুন্নত রেখেছে তার দ্বিরাষ্ট্রিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় রাষ্ট্রকেই এই বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গাটির সাথে নিজেদের কাঠামোগত সম্পর্ককে যৌথভাবে সম্মিলিত করতে হবে। সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য, পণ্য আমদানি রপ্তানি, স্থলবন্দর-এর পণ্য প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়গুলোকেও দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় আনতে হবে। বাণিজ্য সম্পর্কিত কোনো রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইন যা উত্তর-পূর্ব ভারতীয় এলাকা এবং বাংলাদেশের হাওর এলাকার জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করে সেসব বিষয়কেও সমান প্রাধান্য দিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রিক বিবেচনায় আনা জরুরি। ১৩৩৬ বাংলায় (১৯২৯) আসামে ভীষণ বন্যা হয়। এই বন্যাকে সিলেটে বড়পানি ও ধলাপানি বলে। এই বন্যা একমাসেরও বেশি সময় স্থায়ী ছিল। এই বন্যার ভেতর দিয়েই হাওরবাসী কচুরিপানার সাথে পরিচিত হয়। জানা যায়, এক জার্মান নারী দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এই কচুরিপানা নিয়ে আসেন তার স্বামীর কর্মস্থল মনিপুর এলাকায়। মনিপুরের ইম্ফলের কাছে লোগতাক লেকে এই্ কচুরিপানা চাষ করা হয়। ১৯২৯ সালে মনিপুরের লোগতাক লেকের বাঁধ ভেঙে যায় এবং পাহাড়ি বন্যা ও ঢলের সাথে এই কচুরিপানা বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা নদী দিয়ে হাওরাঞ্চলে ঢুকে এবং কিছুদিনের ভেতর দেশব্যাপী ছড়িয়ে যায় (৫১-৫২)।[৬৭] ভারত-বাংলাদেশের উজানে টিপাইমুখ বাঁধের মাধ্যমে যে নয়া উন্নয়ন আঘাত তৈরি করছে তার বিরুদ্ধে এক হয়েছে ভারত-বাংলাদেশের জনগণ। ভাটির দেশ হিসেবে আমরা আমাদের বিল-জলাশয়গুলো কচুরিপানার মাধ্যমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কথা জানি। অনেক বিল এলাকায় এর ফলে কমে গেছে মাছের প্রজনন ও বৈচিত্র্য, অনেক এলাকায় কৃষিজমিতে ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে গেছে, হাওর এলাকার কৃষিজমির অনেকটাই দখল করে নেয় এই জলজ উদ্ভিদ, কচুরিপানার মাধ্যমে জলধারার স্বপ্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য ও স্রোতধারা বদলে যায়। হাওর এলাকার জনগণ চান না এমন কোনো উন্নয়ন উদ্যোগ উজানের রাষ্ট্রে হোক যার ভোগান্তি পোহাতে হয় ভাটির মানুষদের। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বা টিপাইমুখ বাঁধের মতো উন্নয়ন খবরদারিগুলো ভাটির জনপদে আবারো বয়ে আনবে নয়া দুর্ভোগ। উজানের পুরুষতান্ত্রিক এইসব প্রকল্পের ফলে প্রান্তিক হাওর জলাভূমি নারীর মতো বিপন্ন হবে নিরন্তর। আন্তঃরাষ্ট্রিক বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্তসমূহকে নারীর প্রতিরোধী চৈতন্য দিয়েই প্রশ্ন করে দাঁড়াবে উজান-ভাটির জনগণ অচিরেই, একত্রে।

তথ্যসূত্র

১. *Floodplains or Flood Plans?*, R.Adnan Hughes and B. Dalal-Clayton, International Institute for Environment and development (London) and Research & Advisory services, Dhaka, 1994, p5

২. *বাংলাদেশের নদ-নদী*, সম্পাদনা ও প্রকাশনা : মো. শওকত আলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ,   পানিবিজ্ঞান জুন ২০০৬

৩. প্রাগুক্ত

৪. *হাওর উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, ঢাকা, বাংলাদেশ, বিভাগীয় সম্মেলন ২০০৬ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, পৃ.৪-৫

৫. সুনামগঞ্জের নদীতে এখন আর আগের মতো পানি থাকে না (সাজু পুরকায়স্থ, *ইত্তেফাক*, ৩১/৮/০৬)

৬. *বাংলাদেশের নদ নদী*, শিপন রহমান, হাতেখড়ি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

৭. প্রাগুক্ত

৮. জুড়ী নদী ভরাট : বোরো চাষ ব্যাহত হওয়ার আশংকা (সংবাদদাতা, জুড়ী, *সংবাদ*, ৩১/১/০৬)

৯. Sylhet rivers drying up : Surma, Kushiyara, Khowai and Monu turn into narrow streams (Iqbal Siddiquee, *Daily Star*, 27/3/06)

১০. জুড়ী নদী ভরাট : বোরো চাষ ব্যাহত হওয়ার আশংকা (সংবাদদাতা, জুড়ী, *সংবাদ*, ৩১/১/০৬)

১১. নাব্যতা হারিয়েছে সুনামগঞ্জের সব নদী ফসলি জমিতে পড়েছে বালির স্তর : ওপারের নদীতে বাঁধ আর পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ (সাজু পুরকায়স্থ, *ইত্তেফাক*, ২০/২/০৬)

১২. *হাওর: জলে ভাসা জনপদ*, মুজিব মেহদী, আইইডি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৫৫-৫৬

১৩. Impact of flood control projects in Bangladesh, Mohammad Rezaur Rahman & Jahir Uddin Chowdhury, p 55-65, in *Bangladesh floods : Views from home and abroad*, Edited by- Mir M. Ali, M. Mozzammel Hoque, Rezaur Rahman, Salim Rashid, UPL, Bangladesh, 1998

১৪. Floods disaster management in deltaic plain integrated with rural development, M. Shahjahan, p39-53 in *Bangladesh floods : Views from home and abroad*, Edited by- Mir M. Ali, M. Mozzammel Hoque, Rezaur Rahman, Salim Rashid, UPL, Bangladesh, 1998

১৫. নদ-নদী এবং বন্যা, জ্যোতির্ময় বসু, পাক্ষিক *চিন্তা:* ২১-২২, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬-৩৯

১৬. প্রাগুক্ত
১৭. Floods disaster management in deltaic plain integrated with rural development, M. Shahjahan, p39-53 in *Bangladesh floods : Views from home and abroad*, Edited by- Mir M. Ali, M. Mozzammel Hoque, Rezaur Rahman, Salim Rashid, UPL, Bangladesh, 1998
১৮. *Bangladesh : Reflections on the water*, James J. Novak, UPL, Bangladesh,1993, p-31
১৯. সিলেটের হাওরাঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে সংশয় (হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, *ইত্তেফাক*, ২৬/১/০৬)
২০. প্রাগুক্ত
২১. মরে যাচ্ছে নদী (প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, *সংবাদ*, ১১/৩/০৬)
২২. দিরাই-শাল্লার হাওর নদীতে চর : চাষাবাদ চলছে (শেখ কবির আহমেদ, *যুগান্তর*, ১৭/১/০৬)
২৩. ভাটি অঞ্চলের নদীনালা খাল-বিল ভরাট হওয়ায় নৌ-যোগাযোগ ব্যাহত (দিরাই সংবাদদাতা, *ইত্তেফাক*, ২৭/১/০৬)
২৪. সোমেশ্বরীর নদীতে পাঁচ গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ বিলীন (প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, *সংবাদ*, ২৪/৯/০৬)
২৫. মরে যাচ্ছে নদী (প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, *সংবাদ*, ১১/৩/০৬)
২৬. Existing embankments, Monowar Hossain, p53-76, in : *Rivers of life : Bangladeshi journalists take a critical look at the flood action plan*, Editor—Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994
২৭. বাংলাদেশ : গঙ্গা হুমকির মুখোমুখি, মোস্তফা কামাল মজুমদার, পৃ. ২৯-৬১ । এটি নেয়া হয়েছে, *গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা* নামক বই থেকে । (মূল গ্রন্থ : Disputes over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ : মোস্ত ফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল,২০০৪
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. *হাওর উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, ঢাকা, বাংলাদেশ, বিভাগীয় সম্মেলন, ২০০৬ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, পৃ.৪-৫
৩০. সুনামগঞ্জের হাওর রক্ষা বাঁধের টাকা হরিলুটের অভিযোগ (পংকজ দে, *সমকাল*, ২১/৩/০৬)
৩১. সিলেটের হাওরাঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে সংশয় (হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, *ইত্তেফাক*, ২৬/১/০৬)

৩২. নাব্যতা হারিয়েছে সুনামগঞ্জের সব নদী ফসলি জমিতে পড়েছে বালির স্তর : ওপারের নদীতে বাঁধ আর পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ (সাজু পুরকায়স্থ, *ইত্তেফাক*, ২০/২/০৬)

৩৩. *Impact* of flood control projects in Bangladesh, Mohammad Rezaur Rahman & Jahir Uddin Chowdhury, p 55-65, in : *Bangladesh floods : Views from home and abroad*, Edited by- Mir M. Ali, M. Mozzammel Hoque, Rezaur Rahman, Salim Rashid, UPL, Bangladesh, 1998

৩৪. সুনামগঞ্জের বালি পাথরমহালগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে (সাজু পুরকায়স্থ, *ইত্তেফাক*, ৭/৯/০৬)

৩৫. প্রশাসনের নিষেধ উপেক্ষা করে যাদুকাটা নদীরপাড় কাটা চলছেই (তাহিরপুর থেকে সংবাদদাতা, *ইত্তেফাক*, ২৫/৮/০৬)

৩৬. *সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, রেনেসাঁ পাবলিকেসন্স, সিলেট, বাংলাদেশ,২০০০

৩৭. গঙ্গা নিয়ে বিরোধ, সন্তো বাহাদুর পুন, পৃ. ৯-২৭, মূল বই : *গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা* (মূল গ্রন্থ : Disputes over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ : মোস্তফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল, ২০০৪

৩৮. বাংলাদেশ : গঙ্গা হুমকির মুখোমুখি, মোস্তফা কামাল মজুমদার, পৃ. ২৯-৬১ । এটি নেয়া হয়েছে, *গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা* নামক বই থেকে ।

৩৯. সীমান্ত নদীসমস্যা ঝুলেই রইল : বৈঠক শেষ (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, *সংবাদ*, ২১/৯/০৬) । কিন্তু সীমান্ত নদীসমস্যা সমাধানে পানি মন্ত্রীপর্যায়ের যৌথ পরিদর্শন আজ শুরু এই শিরোনামে *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪/৯/০৬ তারিখের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সীমান্ত নদী ও এর ভাঙ্গন নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ও ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রীপর্যায়ের সফর আজ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে । ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর '০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ভারতীয় দলকে সাথে নিয়ে ভারতের ভাঙ্গন-কবলিত কলকাতা-ত্রিপুরা-আসামের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো ঘুরে দেখবেন । ইছামতি এবং কালিন্দিসহ অন্যান্য গুলোও পরিদর্শন করা হবে । সফর শেষে দুইপক্ষ কলকাতায় ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর বৈঠক করবেন । ভারতীয় প্রতিনিধিদল ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সহ খাগড়াছড়ির ফেনী নদীর উৎসমুখ ও মুহুরী নদীসহ আরও বেশকিছু এলাকা পরিদর্শন করবেন । উভয় প্রতিনিধিদল ঢাকায় বৈঠক করবেন ১৯-২০ সেপ্টেম্বর । বৈঠক শেষে ভারতীয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ত্যাগ করবেন ২১ সেপ্টেম্বর । বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত নদী রয়েছে ৫৪ টি । এই নদীগুলোর ভাঙ্গন রোধ করার জন্য বাংলাদেশ কোনো উদ্যোগ নিলেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাধা দিচ্ছে । এবার দুইপক্ষ সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে ।

৪০. Sylhet rivers drying up : Surma, Kushiyara, Khowai and Monu turn into narrow streams (Iqbal Siddiquee, *Daily Star*, 27/3/06)
৪১. *গঙ্গা নিয়ে বিরোধ*, সন্তো বাহাদুর পুন, পৃ. ৯-২৭, প্রাগুক্ত।
৪২. *বাংলাদেশ : গঙ্গা হুমকির মুখোমুখি*, মোস্তফা কামাল মজুমদার, পৃ. ২৯-৬১, প্রাগুক্ত।
৪৩. Proposed river linking schemes of India-scope for regional cooperation, P.K.Parua, p138-142, in : *Regional cooperation on transboundary rivers : Impact of the Indian river-linking project*, Editor: M. Feroze Ahmed, Qazi Kholiquzzaman Ahmed, Md. Khalequzzaman, BAPA-BEN-BEA-IEB-BUET-DU-BWP-BGS-BUP-BNGA-ASB, Dhaka, 2004
৪৪. ভারতীয় নধীতে বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে (স্টাফ রিপোর্টার, *ইনকিলাব*, ৩/১/০৬)
৪৫. ভারত নির্বিঘ্নে টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণে সেনাবাহিনী মোতায়ন করবে (সৈয়দ মাহবুব র্মোশেদ, *নয়া দিগন্ত*, ৩/১/০৬)
৪৬. International river basins development environmental challenges and options, K. B. Sajjadur Rasheed, p25-36, in : *Management of international river basins and environmental challenges*, Academic publishers and Bangladesh national committee of international commission on irrigation and drainage (ICID-Bangladesh), 1994
৪৭. *পশ্চিমবঙ্গ : ক্ষীণকায় প্রকৌশল এবং সংঘাত*, জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় ও বিদিশা মালিক, পৃ. ৬৩-৯৯। এটি নেয়া হয়েছে, *গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা* নামক বই থেকে। (মূল গ্রন্থ : Disputes over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ : মোস্তফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল,২০০৪
৪৮. *Agriculture*, Inam Ahmed, p77-94, in : *Rivers of life : Bangladeshi journalists take a critical look at the flood action plan*, Editor-Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994
৪৯. *Fish, water and people : Reflections on inland openwater fisheries resources of Bangladesh*, M.Youssouf Ali, UPL, Bangladesh, 1997
৫০. প্রাগুক্ত
৫১. প্রাগুক্ত
৫২. প্রাগুক্ত
৫৩. পশ্চিমবঙ্গ : ক্ষীণকায় প্রকৌশল এবং সংঘাত, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদিশা মালিক, পৃ. ৬৩-৯৯। এটি নেয়া হয়েছে, *গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা* নামক বই থেকে। (মূল গ্রন্থ : Disputes

over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ : মোস্তফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল,২০০৪

৫৪. Local initiatives and national projects, Jennifer Duyne, p 75-90, in : *Planning and management of water resources : lessons from two decades of early implementation projects,Bangladesh*, Edited by Anjan K Datta, UPL, Dhaka, Bangladesh, 1999

৫৫. Existing embankments, Monowar Hossain, p53-76, in : *Rivers of life : Bangladeshi journalists take a critical look at the flood action plan,* Editor-Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994

৫৬. Large dams for hydropower in northeast India : a dossier, Compiled by Manju Menon with Kanchi Kohli, Kalpavrikash, South Asia Network on Dams, Rivers and People, New Delhi, India, 2005 পুস্তক এর *Spaces for people's participation in decision making for hydroelectric projects* নামক শেষ অধ্যায়ের section VII (p206-226) থেকে নেয়া হয়েছে।

৫৭. প্রাগুক্ত

৫৮. {সুজানা হাঁচ্ছা(৪৫), নং পাঁচগাও, সুরেশ নংমিন (৪০), নংমনগড়া, লুয়ের নংমিন(৪৫), সহ-সভাপতি, লিঙাম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, বরুয়াকোনা, চিনচিলি নংব্রেই (৭৫), জাগীরপাড়া, দিসিঙ রংরিন (৭০), নং জাগীরপাড়া, গেরমা ঘাঘরা (৪৫), নং সন্ন্যাসীপাড়া, সুদন সিং হদি (৫০), নং সন্ন্যাসীপাড়া, আলফন্স নংমিন (৪৫), নং সন্যাসীপাড়া , লেবি নং উড়া (৭০+), নং জাগীরপাড়া , জুলিয়ানা নং উড়া (৬৫), নং সন্ন্যাসীপাড়া, মংওয়াই নংউড়া (৮০), নং সন্ন্যাসীপাড়া, লিডিয়া দারিং (৪০), নং সন্ন্যাসীপাড়া, মদন কুবি (নং উড়া) (৮০+), নং পাঁচগাও। নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাদদেশে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী লেঙাম আদিবাসী গ্রামের জনগণ এইসব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।}

৫৯. (মো. নজিমউদ্দিন (৪৭, বাঁশতলা), মো. নিজামউদ্দীন (৪৫, বাঁশতলা), মো. আলী (৪৫, লালঘাট), মো. আবদুর রহিম (৫০, লাকমা) এরা সকলেই সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার সংসার ও চুনখলা হাওরের এককালের সম্পন্ন কৃষক যারা ভারতীয় পাহাড়ি বালিতে জমি হারিয়ে চলতি সময়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাথর ও কয়লাখনিতে দিনমজুরের কাজ করছেন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই এই বিবরণ লেখা হয়েছে। দ্বি-রাষ্ট্রিক সীমান্ত আইনকে ফাঁকি দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ কাজ করার জন্য যাতে এইসব সীমান্তবর্তী বিপন্ন মানুষদের কোনো ভাবেই এই তথ্য মারফত হেনস্থা না-করা হয় এই অনুরোধ রইল। সীমান্তবর্তী হাওর এলাকার সমস্যাগুলোকে দ্বি-রাষ্ট্রিক ভাবে ভাবলে এই মানুষদের আর নিজের ঘর-গেরস্থি ছেড়ে অবৈধ দিনমজুর হতে হবে না।)

৬০. {সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলার টাঙ্গুয়ার হাওর ও ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সীমান্তবর্তী হাজং গ্রামের রহলা দেবী হাজং (৭০), ঘিলাগড়া; সিদ্ধনাথ হাজং (৮৫), খনালক্ষীপুর; রাজেন্দ্র হাজং (৬০), ঘিলাছড়া; রিফুলা দেবী হাজং (৫৫), ঘিলাগড়া; অলেশ্বর হাজং (৩০), ঘিলাগড়া; ইলিমা দেবী হাজং (৪৫), ঘিলাগড়া; সুচরিতা দেবী হাজং (৩৫), ঘিলাগড়া; সুজিত হাজং (৩৬), ঘিলাগড়া; সীমা রানী হাজং (৩২), ঘিলাগড়া। হেমেন্দ্র চন্দ্র হাজং (৮০) ও মিলন চন্দ্র হাজং (৪৫) (লালঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ) টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ের এইসব আদিবাসিন্দারাই এই অভিজ্ঞতার কথা বয়ান করেছেন।}

৬১. (এন্ড্রু সলোমার (৪০), রেনসিং সলোমার (৭৫), নং রাজাই, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ ; রবীন্দ্র ম্রং (৪৫), কাইতাকোনা মান্দি গ্রাম, ধরমপাশা, সুনামগঞ্জ; রমেশ জুয়েল সলোমার (৬৫), পুতুল দিও (৫১), কড়ইগড়া, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ। দুর্ভোগ পোহানো মানুষেরা এই অভিজ্ঞতা বয়ান করলেন।)

৬২. {নন্দ কুমার দেববর্মা (হরিণমারা ত্রিপুরা কামি), সুখমোহন দেববর্মা (হরিণমারা ত্রিপুরা কামি), সূর্যকুমার দেববর্মা (কালিয়াবাড়ি ত্রিপুরা কামি), মুক্তাকুমার দেববর্মা (ডেবরাবাড়ি ত্রিপুরা কামি), চন্দ্রমণি দেববর্মা (মঙ্গলবাড়ি ত্রিপুরা কামি), বখল দেববর্মা, সীমারানী দেববর্মা, স্বপ্না রানী দেববর্মা, মধুচরন দেববর্মা, শচীকুমার দেববর্মা, সাগরসোহা দেববর্মা (পুরানবাড়ি ত্রিপুরা কামি), গাংগু উড়াং, রাইমণি উড়াং (ছনবাড়ি), যোগেশ মুণ্ডা (ছনবাড়ি), সুনীল খাড়িয়া (কৃষ্ণছড়া), মো. রেজাউল হক, মো. রফিক উল্লাহ, মো. মনির আহমদ, আবদুল আজিজ, লোকমান মিয়া, আবদুল গণি (কালেঙ্গা বীট)। এরা সবাই হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার কালেঙ্গা বনের কালেঙ্গা রেঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের ফরেস্ট ভিলেজার, যাদের অভিজ্ঞতা থেকেই উপরের এই বিবরণ হাজির করা হয়েছে।}

৬৩. কাকেত হেনইঞতা (কাকন বিবি), বয়স: ৮০, জিরারগাঁও, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

৬৪. International river basins development environmental challenges and options, K. B. Sajjadur Rasheed, p25-36, in : *Management of international river basins and environmental challenges*, Academic publishers and Bangladesh national committee of international commission on irrigation and drainage (ICID-Bangladesh), 1994

৬৫. *সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, রেনেসাঁ পাবলিকেসন্স, সিলেট, বাংলাদেশ, ২০০০

৬৬. Proposed river linking schemes of India-scope for regional cooperation, P.K.Parua, p138-142, in : *Regional cooperation on transboundary rivers : Impact of the Indian river-linking project*, Editor: M. Feroze Ahmed, Qazi Kholiquzzaman Ahmed, Md. Khalequzzaman,

BAPA-BEN-BEA-IEB-BUET-DU-BWP-BGS-BUP-BNGA-ASB, Dhaka, 2004
৬৭. *সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, রেনেসাঁ পাবলিকেসন্স, সিলেট, বাংলাদেশ, ২০০০

সহযোগী পত্রিকা / পুস্তক / অন্যান্য দৈনিক পত্রিকা (বাংলাদেশের রাজধানী থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকসমূহ):

১. Sylhet rivers drying up : Surma, Kushiyara, Khowai and Monu turn into narrow streams (Iqbal Siddiquee, Daily star, 27/3/06)
২. দিরাই-শাল্লার হাওর নদীতে চর : চাষাবাদ চলছে (শেখ কবির আহমেদ, যুগান্তর, ১৭/১/০৬)
৩. ভাটি অঞ্চলের নদীনালা খাল-বিল ভরাট হওয়ায় নৌ-যোগাযোগ ব্যাহত (দিরাই সংবাদদাতা, ইত্তেফাক, ২৭/১/০৬)
৪. সুনামগঞ্জের হাওর রক্ষা বাঁধের টাকা হরিলুটের অভিযোগ (পংকজ দে, সমকাল, ২১/৩/০৬)
৫. জুড়ী নদী ভরাট : বোরো চাষ ব্যাহত হওয়ার আশংকা (সংবাদদাতা, জুড়ী, সংবাদ, ৩১/১/০৬)
৬. সিলেটের হাওরাঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে সংশয় (হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, ইত্তেফাক, ২৬/১/০৬)
৭. মরে যাচ্ছে নদী (প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, সংবাদ, ১১/৩/০৬)
৮. সুনামগঞ্জের নদীতে এখন আর আগের মতো পানি থাকে না (সাজু পুরকায়স্থ, ইত্তেফাক, ৩১/৮/০৬)
৯. প্রশাসনের নিষেধ উপেক্ষা করে যাদুকাটা নদীর পাড় কাটা চলছেই (তাহিরপুর থেকে সংবাদদাতা, ইত্তেফাক, ২৫/৮/০৬)
১০. সুনামগঞ্জের বালি পাথর মহালগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে (সাজু পুরকায়স্থ, ইত্তেফাক, ৭/৯/০৬)
১১. সোমেশ্বরীর নদীতে পাঁচ গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ বিলীন (প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, সংবাদ, ২৪/৯/০৬)
১২. সীমান্ত নদীসমস্যা ঝুলেই রইল : বৈঠক শেষ (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সংবাদ, ২১/৯/০৬)
১৩. সীমান্ত নদীসমস্যা সমাধানে পানি মন্ত্রীপর্যায়ের যৌথ পরিদর্শন আজ শুরু এই শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪/৯/০৬

১৪. নাব্যতা হারিয়েছে সুনামগঞ্জের সব নদী ফসলি জমিতে পড়েছে বালির স্তর : ওপারের নদীতে বাঁধ আর পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ (সাজু পুরকায়স্থ, ইত্তেফাক, ২০/২/০৬)
১৫. ভারতীয় নধীতে বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে (স্টাফ রিপোর্টার, ইনকিলাব, ৩/১/০৬)
১৬. ভারত নির্বিঘ্নে টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণে সেনাবাহিনী মোতায়ন করবে (সৈয়দ মাহবুব র্মোশেদ, নয়া দিগন্ত, ৩/১/০৬

বই,পুস্তক, বুকলেট, গবেষণা, স্মরণিকা, আঞ্চলিক প্রকাশনা, পত্রিকাঃ

১৭. নদ-নদী এবং বন্যা, জ্যোতির্ময় বসু, পাক্ষিক চিন্তাঃ ২১-২২, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬-৩৯
১৮. বাংলাদেশের নদ নদী, শিপন রহমান, হাতেখড়ি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
১৯. Regional cooperation on transboundary rivers : Impact of the Indian river-linking project, Editor: M. Feroze Ahmed, Qazi Kholiquzzaman Ahmed, Md. Khalequzzaman, BAPA-BEN-BEA-IEB-BUET-DU-BWP-BGS-BUP-BNGA-ASB, Dhaka, 2004
২০. Management of international river basins and environmental challenges, Academic publishers and Bangladesh national committee of international commission on irrigation and drainage (ICID-Bangladesh), 1994
২১. Rivers of life : Bangladeshi journalists take a critical look at the flood action plan, Editor-Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994
২২. Floodplains or Flood Plans?, R.Adnan Hughes and B. Dalal-Clayton, International Institute for Environment and development (London) and Research & Advisory services, Dhaka, 1994, p5
২৩. Planning and management of water resources : lessons from two decades of early implementation projects, Bangladesh, Edited by Anjan K Datta, UPL, Dhaka, Bangladesh, 1999
২৪. Bangladesh : Reflections on the water, James J. Novak, UPL, Bangladesh, 1993, p-31

২৫. Fish, water and people : Reflections on inland openwater fisheries resources of Bangladesh, M. Youssouf Ali, UPL, Bangladesh, 1997
২৬. Bangladesh floods : Views from home and abroad, Edited by Mir M. Ali, M. Mozzammel Hoque, Rezaur Rahman, Salim Rashid, UPL, Bangladesh, 1998
২৭. গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা (মূল গ্রন্থ : Disputes over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ : মোস্তফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল, ২০০৪
হাওর : জলে ভাসা জনপদ, মুজিব মেহদী, আইইডি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৫৫-৫৬
২৮. সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, রেনেসাঁ পাবলিকেসন্স, সিলেট, বাংলাদেশ,২০০০
২৯. Large dams for hydropower in northeast India : a dossier, Compiled by Manju Menon with Kanchi Kohli, Kalpavrikash, South Asia Network on Dams, Rivers and People, New Delhi, India, 2005
৩০. হাওর উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, ঢাকা, বাংলাদেশ, বিভাগীয় সম্মেলন ২০০৬ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, পৃ.৪-৫
৩১. বাংলাদেশের নদ-নদী, সম্পাদনা ও প্রকাশনা : মো. শওকত আলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ, পানিবিজ্ঞান জুন ২০০৬

[লেখক: গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ ।]

দুটি চুক্তি ও দুটি সমঝোতা স্মারক

গঙ্গার প্রথম পানিবণ্টন চুক্তি ’৭১

ফারাক্কায়, গঙ্গা নদীর পানিবণ্টন এবং এর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার তাদের বন্ধুত্ব ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উভয় দেশের জনগণের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির একই আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় এলাকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির পারস্পরিক সমঝোতাভিত্তিক বণ্টন এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের অঞ্চলের পানিসম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়ে,

চুক্তির আওতা-বহির্ভূত কোনো বিষয়ে উভয় পক্ষের কোনো প্রকার ন্যায্য দাবি ও অধিকার ক্ষুণ্ন না-করে উভয় দেশ বিবেচনাধীন প্রশ্নটির একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হয়ে,

নিম্নলিখিত ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন :

ক. ফারাক্কা গঙ্গা নদীর পানিবণ্টনের ব্যবস্থা

অনুচ্ছেদ-১ :

ভারত কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি ফারাক্কায় পরিমাপ করা হবে ।

অনুচ্ছেদ-২ :

১. প্রত্যেক বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বণ্টনের সূত্র হল অত্র সঙ্গে সংযোজিত তফশিলের ২নং কলামে বর্ণিত পানির পরিমাণ, যার ভিত্তি হচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ফারাক্কায় রেকর্ডকৃত প্রবাহের ৭৫ শতাংশ নির্ভরযোগ্যতার ওপর ।

২. ভারত বাংলাদেশকে তফশিলের ৪নং কলামে প্রদর্শিত পরিমাণ পানি প্রতি ১০ দিন মেয়াদের হিসাবে ছাড়বে।
কিন্তু যদি কোনো ১০ দিন সময়ে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রকৃত পরিমাণ তফশিলের ২নং কলামে প্রদর্শিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশি বা কম হয় তাহলে সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য অনুপাত অনুসারে প্রাপ্ত পানিবণ্টন করা হবে।

তবে যদি বিশেষ কোনো ১০ দিন সময়ে ফারাক্কায় গঙ্গার পানিপ্রবাহ এমন পর্যায়ে হ্রাস পায় যে তফশিলের ৪নং কলামে প্রদর্শিত বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির পরিমাণ ৮০ শতাংশের নিচে যায়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অংশ উক্ত ৪নং কলামে প্রদর্শিত পানির ৮০ শতাংশের কম হবে না।

অনুচ্ছেদ-৩ :

১নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফারাক্কায় বাংলাদেশের প্রাপ্য পরিমাণ ফারাক্কার ভাটিতে অর্থাৎ ফারাক্কা এবং গঙ্গার উভয় তীরে যেখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় অবস্থিত, সেই স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় হ্রাস করা যাবে না। তবে ভারত যুক্তিসঙ্গত কারণে সর্বাধিক ২০০ কিউসেক পানি ব্যবহার করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-৪ :

দুই দেশের সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি (এরপর থেকে যৌথ কমিটি নামে অভিহিত) গঠিত হবে। এই যৌথ কমিটি ফারাক্কায় ফারাক্কা বাঁধের নিচে ও ফিডার ক্যানেল এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজে পানির দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ ও রেকর্ড করার জন্য ফারাক্কা ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজে যথোপযুক্ত পর্যবেক্ষক দল গঠন করবেন।

অনুচ্ছেদ-৫ :

যৌথ কমিটি তার নিজস্ব নিয়মকানুন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-৬ :

যৌথ কমিটি তাদের সংগৃহীত সকল তথ্য উভয় সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্টও পেশ করবেন।

অুচ্ছেদ-৭ :

চুক্তির এই অংশে অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলি কার্যকরী করার ও এই ব্যবস্থাবলি কার্যকর করতে এবং ফারাক্কা বাঁধের পরিচালনায় উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা পরীক্ষা করার জন্য যৌথ কমিটি দায়ী থাকবেন। এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ যদি এই যৌথ

কমিটি মীমাংসা করতে অপারগ হন, তবে সে ক্ষেত্রে উভয় সরকারের মনোনীত সমসংখ্যক বাংলাদেশি ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত প্যানেলের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। যদি তাতেও মতপার্থক্য বা বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যায়, তাহলে তা উভয় সরকারের কাছে পেশ করা হবে। উভয় সরকার তখন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত পর্যায়ে মিলিত হবেন এবং যদি তাতেও মতৈক্য না-হয় তবে পরস্পরস্বীকৃত অন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন।

খ. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাবলি

অনুচ্ছেদ-৮ :

উভয় সরকার শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাটির একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

অনুচ্ছেদ-৯ :

১৯৭২ সালের উভয় সরকার কর্তৃক গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য একটি মিতব্যয়ী ও গ্রহণযোগ্যতা প্রকল্প নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে কোনো সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত অথবা ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করে দেখবেন। তারা তিন বছরের মধ্যে উভয় সরকারের কাছে তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১০ :

যৌথ নদী কমিশনের সুপারিশ পর্যালোনা করে দুই সরকার এক বা একাধিক প্রকল্প বিবেচনা করবেন ও ঐক্যমত্যে উপনীত হবেন এবং সেই প্রকল্প বা প্রকল্পসমূহ যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১১ :

চুক্তির এই অংশ সম্পর্কে কোনো প্রকার অসুবিধা, মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে যৌথ নদী কমিশন যদি তা নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন, তবে তা উভয় সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হবে এবং উভয় সরকার পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত পর্যায়ে জরুরি বৈঠকে বসবেন।

গ. পর্যালোচনা ও মেয়াদ

অনুচ্ছেদ-১২ :

এই চুক্তির ধারাসমূহ উভয় পক্ষ সৎ বিশ্বাসের সঙ্গে কার্যকর করবেন। চুক্তির ১৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যতদিন এই চুক্তি বলবৎ থাকবে, ততদিন চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির স্বীকৃত পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-১৩ :

চুক্তি বলবৎ করার তারিখ থেকে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উভয় সরকার চুক্তিটি পর্যালোচনা করবেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বে অথবা উভয় সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত প্রাপ্য পানির স্বীকৃত পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-১৪ :

১৩নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পর্যালোচনা বা পর্যালোচনাসমূহের মধ্যে চুক্তির ক ও খ অংশে লিপিবদ্ধ ব্যবস্থাবলির কার্যকারিতা, ফলাফল, বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ-১৫ :

স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই চুক্তি কার্যকরী হবে এবং কার্যকরী হওয়ার তারিখ থেকে এই চুক্তি পাঁচ বছর সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে। ১৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পর্যালোচনা বা পর্যালোচনাসমূহের আলোকে পারস্পরিক সম্মনতিক্রমে এই চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্ধিত করা যাবে।

এই বিষয়ের সাক্ষীস্বরূপ আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করছি। এই চুক্তি ঢাকায় ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর তারিখে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার সম্পাদিত হল। বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ইংরেজি ভাষ্যই গ্রহণীয় হবে।

মোশাররফ হোসেন খান,
নৌবাহিনীর প্রধান এবং যোগাযোগ,
বন্যানিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

সুরজিত সিং বারনালা
কৃষি ও সেচ মন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার

গঙ্গার পানিবণ্টন সমঝোতা স্মারক '৮২

১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকলিপির বাংলা অনুবাদ

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি লে. জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ এনডিসি, পিএসসি'র সফরকালে এবং ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার বৈঠকে দুই নেতা ১৯৭৭ সালের ফারাক্কা চুক্তি যাহার মেয়াদ ১৯৮২ সালের ৪ নভেম্বর সমাপ্ত হইবে, কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দুই পক্ষের প্রকৃত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে একমত হন যে, স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার ব্যাপারে এই চুক্তি উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই এবং এ ধরনের সমাধানে পৌঁছিবার জন্য চুক্তির মেয়াদ শেষে নতুন প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

দুই নেতা স্বীকার করিয়াছেন যে, ফারাক্কায় লভ্য গঙ্গা নদীর অপর্যাপ্ত পানিপ্রবাহের মৌলিক সমস্যা উভয়পক্ষকে ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করে এবং ফারাক্কায় লভ্য পানির সমবণ্টনের প্রয়োজন। তাঁহারা এ ব্যাপারে একমত হন যে, ফারাক্কায় লভ্য প্রবাহের বৃদ্ধির ওপরই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিহিত আছে। এই লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক ক্ষেত্রে সমাধানের উদ্দেশ্যে যে কোনো পক্ষের প্রস্তাবিত স্কিমের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই দ্রুততার সাথে করার জন্য তাহাদের সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ দিয়েছে। যৌথ নদী কমিশন প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করিবে এবং স্মারক স্বাক্ষরের ১৮ মাসের মধ্যে অনুকূল সমাধানের সিদ্ধান্ত নিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। তারপর দুই সরকার যৌথ নদী কমিশনে গৃহীত প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করিবেন। দুই নেতা একমত হইয়াছেন যে ইতোমধ্যে আগামী দুই শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কায় প্রাপ্ত পানিবণ্টন এবং যৌথ পরিদর্শন ও তদারক তফশিল 'ক' অনুসারে হইবে। আরও মতৈক্য হইয়াছে যে পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমের যে কোনো একটিতে যদি পানির প্রবাহ অস্বাভাবিক কম মাত্রায় হয় তাহা হইলে উভয় সরকার তাৎক্ষণিক আলোচনায় মিলিত হইবেন এবং উভয়ের যে কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতির বোঝা যতদূর সম্ভব কীভাবে কমাইয়া আনা যায় উহা ঠিক করিবেন।

ইহা ছাড়াও মতৈক্য হইয়াছে যে, প্রবাহের বৃদ্ধির প্রাক-সম্ভাব্যতা পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরই প্রবাহবৃদ্ধি সমস্যা সর্বাধিক মাত্রায় সমাধানের সিদ্ধান্তের আলোকে পানিবণ্টন প্রশ্নে অধিকতর ও চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহা প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পর বাস্তবায়িত করা হইবে।

উনিশ শত বিরাশি সালের অক্টোবর মাস সাত তারিখে নয়াদিল্লিতি ইংরেজি ভাষায় দুইটি মূল দলিল সমঝোতা স্বাক্ষরটি হয় এবং উভয় দলিলই সমভাবে নির্ভরশীল।

প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের পক্ষে
পি. ভি. নরসিংহ রাও বিদেশমন্ত্রি এ. আর. শামসুদ্দোহা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গঙ্গার পানিবণ্টন সমঝোতা স্মারক '৮৫

১৯৮৫ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকলিপির বাংলা অনুবাদ

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ও ভারত প্রজাতন্ত্রের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর মধ্যে বাহামার নাসাউ-এ তাঁদের সাম্প্রতিক বৈঠকের সময় সুষ্ঠু সমঝোতার প্রেক্ষিতে দু'দেশের সেচমন্ত্রীদ্বয় ১৯৮৫ সালের ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে বৈঠকে মিলিত হন। ১৯৮২ সালের অনুরূপ ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী তিনটি শুষ্ক মৌসুমের জন্য ফারাক্কায় গঙ্গার পানিবণ্টন সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করাও ছিলএই বৈঠকের উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও ফারাক্কায় গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণসহ পারস্পরিক স্বার্থে উভয় দেশের যৌথ পানিসম্পদের প্রাপ্যতা এবং তার বণ্টনের বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে যৌথ সমীক্ষার কাজের ক্ষেত্র নির্ধারণ করাও এ বৈঠকের লক্ষ্য ছিল।

এটা ইতোমধ্যেই স্বীকৃত যে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গার পানিপ্রবাহের স্বল্পতার কারণে উভয় দেশেরই কিছুটা ত্যাগ স্বীকার বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি মধ্যেই এর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিহিত। একই সঙ্গে ফারাক্কায় প্রাপ্ত পানি সুষ্ঠ বণ্টনের ব্যাপারটাও স্বীকৃত হয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের পরিধি চিহ্নিত করে একটি যৌথ সমীক্ষার ব্যাপারে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১. সমীক্ষার লক্ষ্য হবে (ক) ফারাক্কায় গঙ্গা ও এর শাখা নদীসমূহ পানিপ্রবাহের বৃদ্ধিকল্পে একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও পরিকল্পনাসমূহ স্থির করা।

২. একটি যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি এ সমীক্ষা চালাবে। দু'সরকারের সংশ্লিষ্ট সচিব ও উভয় পক্ষের যৌথ নদী কমিশনারের দু'জন প্রকৌশলী সদস্যদের নিয়ে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি (জেসিই) গঠিত হবে। জেসিই নিজস্ব কর্মপন্থা ঠিক করবে এবং ১২ মাসের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আরোটিত দায়িত্ব সমাধা করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ নেবে।

৩. সমীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ক) ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ নদীসমূহের প্রাপ্ত পানি সম্পদের বণ্টন করা।
(অ) উভয় দেশের প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক হাইড্রোমেটিওরলজিক্যাল ডাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে উভয় দেশের যৌথ পানিসম্পদের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
(আ) প্রাপ্ত নদীর পানিসম্পদ পারস্পরিক স্বার্থে বণ্টনের বিকল্পপন্থা সমীক্ষা করা।
(ই) যথাযথভাবে নদীর পানিবণ্টনের স্থান, বণ্টনের মেয়াদ ও বণ্টনের তফসিল চিহ্নিত করা।
(খ) ফারাক্কায় গঙ্গা ও শাখা নদীসমূহের পানিপ্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে বৃদ্ধি করা।
এ অঞ্চলে দু'দেশের ভূ-পৃষ্ঠে পানিসম্পদ সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ফারাক্কায় গঙ্গা ও শাখা নদীসমূহের পানিপ্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে, প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা।

সমীক্ষার কাজ অবিলম্বে শুরু হবে এবং সমঝোতা স্মারকের স্বাক্ষরের দিন থেকে ১২ মাসের মধ্যে তা শেষ করতে হবে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবার ৬ মাসের শেষে মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে যৌথ সমীক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। ১২ মাস পরে ফারাক্কায় গঙ্গা ও শাখা নদীসমূহে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদি পানিবণ্টন প্রশ্নে শীর্ষ বৈঠক সিদ্ধান্ত নেবে।

এই মর্মে আরও সমঝোতা হয়েছে যে, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে আগামী তিনটি শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কায় প্রাপ্ত গঙ্গা ও শাখা নদীসমূহের পানিবণ্টন এবং এ ব্যাপারে যৌথ পর্যবেক্ষণ ও তদারক সংযোজন 'ক' অনুযায়ী হবে। এ ব্যাপারেও ঐকমত্য হয়েছে যে, আগামী তিনটি শুষ্ক মৌসুমের যে কোনো একটিতে যদি

পানিপ্রবাহ অস্বাভাবিক হ্রাস পায় তবে দু'দেশের সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠকে মিলিত হয়ে দু'দেশের বোঝা লাঘবের সিদ্ধান্ত নেবেন।

১৯৮৫ সালের ২২ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে ইংরেজি দুটি মূল কপিতে স্বাক্ষর করা হয়, যার প্রত্যেকটি সমান নির্ভরযোগ্য।

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের জন্য ও পক্ষে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য ও পক্ষে,

বি. শঙ্করানন্দ
পানিসম্পদ মন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
সেচ, পানিসম্পদ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী
গণ-প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার

গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি-২ : '৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানিবণ্টন বিষয়ে চুক্তি–

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার,
দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রসার এবং সুদৃঢ় করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে, নিজেদের দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে অভিন্ন ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে,

পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদ-নদীসমূহের পানিবণ্টনের বিষয়ে এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা, সেচ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন এবং পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পানিসম্পদ-এর সুষ্ঠ ব্যবহার করে দুই দেশের জনসাধারণ-এর পারস্পরিক উপযোগ সাধনের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে,
পরস্পরের চাহিদা পূরণের বিষয়ে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানিবণ্টনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের জনসাধারণের পারস্পরিক

স্বার্থে গঙ্গা নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে,
বর্তমান চুক্তিতে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা ছাড়া দুই দেশের স্ব স্ব অধিকার ও দাবির ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হবে না কিংবা আইনের সাধারণ নীতিমালার সূত্র হিসেবে পরিগণিত হবে না কিংবা ভবিষ্যতে নজির হিসেবে ব্যবহৃত হবে না, এমন ব্যবস্থাধীনে গঙ্গা বিষয়ক সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক সমাধানের বিষয়ে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে সম্মত যে :

অনুচ্ছেদ-১
ভারত কর্তৃক অবমুক্তেয় বাংলাদেশের জন্য স্থিরীকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ফারাক্কায় অবমুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ-২ (১) প্রতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ১০ দিনওয়ারি ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফারাক্কাতে গঙ্গা নদীর পানি সংলগ্নি-১-এ প্রদত্ত সূত্র অনুসারে বণ্টন করা হবে; এবং সংলগ্নি-১ অনুসারে পানিবণ্টনের ফলশ্রুতি সংলগ্নি-২-এ একটি নির্দেশনামূলক তফশিলে প্রদত্ত হয়েছে।

(২) অনুচ্ছেদ-১-এ যে নির্দেশনামূলক তফশিল উল্লেখিত এবং যা সংলগ্নি-২-এ দেয়া হয়েছে তার ভিত্তি হল বিগত ৪০ বৎসরের (১৯৪৯-৮৮) ব্যাপ্তিতে ফারাক্কায় দশ-দিনওয়ারি পানিপ্রবাহের গড় লভ্যতা।
(৩) যদি কোনো অবস্থায় যে কোনো একটি দশ দিন কালে ফারাক্কায় পানিপ্রবাহ ৫০ কিউসেকের নিচে নেমে যায়, তাহলে দু'দেশ অবিলম্বে পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হবে, যার ফলে জরুরিভাবে, সমতা, ন্যায়ানুগতা এবং পারস্পরিক ক্ষতি না-করার নীতির প্রবাহের বণ্টন-সাজুস্য বিধান করা হবে।

অনুচ্ছেদ-৩ অনুচ্ছেদ-১ অনুসারে ফারাক্কাতে বাংলাদেশের জন্য যে পানি অবমুক্ত হবে তা পরে ফারাক্কার নিচে কমানো হবে না; তবে যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের জন্য ভারত ফারাক্কা এবং যে স্থান থেকে গঙ্গা নদীর দুই ধার বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভেতরে পড়ছে, সেই স্থান পর্যন্ত অনধিক ২০০ কিউসেক পানি নিতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-৪ এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তীকালে দুই সরকার সমসংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবে (এর পরে যা যৌথ কমিটি নামে অভিহিত হবে)। যৌথ কমিটি ফারাক্কা এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজে উপযুক্ত টিমের মাধ্যমে ফারাক্কায় ব্যারাজের নিচে, ফিডার ক্যানালে, নেভিগেশন লকে এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজে দৈনিক প্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং রেকর্ড করবেন।

অনুচ্ছেদ-৫

যৌথ কমিটি তাদের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করবেন ।

অনুচ্ছেদ-৬

যৌথ কমিটি সংগৃহীত সকল উপাত্ত দুই সরকারের নিকট বেশ করার পর দুই সরকারের কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন দেবেন । এই প্রতিবেদন পেশ করার পর দুই সরকার প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ পর্যায়ে সভায় মিলিত হবেন ।

অনুচ্ছেদ-৭

এই চুক্তির ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যৌথ কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদি বাস্তবায়ন এবং ফারাক্কা ব্যারাজ পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দিলে তা পরীক্ষা করবেন । এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য ও মতবিরোধ দেখা দিলে এবং যৌথ কমিটি তা নিষ্পত্তিতে অসমর্থ হলে, তা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কাছে উপস্থিত হবে । এরপরও যদি কোনো মতপার্থক্য ও বিরোধ নিষ্পত্তিহীন থাকে তা দু'সরকারের নিকট উপস্থাপিত হবে এবং দুই সরকার জরুরি ভিত্তিতে যথোযুক্ত পর্যায়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এসবের সমাধানের জন্য আলোচনায় মিলিত হবে ।

অনুচ্ছেদ-৮

দুই সরকার শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সমাধানের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন ।

অনুচ্ছেদ-৯

সমতা, ন্যায়ানুগতা এবং পারস্পরিক ক্ষতি না-করার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে দুই সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদীসমূহের পানিবণ্টনের বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সম্মত হয়েছেন ।

অনুচ্ছেদ-১০

এই চুক্তির অধীনে পানিবণ্টনের ব্যবস্থা দুই সরকার কর্তৃক প্রতি পাঁচ বৎসর পরপর পর্যালোচনা করা হবে অথবা কোনো এক পক্ষের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এর আগেও পর্যালোচনা করা হবে এবং সমতা, ন্যায়ানুগতা ও পারস্পরিক ক্ষতি না-করার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়ভাবে সাজুস্যকৃত করা যাবে ।

এই চুক্তির ব্যবস্থাসমূহকে কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করার নিমিত্ত যে কোনো পক্ষ দুই বৎসর পর প্রথম পর্যালোচনা আহ্বান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-১১

চুক্তিকালীন সময়ে অনুচ্ছেদ ১০ অনুসারে পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সাজুস্য বিধানের বিষয়ে পারস্পরিক ঐকমত্যের অভাব হলে ভারত ফারাক্কা ব্যারাজের নিচে অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত সূত্র অনুসারে প্রাপ্য বাংলাদেশের ভাগের অন্যূন শতকরা ৯০ ভাগ পরিমাণ পানি, যতদিন পর্যন্ত-না পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রবাহ বণ্টনের বিষয়ে গৃহীত না-হয়, ততদিন পর্যন্ত অবমুক্ত করে যাবে।

অনুচ্ছেদ-১২

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কার্যকর হবে এবং ৩০ বৎসর সময়কালের জন্য বলবৎ থাকবে এবং এর পরে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এই চুক্তি নবায়ন করা যাবে।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীদ্বয় স্ব স্ব সরকার কর্তৃক যথোপযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, আমাদের সাক্ষ্য প্রতিফলিত করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করছি।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখ নয়াদিল্লিতে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি ব্যাখ্যা করতে কোনো মতপার্থক্য দেখা গেলে এর ইংরেজি পাঠন ব্যবহৃত হবে।

স্বাক্ষরিত
শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত
এইচ.ডি. দেব গৌড়া
প্রধানমন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প: দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের প্রতিরোধ দরকার

ফ র হা দ ম জ হা র

পাঁচ লাখ ষাট হাজার কোটি ভারতীয় রুপির প্রকল্প হচ্ছে নদীসংযোগ প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাটির পানি উজানে আটকিয়ে রেখে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সরিয়ে নেয়া। এই প্রকল্পের সঙ্গে বিজেপির রাজনীতি, মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী এবং পানি বিক্রি করে মুনাফা কামানোর আন্তর্জাতিক ব্যবসাগুলো দ্রুত জড়িয়ে পড়েছে। মেক্সিকোর কানকুন শহরে বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের যে সম্মেলন সেপ্টেম্বরে হতে যাচ্ছে, সেখানে 'সেরা খাত' অর্থাৎ পানি সরবরাহ বাজারব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়ার জন্য জোর চাপ আসবে এবং হয়েও যেতে পারে। যেমন আফগানিস্তান ও ইরাক দখল হয়ে গেছে। তেমনি 'পানি' ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম প্রক্রিয়া আরও বিস্তৃত ও কেন্দ্রীভূত হতে থাকবে। তাহলে নদীর পানি উজানে আটকে সেটা অন্যত্র সরিয়ে 'বিক্রি' করার ব্যাপারটাকে শুধু বিজেপির রাজনীতি বা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতা বললে ভুল হবে। আন্ত র্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বা আরও সঠিক রাজনৈতিক পরিভাষায় বললে 'সাম্রাজ্যবাদ'কে ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পের মধ্যে দেখতে, বুঝতে ও মোকাবেলা করতে জানতে হবে। ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে বাংলাদেশে এ যাবৎ যে ছিফোঁটা লেখা পড়েছি তার মধ্যে অধিকাংশই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মধ্যে যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। ভারতের শাসক ও শোষকশ্রেণী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে এই সরলীকরণে বিপদের মাত্রা আমরা বুঝতে পারব না। ষড়যন্ত্র ঠেকানো সহজ, ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলেই তার অর্ধেক মাঠে মারা যায়। বাকিটা নির্ভর করে বুদ্ধি, চাতুর্য ও কৌশলের ওপর, কিন্তু ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প নিছকই ষড়যন্ত্র নয়। এটা আসলে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। বাঁধ নির্মাণ ও পানি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে বিক্রি করার পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতি ও এর সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং আন্ত র্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন গড়ে ওঠা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও 'হিন্দুত্ব' আসলে ভারতীয় ব্যাপার নয়। এর জাতীয় দিকটা গৌণ, মুখ্য নয়। হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি গড়ে ওঠার পেছনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শর্ত হিসেবে কাজ করছে। সামগ্রিকভাবে

আমরা যদি দেখতে না-শিখি তাহলে এই ধরনের মহাবিপদ মোকাবেলায় কোনো নীতি ও কৌশল আমরা স্থির করতে পারব না।

এটা সত্যি যে, খোদ ভারতেই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও বিরোধিতা আছে (দেখুন : যুগান্তও, ২৪ আগস্ট ২০০৩)। বিহার, পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ রয়েছে এই প্রকল্পের। রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের স্বার্থের সংঘাত এই প্রকল্প বাড়াবে বলে বিচক্ষণ ভারতীয়দের অভিমত। নদী অববাহিকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ ভারতের নতুন নয়। কাবেরী ও সুতলাজ-যমুনা খালের বিরোধ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে বিরোধিতা এই প্রকল্পকে নাকচ করে দিতে সক্ষম, এই ধারণা বাংলাদেশের করা ঠিক নয়। এই সত্য বাংলাদেশের জনগণ এবং সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্ত নিহিত রয়েছে। বিপদটা ঠিক এখানেই। বিপদটা খুবই গুরুতর।

ভারত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন নিজেই করতে সক্ষম। কিন্তু ভারত চাইছে বাইরে থেকে বিনিয়োগকারী আসুক। এর অনেক সুবিধা আছে। ইসরাইল ভারতকে কৃষিক্ষেত্রে প্রায় এক যুগ ধরে গবেষণা ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। এই প্রকল্পে ইসরাইল ও মার্কিন সহায়তা শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গেও জড়িত। এই লেখাটি লিখতে গিয়ে ২০০১ সালে *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে* ছাপা ভারত-ইসরাইল সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাক্তন ইসরাইলি মন্ত্রী শিমন পেরেজের (ঝযরসড়হ চবৎবং) কয়েকটি কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছেন, 'Defense, agriculture and culture relations will be the major thurst areas for co-operation between India and Israil. There is a higher potenial for trade between the two nations. Also there is an affinity between the business communities in India and Israil (*Indian Express*, January 11, 2001) ।' প্রাক্তন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী যখন এই কথা বলেছিলেন তখন তিনি নিজ দেশের আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সহায়তামন্ত্রী (Regional Co-operation Minister), এই অঞ্চলে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন ও ইসরাইল স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বে। প্রতিরক্ষা, কৃষি ও সংস্কৃতি এই তিনটি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক এখন খুবই গভীর ও ঘনিষ্ঠ। তার মন্তব্যের যে দিকটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহুদিবাদ ও হিন্দুত্ববাদের দোস্তি বুঝতে সহায়ক, সেটা হল ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসরাইলি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পারস্পারিক আকর্ষণ। গত কয়েক বছরে এই আঁতাতগুলো গড়ে ওঠার ইতিহাস না-নিলে আমরা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে রাজনীতি ও শক্তির ভারসাম্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারব না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারকরা ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পকে শুরুতে খুব একটা পাত্তা দেননি। এর প্রধান কারণ আঞ্চলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য

সংগ্রহ, সেই তথ্য পর্যালোচনা এবং তথ্য ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ধারণা নির্মাণে তাদের অজ্ঞাত ও অপরাগতা। অজ্ঞতা বা অপরাগতা দোষ নয়। কারণ খুব কম দেশেই আমলা কিংবা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তারা দেশের ভেতরে যারা সুনির্দিষ্ট খোঁজখবর রাখেন, পর্যালোচনায় দক্ষ এবং সরকারের পরামর্শ দিতে সক্ষম, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। বিভিন্নজনের সঙ্গে পরামর্শ এবং সম্ভাব্য নীতি ও কৌশল বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কংকালটা, এতই ওজনদার যে, তার ভারে আমাদের পিঠ কুঁজো হয়ে যাবার জোগাড়।

সেই যাই হোক, খবরের কাগজে দেখেছি, সরকার নাকি নদীসংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কিছু একটা প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই প্রতিবাদের ভাষা এবং মাত্রা আমরা জানি না। কিন্তু সেটা যখন জানানো হয়েছে ততদিনে এই প্রকল্পকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দুটো কাজ সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে। এক. প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালাম এই প্রকল্পকে সমর্থন জানিয়ে ইতোমধ্যেই বক্তব্য দিয়েছেন। দুই. সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকল্পের পক্ষে রায় দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। দশ বছরের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। তার মানে প্রকল্পটি এখন শুধু প্রকল্প হিসেবে আর নেই, এর পেছনে ভারত তার প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টকেও দাঁড় করাতে পেরেছে। দেরিতে বাংলাদেশ এই প্রকল্পের বিরোধিতা করায় বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে যে সমর্থন তৈরি হতে পারত তার সম্ভাবনা এখন হোঁচট খাবে। নর্দমা বাঁচাও আন্দোলনে মেধা পাটকার, প্রাক্তন পানিসম্পদ সচিব রামস্বামী আয়ার এবং প্রাক্তন হাইকমিশনার এলসি জৈন, রাজনীতিবিদ লালু প্রসাদ যাদব, আসামের ব্যাপক জনমত এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এঁরা সকলেই কমবেশি এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সমর্থন এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের প্রতিবাদের ভাষাকে এখন দুর্বল করবে। প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালামের সমর্থন এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় বিপরীত মত তৈরি করবে। বাংলাদেশের আপত্তিকে বিজেপি ভারতবিরোধী রাজনীতির অভিপ্রকাশ বলে নাকচ করে দিতে সক্ষম হবে। বিশেষত ভারতে বাংলাদেশকে মৌলবাদী দেশ বলে প্রচারের তীব্রতা কমেনি। এর ফলে সংখ্যালঘু 'নিধন'-এর অভিযোগ তো বাংলাদেশেরই লেখক, কলামিস্টরা করছেন। ফলে ভাটিতে যারা বাস করে তাদের পানিতে শুকিয়ে মারলে কীইবা এসে যায়? আফটার অল বাংলাদেশ তো একটি 'মৌলবাদী' দেশ, ঠিক না? এই দেশে ইসলামি জঙ্গি তৎপরতার প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে!

এলসি জৈন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, ভারতের প্রেসিডেন্ট এই প্রকল্পের পক্ষে যে মত দিয়েছেন তার 'বৈধতা' কতটুকু? বৈধতা সাংবিধানিক অর্থে শুধু নয়, কারিগরি অর্থেও। অর্থাৎ ভারতের প্রেসিডেন্ট কি এ রকম সমর্থন সাংবিধানিকভাবে দিতে

পারেন? যদি না-পারেন তাহলে ব্যক্তিগতভাবেও এই বিষয়ে কোনো কারিগরি মতামত দেওয়ার 'বৈধ' জ্ঞান কি তার আছে?

একই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এত বড় একটি প্রকল্পের ফলে পরিবেশ প্রাণব্যবস্থা এবং মানুষের জীবনযাপনে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে সেই বিষয়ে ধারণা করার মতো জ্ঞান বা বিশেষজ্ঞতা ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আছে কি? যদি না-থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা দশ বছরের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিল?

তাছাড়া জৈন আরও বলেছেন যে, অঞ্চলগুলোর জন্য পানি নিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্প নিয়েছে বলে জানিয়েছে। কিন্তু খরাপীড়িত দুই-তৃতীয়াংশ এলাকাই এই প্রকল্পের বাইরে থাকবে। তাহলে সরকারের এই যুক্তির কী মানে থাকতে পারে? এই এলাকাগুলোকে নিজ এলাকা থেকেই পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

মেধা পাটকার বলেছেন, সরকার নদীসংযোগের আটটা প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলেছে। কিন্তু প্রকল্প সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব এখনো আমরা দেখিনি। কোনো প্রকল্প পরিকল্পনা বা প্রকল্পের অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও দেখা মেলেনি। এই প্রকল্পের জন্য টাস্কফোর্স নামে যেটা করা হয়েছে, সেটা আসলে 'কন্ট্রাক্টর ফোর্স'। নদী সংযোগ প্রকল্পের পরিবেশগত পরিণতি এবং জমি, বন ও পানির ইস্যু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সরকার এই বিষয়গুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। মেধা পাটকার আরও কিছু কথা বলেছেন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পানি সমস্যা সমাধানের যে কথা এই প্রকল্প নিয়েছে বলে দাবি করছে, আসলে প্রকল্প পানির সমস্যা সমাধান করবে নাকি পানির বিপর্যয় ঘটাবে? জনগণের হাতে যে পানি এখন আছে তা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই নদীসংযোগ প্রকল্প। অতএব আদিবাসী, কৃষকসহ সকল মানুষকে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যেহেতু সরকার কারিগরি বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করছে না তখন ভবিষ্যতে কী হতে পারে সেটা এখনই আন্দাজ করা যায়। টাকা খরচ করা হবে প্রথমে। তারপর বলা হবে যেহেতু টাকা ইতোমধ্যে খরচ করেই ফেলা হয়েছে তখন পুরো প্রকল্পটাই বাস্তবায়ন করা হোক। অতএব, আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

রামেশ্বর আয়ার বলেছেন, প্রকল্প যখন বাস্তবায়ন শুরু হবে তখন তার খরচও পালা দিয়ে বাড়তে থাকবে। তখন বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এই প্রকল্পে অর্থ দিতে সমর্থ হবে না। তখন বহুজাতিক এবং রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলো এই প্রকল্পে ঢুকে পড়বে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সার্ক পিপলস ফোরামের প্রধান বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প। বলা বাহুল্য ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও পাকিস্তান থেকে আসা প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্যান্য দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা একবাক্যে ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন। সার্ক পিপলস

ফোরামের একটি উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক হচ্ছে South Asia Network on Food Ecology and Culture (SANFEC) বা দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য, প্রাণব্যবস্থা ও সংস্কৃতির রক্ষার বন্ধু সমিতি। সার্ক পিপলস ফোরামে নদীসংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের যৌথ প্রতিরোধ, কার্যকর নীতি ও কৌশল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যে প্রসঙ্গগুলো উপরে আমরা আলোচনা করেছি, সেই প্রসঙ্গগুলো ছাড়াও এই প্রকল্প যে অনুমানগুলোর ওপর ভিত্তি করে খাড়া করা হয়েছে, সেই অনুমানগুলো যে মিথ্যা, তা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই যুক্তিগুলো বাংলাদেশের কারও দেয়া নয়। ভারতের পরিবেশবাদীরাই এই প্রশ্নগুলো তুলেছেন। (যেমন সানফেকেরই একজন সক্রিয় সদস্য আশীষ কোঠারীর লেখা ডযবহ ষড়মরপ doesn’t wash নিবন্ধটি পাঠক Hindustan Times (13 June, 2003)-এ পড়ে দেখতে পারেন। আশীষ জুন মাসে ঢাকায় এসেছিলেন। সেই সময়েও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়।)

নদী সংযোগ প্রকল্পের দাবি হচ্ছে, তারা ‘বাড়তি’ পানি (Surplus Water) ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসা নদী-উপনদী থেকে সরিয়ে ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে তুলে নেবে। এখন ‘বাড়তি পানি’, কথাটি নিয়েই পরিবেশবাদীদের ভয়ানক আপত্তি। বাড়তি পানি আবার কী? ‘বাড়তি পানি’ নির্ধারণ করার হিসাবের মানদ কী হবে?

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যখন এই প্রকল্প বাস্তাবয়নের জন্য নির্দেশ দিচ্ছে, তখন তার কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক অনুমানটা কী ছিল? সেটা হল অতিশয় যান্ত্রিক ধারণা। পরিবেশ ও প্রাণব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে পানি সম্পর্কে একটা যান্ত্রিক ধারণা মাথায় বাসা বাঁধে। সেই যান্ত্রিক ধারণা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং ভারতের আণবিক বোমা বানানো বিশেষজ্ঞ প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালামের মধ্যে কাজ করেছে। সেটা হল, পানি পানি নদী-খাল-বিল বেয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে, তার আর কোনো ভূমিকা নেই। পরিবেশ ও প্রাণব্যবস্থার বিজ্ঞানের দিক থেকে এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। পানি আর পানির প্রবাহের মধ্যেও একটা মৌলিক গুণগত পার্থক্য আছে। নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন পাহাড়, বন, মাঠ, ফসলের ক্ষেত ও উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে প্রচুর পলি সংগ্রহ করে। একই সঙ্গে ক্রমশ নদীর শরীরে এসে অন্যান্য নদী, উপনদীর পানি এসে মেশে। ফলে সমুদ্রে বিপুল পরিমাণ পানি ঢেলে দিয়ে আসে নদী। নদীর এই প্রবাহ আর পানি সামর্থক নয়। পানি না-থাকলে প্রবাহ নেই। আর প্রবাহ যে কাজগুলো করে তাকে পরিবেশবিদরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছেন।

এক. নদী যেতে যেতে তার দুই দিকে প্রচুর পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে যায়। নদীর এই প্রবাহ না-থাকলে চাষাবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে। নদী সমুদ্রে পড়ার মুখে এই পলি জমায়। এবং উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে উপকূলীয় পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সমুদ্রের মুখে পলি জমিয়ে

নদী নতুন ভূখ তৈরি করে, ক্ষয় রোধ করে এবং নদী ও সমুদ্রের পানির পুষ্টি বাড়ায়, যাতে বিবিধ জলজ প্রাণ বেঁচে থাকতে পারে।

দুই. এই প্রবাহ সমুদ্রের পানি যেন ভূখ র গভীরে প্রবেশ করতে না-পারে তার জন্য বাধা তৈরি করে।

তিন. দরিয়ার নোনাপানির সঙ্গে নদী মিষ্টিপানি মেশায়। এর ফলে পানির ক্ষার ও অম্লের ভারসাম্য (Ph Balance) রক্ষিত হয়। এর ওপর সামুদ্রিক প্রাণব্যবস্থার টিকে থাকা না-থাকা নির্ভর করে।

যদি শুধু এই তিনটি শর্তও আমরা মনে রাখি তাহলে বুঝব 'বাড়তি পানি' বলে কোনো পানির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্পের অনুমান, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এই প্রকল্প দশ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশ এবং ভারতের প্রেসিডেন্টের এই প্রকল্পের পক্ষে দাঁড়ানোর পেছনে একমাত্র অনুমানই হচ্ছে, 'বাড়তি পানি'। অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গায় বাড়তি পানি আছে। এই প্রকল্প সেই বাড়তি পানি সরাবে।

বাংলাদেশের সরকার যে নরম জায়গা থেকে এই বিরোধিতা করছে সেটা মেনে নেয়া যায় না। যদি নীতিনির্ধারক মহলে এই ধারণা থাকে যে, নদীসংযোগ প্রকল্প ভারত শেষাবধি বাস্তবায়ন করবে না, তাহলে বাংলাদেশ বোকার স্বর্গেই বাস করছে বলতে হবে। সরকার যাই করুক, এই ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, নদীসংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারতবিরোধী হয়ে ওঠা নয়। হয়তো এই প্রকল্পই ভারতের সচেতন নাগরিক ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে একত্রে দক্ষিণ এশীয় মঞ্চ করার একটা বিরল সুযোগ আমাদের করে দিচ্ছে। হয়তো বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার জনগণের মৈত্রীর শর্তও করে দিচ্ছে এই প্রকল্প। বাংলাদেশকে অনেক বুদ্ধিমান ও সতর্ক হতে হবে।

নদীসংযোগ প্রকল্প দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সমস্যা, দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়েই এই বিপদ মোকাবেলা করতে হবে।